গদ্যগ্রন্থাবলী।

বিচিত্র প্রবন্ধ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূল্য ১।০, বাঁধাই ১॥০ টাকা।

প্রকাশক—শ্রীসুহাসচন্দ্র মজুমদার।
২০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা,
মজুমদার লাইব্রেরি।

কলিকাতা, ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট দিনময়ী
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।

বিচিত্র প্রবন্ধ।

সন১৩১৪, বৈশাখ।

গল্পগ্রন্থাবলীর উপস্বত্ব বোলপুর
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমকে উৎসর্গ
করা হইয়াছে।

সূচী।

শুদ্ধিপত্র।

পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত ভ্রমগুলি সংশোধন করিয়া লই-বেন। অক্ষরের সামান্য ভুলগুলির প্রতি লক্ষ্য করা হইল না।

অশুদ্ধ।		শুদ্ধ।
১০ পৃষ্ঠা শেষ ছত্রে		
এই এই জন্য	... ...	এই জন্য
৪ পৃষ্ঠা ২৩ ছত্র		
গায়ে সংলগ্ন	... ...	গায়ে গায়ে সংলগ্ন
৭৪ পৃষ্ঠা ১৩ ছত্র		
তাহা কোন প্রকাণ্ড	... ...	কোন প্রকাণ্ড
৭৪ পৃষ্ঠা ১৮ ছত্র		
সত্য দ্রষ্টার	... ...	সত্য-দ্রষ্টার
৮৩ পৃষ্ঠা ১৫ ছত্র		
পাল ঝুলাইয়া	... ...	পাল ফুলাইয়া
৯৮ পৃষ্ঠা শেষ ছত্র		
ফিরেচু গিয়ে পিচুপি	... ...	ফিরে গিয়ে চুপিচুপি
১১২ পৃষ্ঠা ২৪ ছত্র		
উর্দ্ধমুখী	... ...	উর্দ্ধমুখ
১৬৬ পৃষ্ঠা ১৮ ছত্র		
স্বাধীনতার পীড়ন	... ...	অধীনতার পীড়ন
বিষণ্ণ মুখে ভৃত্যের আনন্দহারা		ভৃত্যের আনন্দহারা বিষণ্ণ মুখে
২৩০ পৃষ্ঠা ১০ ও ১১ ছত্র		
কিন্তু কারণ হাসির	... ...	কিন্তু হাসির কারণ

অশুদ্ধ।			শুদ্ধ।
২৪৪ পৃষ্ঠা ৪ ছত্র			
বনবাস-প্রতিজ্ঞাপূরণ	...	...	বনবাস-প্রতিজ্ঞা
২৭৩ পৃষ্ঠা ২১ ছত্র			
বহু ছেলের মা	...	...	বহু-ছেলের মা
২৭৯ পৃষ্ঠা "ঘাটে" প্রবন্ধের ১৫ ছত্রে			
উঁচু	...	...	উবু
৩০৪ "সতীশচন্দ্র রায়" প্রবন্ধে ৯ ছত্রে			
তাহারা	...	...	তাহার
ঐ ২২ ছত্রে			
প্রদপটি	...	...	প্রদীপটি

বিচিত্র প্রবন্ধ।

লাইব্রেরি।

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে! কে জানিত সঙ্গীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে? কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্ত্তমানে বন্দী করিবে! অতলস্পর্শ কাল-সমুদ্রের উপর কেবল এক একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে।

লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানব হৃদয়ের অতলস্পর্শে নামিয়াছে। যে যে

দিকে ইচ্ছা ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপ
পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।

শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায়, তেমনি এই লাইব্রেরি
মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থান পতনের শব্দ শুনিতেছ? এখানে জীবিত ও মৃত
ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি একপাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবা
এখানে দুই ভাইয়ের মত এক সঙ্গে থাকে। সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান
আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে। এখানে দীর্ঘ প্র
ও স্বল্প প্রাণ পরম ধৈর্য্য ও শান্তির সহিত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে
কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না।

কত নদী সমুদ্র পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া
পৌঁছিয়াছে—কত শত-বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এস
এখানে এস, এখানে আলোকের জন্মসঙ্গীত গান হইতেছে।

অমৃত লোক প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে যে মহাপুরুষ যে-কোনোদিন
আপনার চারিদিকে মানুষকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন—তোমরা সকলে
অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্যধামে বাস করিতেছ—সেই মহাপুরুষদের কণ্ঠই
সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্য দিয়া এই লাইব্রেরির মধ্যে প্রতিধ্বনিত
হইতেছে।

এই বঙ্গের প্রান্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই? মান
সমাজকে আমাদের কি কোনো সংবাদ দিবার নাই? জগতের একত
সঙ্গীতের মধ্যে বঙ্গদেশই কেবল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে!

আমাদের পদপ্রান্তস্থিত সমুদ্র কি আমাদিগকে কিছু বলিতেছে
আমাদের গঙ্গা কি হিমালয়ের শিখর হইতে কৈলাসের কোন গান
করিয়া আনিতেছে না? আমাদের মাথার উপরে কি তবে
নীলাকাশ নাই? সেখান হইতে অনন্তকালের চিরজ্যোতির্ম্ময়ী ন
কি কেহ মুছিয়া ফেলিয়াছে?

দেশ বিদেশ হইতে অতীত বর্ত্তমান হইতে প্রতিদিন আমাদের কাছে মানবজাতির পত্র আসিতেছে, আমরা কি তাহার উত্তরে ছুটি চারিটি চটি চটি ইংরেজি খবরের কাগজ লিখিব! সকল দেশ অসীমকালের পটে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে বাঙালীর নাম কি কেবল দরখাস্তের দ্বিতীয় পাতেই লেখা থাকিবে! জড় অদৃষ্টের সহিত মানবাত্মার সংগ্রাম চলিতেছে, সৈনিকদিগকে আহ্বান করিয়া পৃথিবীর দিকে দিকে শৃঙ্গধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে, আমরা কি কেবল আমাদের উঠোনের মাচার উপরকার লাউকুমড়া লইয়া মকদ্দমা এবং আপীল চালাইতে থাকিব!

বহুবৎসর নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আপনার ভাষায় একবার আপনার কথাটি বলিতে দাও। বাঙালী কণ্ঠের সহিত মিলিয়া বিশ্বসঙ্গীত মধুরতর হইয়া উঠিবে।

১২৯২।

মা ভৈঃ।

মৃত্যু একটা প্রকাণ্ড কালো কঠিন কষ্টিপাথরের মত। ইহারই গায়ে কষিয়া সংসারের সমস্ত খাঁটি সোণার পরীক্ষা হইয়া থাকে।

তুমি দেশকে যথার্থ ভালবাস—তাহার চরম পরীক্ষা তুমি দেশের জন্য মরিতে পার কি না। তুমি আপনাকে যথার্থ ভালবাস তাহারো চরম পরীক্ষা আপনার উন্নতির জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করা তোমার পক্ষে সম্ভবপর কি না।

এমন একটা বিশ্বব্যাপী সার্ব্বজনীন ভয় পৃথিবীর মাথার উপরে যদি না ঝুলিত, তবে সত্য-মিথ্যাকে, ছোট-বড়-মাঝারিকে বিশুদ্ধভাবে তুলা করিয়া দেখিবার কোন উপায় থাকিত না।

এই মৃত্যুর তুলায় যে সব জাতির তৌল হইয়া গেছে, তাহারা পাস্‌-মার্কা পাইয়াছে। তাহারা আপনাদিগকে প্রমাণ করিয়াছে, নিজের কাছে ও পরের কাছে তাহাদের আর কিছুতেই কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। মৃত্যুর দ্বারাই তাহাদের জীবন পরীক্ষিত হইয়া গেছে। ধনীর যথার্থ পরীক্ষা দানে; যাহার প্রাণ আছে, তাহার যথার্থ পরীক্ষা প্রাণ দিবার শক্তিতে। যাহার প্রাণ নাই বলিলেই হয়, সে-ই মরিতে কৃপণতা করে।

যে মরিতে জানে সুখের অধিকার তাহারই; যে জয় করে, ভোগ করা তাহাকেই সাজে। যে লোক জীবনের সঙ্গে সুখকে, বিলাসকে, দুই হাতে আঁকড়িয়া থাকে, সুখ তাহার সেই ঘৃণিত ক্রীতদাসের কাছে নিজের সমস্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দেয় না, তাহাকে উচ্ছিষ্টমাত্র দিয়া দ্বারে ফেলিয়া রাখে। আর মৃত্যুর আহ্বানমাত্র যাহারা তুড়ি মারিয়া চলিয়া যায়, চির আদৃত সুখের দিকে একবার পিছন ফিরিয়া তাকায় না, সুখ তাহাদিগকে চায়, সুখ তাহারাই জানে। যাহারা সবলে ত্যাগ করিতে পারে, তাহারাই প্রবলভাবে ভোগ করিতে পারে। যাহারা মরিতে জানে না, তাহাদের ভোগবিলাসের দীনতা-কৃশতা-ঘৃণ্যতা গাড়িজুড়ি এবং তকমা-চাপরাশের দ্বারা ঢাকা পড়ে না। ত্যাগের বিলাসবিরল কঠোরতার মধ্যে পৌরুষ আছে। যদি স্বেচ্ছায় তাহা বরণ করি, তবে নিজেকে লজ্জা হইতে বাঁচাইতে পারিব।

এই দুই রাস্তা আছে—এক ক্ষত্রিয়ের রাস্তা, আর এক ব্রাহ্মণের রাস্তা। যাহারা মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে, পৃথিবীর সুখসম্পদ তাহাদেরি। যাহারা জীবনের সুখকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, তাহাদের আনন্দ মুক্তির। এই দুয়েতেই পৌরুষ।

প্রাণটা দিব, এ কথা বলা যেমন শক্ত—সুখটা চাই না, এ কথা বলা তাহা অপেক্ষা কম শক্ত নয়। পৃথিবীতে যদি মনুষ্যত্বের গৌরবে মাথা

তুলিয়া চলিতে চাই, তবে এই দুয়ের একটা কথা যেন বলিতে পারি। হয় বীর্য্যের সঙ্গে বলিতে হইবে—"চাই!" নয়, বীর্য্যেরই সঙ্গে বলিতে হইবে—"চাই না!" "চাই" বলিয়া কাঁদিব, অথচ লইবার শক্তি নাই; "চাই না" বলিয়া পড়িয়া থাকিব, কারণ চাহিবার উদ্যম নাই,—এমন ধিক্কার বহন করিয়াও যাহারা বাঁচে, যম তাহাদিগকে নিজগুণে দয়া করিয়া না সরাইয়া লইলে তাহাদের মরণের আর উপায় নাই।

বাঙালি আজকাল লোকসমাজে বাহির হইয়াছে। মুস্কিল এই যে, জগতের মৃত্যুশালা হইতে তাহার কোন পাস নাই। সুতরাং তাহার কথাবার্ত্তা যতই বড় হোক্, কাহারো কাছে সে খাতির দাবী করিতে পারে না। এইজন্য তাহার আস্ফালনের কথায় অত্যন্ত বেসুর এবং নাকিসুর লাগে। না মরিলে সেটার সংশোধন হওয়া শক্ত।

পিতামহের বিরুদ্ধে আমাদের এইটেই সব চেয়ে বড় অভিযোগ। সেই ত আজ তাঁহারা নাই, তবে ভালমন্দ কোন-একটা অবসরে তাঁহারা রীতিমত মরিলেন না কেন? তাঁহারা যদি মরিতেন, তবে উত্তরাধিকার-সূত্রে আমরাও নিজেদের মরিবার শক্তিসম্বন্ধে আস্থা রাখিতে পারিতাম। তাঁহারা নিজে না খাইয়াও ছেলেদের অন্নের সঙ্গতি রাখিয়া গেছেন, শুধু মৃত্যুর সঙ্গতি রাখিয়া যান নাই। এত-বড় দুর্ভাগ্য, এত-বড় দীনতা আর কি হইতে পারে!

ইংরেজ আমাদের দেশের যোদ্ধৃজাতিকে ডাকিয়া বলেন, "তোমরা লড়াই করিয়াছ—প্রাণ দিতে জান; যাহারা কখনো লড়াই করে নাই, কেবল বকিতে জানে, তাহাদের দলে ভিড়িয়া তোমরা কন্‌গ্রেস্ করিতে যাইবে!"

তর্ক করিয়া ইহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তর্কের দ্বারা লজ্জা যায় না। বিশ্বকর্ম্মা নৈয়ায়িক ছিলেন না, সেইজন্য পৃথিবীতে অযৌক্তিক ব্যাপার পদে পদে দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য

যাহারা মরিতে জানে না, তাহারা শুধু যুদ্ধের সময়ে নহে, শান্তির সময়েও পরস্পর ঠিক সমানভাবে মিশিতে পারে না; যুক্তিশাস্ত্রে ইহা অসঙ্গত, অর্থহীন, কিন্তু পৃথিবীতে ইহা সত্য।

অতএব, আরাম-কেদারায় হেলান্ দিয়া পোলিটিকাল্ সুখস্বপ্নে যখন কল্পনা করি—সমস্ত ভারতবর্ষ এক হইয়া মিশিয়া যাইতেছে, তখন মাঝখানে এই একটা দুশ্চিন্তা উঠে যে, বাঙালির সঙ্গে শিখ আপন ভাইয়ের মত মিশিবে কেন? বাঙালি বি.-এ. এবং এম্.-এ. পরীক্ষায় পাস্ হইয়াছে বলিয়া? কিন্তু যখন তাহার চেয়ে কড়া পরীক্ষার কথা উঠিবে, তখন সার্টিফিকেট্ বাহির করিব কোথা হইতে? শুদ্ধমাত্র কথায় অনেক কাজ হয়, কিন্তু সকলেই জানেন চিঁড়ে ভিজাইবার সময় কথা দধির স্থান অধিকার করিতে পারে না; তেমনি যেখানে রক্তের প্রয়োজন, সেখানে বিশুদ্ধ কথা তাহার অভাব পূরণ করিতে অশক্ত।

অথচ যখন ভাবিয়া দেখি—আমাদের পিতামহীরা স্বামীর সহিত সহমরণে মরিয়াছেন, তখন আশা হয়—মরাটা তেমন কঠিন হইবে না। অবশ্য, তাঁহারা সকলেই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মরেন নাই। কিন্তু অনেকেই যে মৃত্যুকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বরণ করিয়াছেন, বিদেশীরাও তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

কোন দেশেই লোকনির্বিশেষে নির্ভয়ে ও স্বেচ্ছায় মরে না। কেবল স্বল্প একদল মৃত্যুকে যথার্থভাবে বরণ করিতে পারে—বাকি সকলে কেহ বা দলে ভিড়িয়া মরে, কেহ বা লজ্জায় পড়িয়া মরে, কেহ বা দস্তুরের তাড়নায় জড়ভাবে মরে।

মন হইতে ভয় একেবারে যায় না। কিন্তু ভয় পাইতে নিজের কাছে ও পরের কাছে লজ্জা করা চাই। শিশুকাল হইতে ছেলেদের এ শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাহাতে ভয় পাইলেই তাহারা অনায়াসে অক[illegible] স্বীকার না করিতে পারে। এমন শিক্ষা পাইলে লোকে লজ্জায় প[illegible]

সাহস করে। যদি মিথ্যা গর্ব্ব করিতে হয়, তবে, আমার সাহস আছে, এই মিথ্যাগর্ব্বই সব চেয়ে মার্জ্জনীয়। কারণ, দৈন্যই বল, অজ্ঞতাই বল, মূঢ়তাই বল, মনুষ্যচরিত্রে ভয়ের মত এত-ছোট আর কিছুই নাই। ভয় নাই বলিয়া যে লোক মিথ্যা অহঙ্কারও করে, অন্তত তাহার লজ্জা আছে, এ সদ্‌গুণটারও প্রমাণ হয়।

নির্ভীকতা যেখানে নাই, সেখানে এই লজ্জার চর্চ্চা করিলেও কাজে লাগে। সাহসের ন্যায় লজ্জাও লোককে বল দেয়। লোকলজ্জায় প্রাণবিসর্জ্জন করা কিছুই অসম্ভব নয়!

অতএব আমাদের পিতামহীরা কেহ কেহ লোকলজ্জাতেও প্রাণ দিয়াছিলেন, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে। প্রাণ দিবার শক্তি তাঁহাদের ছিল,—লজ্জায় হোক্, প্রেমে হোক্, ধর্ম্মোৎসাহে হোক্, প্রাণ তাঁহারা দিয়াছিলেন, এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে।

বস্তুত দল বাঁধিয়া মরা সহজ। একাকিনী চিতাগ্নিতে আরোহণ করিবার মত বীরত্ব যুদ্ধক্ষেত্রে বিরল।

বাংলার সেই প্রাণবিসর্জ্জনপরায়ণা পিতামহীকে আজ আমরা প্রণাম করি। তিনি যে জাতিকে স্তন দিয়াছেন, স্বর্গে গিয়া তাহাকে বিস্মৃত হইবেন না। হে আর্য্যে, তুমি তোমার সন্তানদিগকে সংসারের চরমভয় হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দাও! তুমি কখনো স্বপ্নেও জান নাই যে, তোমার আত্মবিস্মৃত বীরত্ব দ্বারা—তুমি পৃথিবীর বীরপুরুষদিগকেও লজ্জিত করিতেছ। তুমি যেমন দিবাবসানে সংসারের কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পালঙ্কে আরোহণ করিতে,—দাম্পত্যলীলার অবসানদিনে সংসারের কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তুমি তেমনি সহজে বধূবেশে সীমন্তে মঙ্গলসিন্দূর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ, শুভ করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ—চিতাকে তুমি বিবাহশয্যার ন্যায় আনন্দময়, কল্যাণময় করিয়াছ। বাংলাদেশে পাবক

তোমারই পবিত্র জীবনাহুতিদ্বারা পূত হইয়াছে—আজ হইতে এই কথা আমরা স্মরণ করিব। আমাদের ইতিহাস নীরব, কিন্তু অগ্নি আমাদের ঘরে ঘরে তোমার বাণী বহন করিতেছে। তোমার অক্ষয়-অমৃত স্মরণনিলয় বলিয়া সেই অগ্নিকে, তোমার সেই অন্তিমবিবাহের জ্যোতিঃসূত্রময় অনন্ত পট্টবসনখানিকে আমরা প্রত্যহ প্রণাম করিব। সেই অগ্নিশিখা তোমার উন্নতবাহুরূপে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্ব্বাদ করুক। মৃত্যু যে কত সহজ, কত উজ্জ্বল, কত উন্নত, হে চিরনীরব স্বর্গবাসিনি, অগ্নি আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে তোমার নিকট হইতে সেই বার্ত্তা বহন করিয়া অভয়ঘোষণা করুক্!

১৩০৯।

পাগল।

পশ্চিমের একটি ছোট সহর। সম্মুখে বড়রাস্তার পরপ্রান্তে খোড়ো চালগুলার উপরে পাঁচ-ছয়টা তালগাছ বোবার ইঙ্গিতের মত আকাশে উঠিয়াছে, এবং পোড়ো বাড়ীর ধারে প্রাচীন তেঁতুলগাছ তাহার লঘুচিক্কণ ঘন পল্লবভার, সবুজ মেঘের মত, স্তূপে স্তূপে স্ফীত করিয়া রহিয়াছে। চালশূন্য ভাঙা ভিটার উপরে ছাগছানা চরিতেছে। পশ্চাতে মধ্যাহ্ন-আকাশের দিগন্তরেখা পর্য্যন্ত বনশ্রেণীর শ্যামলতা।

আজ এই সহরটির মাথার উপর হইতে বর্ষা হঠাৎ তাহার কালো অবগুণ্ঠন একেবারে অপসারিত করিয়া দিয়াছে।

আমার অনেক জরুরী লেখা পড়িয়া আছে—তাহারা পড়িয়াই রহিল। জানি,—তাহা ভবিষ্যতে পরিতাপের কারণ হইবে; তা হউক্, সেটুকু স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। পূর্ণতা কোন্ মূর্ত্তি ধরিয়া হঠাৎ কখন

আপনার আভাস দিয়া যায়, তাহা ত আগে হইতে কেহ জানিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারে না—কিন্তু যখন সে দেখা দিল, তখন তাহাকে শুধুহাতে অভ্যর্থনা করা যায় না। তখন লাভক্ষতির আলোচনা যে করিতে পারে, সে খুব হিসাবী লোক—সংসারে তাহার উন্নতি হইতে থাকিবে—কিন্তু হে নিবিড় আষাঢ়ের মাঝখানে একদিনের জ্যোতির্ম্ময় অবকাশ, তোমার শুভ্র মেঘমাল্যখচিত ক্ষণিক অভ্যুদয়ের কাছে আমার সমস্ত জরুরী কাজ আমি মাটি করিলাম—আজ আমি ভবিষ্যতের হিসাব করিলাম না—আজ আমি বর্ত্তমানের কাছে বিকাইলাম!

দিনের পর দিন আসে, আমার কাছে তাহারা কিছুই দাবী করে না;—তখন হিসাবের অঙ্কে ভুল হয় না, তখন সকল কাজই সহজে করা যায়। জীবনটা তখন একদিনের সঙ্গে আর-একদিন, এক কাজের সঙ্গে আর-এক কাজ দিব্য গাঁথিয়া-গাঁথিয়া অগ্রসর হয়, সমস্ত বেশ সমানভাবে চলিতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ কোনো খবর না দিয়া একটা বিশেষ দিন সাতসমুদ্রপারের রাজপুত্রের মত আসিয়া উপস্থিত হয়, প্রতিদিনের সঙ্গে তাহার কোনো মিল হয় না—তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে এতদিনকার সমস্ত 'থেই' হারাইয়া যায়—তখন বাঁধা-কাজের পক্ষে বড়ই মুস্কিল ঘটে।

কিন্তু এই দিনই আমাদের বড়দিন;—এই অনিয়মের দিন, এই কাজ নষ্ট করিবার দিন। যে দিনটা আসিয়া আমাদের প্রতিদিনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয়—সেই দিন আমাদের আনন্দ। অন্যদিনগুলো বুদ্ধিমানের দিন, সাবধানের দিন,—আর এক-একটা দিন পূরা পাগ্‌লামির কাছে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করা।

পাগলশব্দটা আমাদের কাছে ঘৃণার শব্দ নহে। ক্ষ্যাপা নিমাইকে আমরা ক্ষ্যাপা বলিয়া ভক্তি করি—আমাদের ক্ষ্যাপা-দেবতা মহেশ্বর। প্রতিভা ক্ষ্যাপামির একপ্রকার বিকাশ কি না, এ কথা লইয়া য়ুরোপে

বাদানুবাদ চলিতেছে—কিন্তু আমরা এ কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই না। প্রতিভা ক্ষ্যাপামি বই কি, তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম, তাহা উলট্‌পালট্ করিতেই আসে—তাহা আজিকার এই খাপ্‌ছাড়া, সৃষ্টিছাড়া দিনের মত হঠাৎ আসিয়া যত কাজের লোকের কাজ নষ্ট করিয়া দিয়া যায়—কেহ বা তাহাকে গালি পাড়িতে থাকে, কেহ বা তাহাকে লইয়া নাচিয়া-কুঁদিয়া অস্থির হইয়া উঠে!

ভোলানাথ, যিনি আমাদের শাস্ত্রে আনন্দময়, তিনি সকল দেবতার মধ্যে এমন খাপ্‌ছাড়া। সেই পাগল দিগম্বরকে আমি আজিকার এই ধৌত নীলাকাশের রৌদ্রপ্লাবনের মধ্যে দেখিতেছি। এই নিবিড় মধ্যাহ্নের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তাঁহার ডিমিডিমি ডমরু বাজিতেছে। আজ মৃত্যুর উলঙ্গ শুভ্রমূর্ত্তি এই কর্ম্মনিরত সংসারের মাঝখানে কেমন নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে!—সুন্দর শান্তচ্ছবি!

ভোলানাথ, আমি জানি, তুমি অদ্ভুত। জীবনে ক্ষণেক্ষণে অদ্ভুত রূপেই তুমি তোমার ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দাঁড়াইয়াছ! একেবারে হিসাব-কিতাব নাস্তানাবুদ্ করিয়া দিয়াছ। তোমার নন্দিভৃঙ্গির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আজ তাহারা তোমার সিদ্ধির প্রসাদ যে একফোঁটা আমাকে দেয় নাই, তাহা বলিতে পারি না—ইহাতে আমার নেশা ধরিয়াছে, সমস্ত ভণ্ডুল হইয়া গেছে—আজ আমার কিছুই গোছালো নাই।

আমি জানি, সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরের কোথাও পাছে ধূলা লাগে বলিয়া সঙ্কুচিত, আনন্দ ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়—এইজন্য সুখের পক্ষে ধূলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধূলা ভূষণ। সুখ, কিছু পাছে হারায় বলিয়া ভীত, আনন্দ, যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত; এই এইজন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে

দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য্য। সুখ, ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে; আনন্দ, সংহারের মুক্তির মধ্যে আপন সৌন্দর্য্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে; এইজন্য সুখ বাহিরের নিয়মে বদ্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই সৃষ্টি করে। সুখ, সুধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে; আনন্দ, দুঃখের বিষকে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে,—এইজন্য, কেবল ভালটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত—আর, আনন্দের পক্ষে ভালমন্দ দুইই সমান।

এই সৃষ্টির মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা-কিছু অভাবনীয়, তাহা খামখা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। তিনি কেন্দ্রাতিগ, "সেন্টি্‌ফ্যুগল্‌" —তিনি কেবলি নিখিলকে নিয়মের বাহিরের দিকে টানিতেছেন। নিয়মের দেবতা সংসারের সমস্ত পথকে পরিপূর্ণ চক্রপথ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর এই পাগল তাহাকে আক্ষিপ্ত করিয়া কুণ্ডলী আকার করিয়া তুলিতেছেন। এই পাগল আপনার খেয়ালে সরীসৃপের বংশে পাখী এবং বানরের বংশে মানুষ উদ্ভাবিত করিতেছেন। যাহা হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাকেই চিরস্থায়িরূপে রক্ষা করিবার জন্য সংসারে একটা বিষম চেষ্টা রহিয়াছে—ইনি সেটাকে ছারখার করিয়া-দিয়া, যাহা নাই, তাহারই জন্য পথ করিয়া দিতেছেন। ইঁহার হাতে বাঁশী নাই, সামঞ্জস্য সুর ইঁহার নহে, পিনাক বাজিয়া উঠে, বিধিবিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়, এবং কোথা হইতে একটি অপূর্ব্বতা উড়িয়া-আসিয়া জুড়িয়া বসে। পাগলও ইঁহারি কীর্ত্তি এবং প্রতিভাও ইঁহারি কীর্ত্তি। ইঁহার টানে যাহার তার ছিঁড়িয়া যায়, সে হয় উন্মাদ, আর যাহার তার অশ্রুতপূর্ব্ব সুরে বাজিয়া উঠে, সে হইল প্রতিভাবান্‌! পাগলও দশের বাহিরে, প্রতিভাবান্‌ও তাই—কিন্তু পাগল বাহিরেই থাকিয়া যায়, আর প্রতিভাবান্‌ দশকে একাদশের কোঠায় টানিয়া-আনিয়া দশের অধিকার বাড়াইয়া দেন।

শুধু পাগল নয়, শুধু প্রতিভাবান্ নয়, আমাদের প্রতিদিনের একরঙা তুচ্ছতার মধ্যে হঠাৎ ভয়ঙ্কর, তাহার জ্বলজ্জটাকলাপ লইয়া, দেখা দেয়। সেই ভয়ঙ্কর, প্রকৃতির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত উৎপাত, মানুষের মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ আকারে জাগিয়া উঠে। তখন কত সুখমিলনের জাল লণ্ডভণ্ড, কত হৃদয়ের সম্বন্ধ ছারখার হইয়া যায়! হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বকধ্বক অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকারে গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে—সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহাধ্বনিতে নিশীথ-রাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায়, শম্ভু, তোমার নৃত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সংসারের উপরে প্রতিদিনের জড়হস্তক্ষেপে যে একটা সামান্যতার একটানা আবরণ পড়িয়া যায়, ভালমন্দ দুয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাহাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিতে থাক ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তরঙ্গিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও সৃষ্টির নব নব মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া তোল। পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার ভীত হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়! সংহারের রক্তআকাশের মাঝখানে তোমার রবিকরোদ্দীপ্ত তৃতীয়নেত্র যেন ধ্রুবজ্যোতিতে আমার অন্তরের অন্তরকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে! নৃত্য কর, হে উন্মাদ, নৃত্য কর! সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষকোটিযোজনব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে—তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন এই রুদ্রসঙ্গীতের তাল কাটিয়া না যায়! হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভাল এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক!

আমাদের এই ক্ষ্যাপাদেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে, তাহা নহে—সৃষ্টির মধ্যে ইঁহার পাগ্‌লামি অহরহ লাগিয়াই আছে—আমরা ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাই মাত্র। অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন করিতেছে,

ভালকে মন্দ উজ্জ্বল করিতেছে, তুচ্ছকে অভাবনীয় মূল্যবান্ করিতেছে। যখন পরিচয় পাই, তখনি রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।

আজিকার এই মেঘোন্মুক্ত আলোকের মধ্যে আমার কাছে সেই অপরূপের মূর্ত্তি জাগিয়াছে! সম্মুখের ঐ রাস্তা, ঐ খোড়োচাল-দেওয়া মুদীর দোকান, ঐ ভাঙা ভিটা, ঐ সরু গলি, ঐ গাছপালাগুলিকে প্রতিদিনের পরিচয়ের মধ্যে অত্যন্ত তুচ্ছ করিয়া দেখিয়াছিলাম। এইজন্য উহারা আমাকে বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল—রোজ এই কটা জিনিষের মধ্যেই নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছিল। আজ হঠাৎ তুচ্ছতা একেবারে চলিয়া গেছে। আজ দেখিতেছি, চির-অপরিচিতকে এতদিন পরিচিত বলিয়া দেখিতেছিলাম, ভাল করিয়া দেখিতেছিলামই না। আজ এই যাহা-কিছু, সমস্তকেই দেখিয়া শেষ করিতে পারিতেছি না। আজ সেই সমস্তই আমার চারিদিকে আছে, অথচ তাহারা আমাকে আটক করিয়া রাখে নাই—তাহারা প্রত্যেকেই আমাকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছে। আমার পাগল এইখানেই ছিলেন,—সেই অপূর্ব্ব, অপরিচিত, অপরূপ, এই মুদির দোকানের খোড়োচালের শ্রেণীকে অবজ্ঞা করেন নাই—কেবল, যে আলোকে তাঁহাকে দেখা যায়, সে আলোক আমার চোখের উপরে ছিল না। আজ আশ্চর্য্য এই যে, ঐ সম্মুখের দৃশ্য, ঐ কাছের জিনিষ আমার কাছে একটি বহুসুদূরের মহিমা লাভ করিয়াছে। উহার সঙ্গে গৌরীশঙ্করের তুষারবেষ্টিত দুর্গমতা, মহাসমুদ্রের তরঙ্গচঞ্চল দুস্তরতা আপনাদের সজাতিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।

এম্‌নি করিয়া হঠাৎ একদিন জানিতে পারা যায়, যাহার সঙ্গে অত্যন্ত ঘরকন্না পাতাইয়া বসিয়াছিলাম, সে আমার ঘরকন্নার বাহিরে। আমি যাহাকে প্রতিমুহূর্ত্তের বাঁধা-বরাদ্দ বলিয়া নিতান্ত নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম, তাহার মত দুর্লভ দুরায়ত্ত জিনিষ কিছুই নাই। আমি

যাহাকে ভালরূপ জানি মনে করিয়া তাহার চারিদিকে সীমানা আঁকিয়া-দিয়া খাতিরজমা হইয়া বসিয়া ছিলাম, সে দেখি, কখন্ একমুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত সীমানা পার হইয়া অপূর্ব্বরহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। যাহাকে নিয়মের দিক্ দিয়া, স্থিতির দিক্ দিয়া বেশ ছোটোখাটো, বেশ দস্তরসঙ্গত, বেশ আপনার বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, তাহাকে ভাঙনের দিক্ হইতে, ঐ শ্মশানচারী পাগলের তরফ হইতে হঠাৎ দেখিতে পাইলে মুখে আর বাক্য সরে না—আশ্চর্য্য! ও কে! যাহাকে চিরদিন জানিয়াছি, সেই এ কে! যে একদিকে ঘরের, সে আর-একদিকে অন্তরের, যে একদিকে কাজের সে আর-একদিকে সমস্ত আবশ্যকের বাহিরে, যাহাকে একদিকে স্পর্শ করিতেছি, সে আর-একদিকে সমস্ত আয়ত্তের অতীত—যে একদিকে সকলের সঙ্গে বেশ খাপ্ খাইয়া গিয়াছে, সে আর-একদিকে ভয়ঙ্কর খাপ্‌ছাড়া, আপনাতে আপনি!

প্রতিদিন যাঁহাকে দেখি নাই, আজ তাঁহাকে দেখিলাম, প্রতিদিনের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাঁচিলাম। আমি ভাবিতেছিলাম, চারিদিকে পরিচিতের বেড়ার মধ্যে প্রাত্যহিক নিয়মের দ্বারা আমি বাঁধা—আজ দেখিতেছি, মহা অপূর্ব্বের কোলের মধ্যে চিরদিন আমি খেলা করিতেছি। আমি ভাবিয়াছিলাম, আপিসের বড়সাহেবের মত অত্যন্ত একজন সুগম্ভীর হিসাবী লোকের হাতে পড়িয়া সংসারে প্রত্যহ আঁক পাড়িয়া যাইতেছি—আজ সেই বড় সাহেবের চেয়ে যিনি বড়, সেই মস্ত বেহিসাবী পাগলের বিপুল উদার অট্টহাস্য জলে-স্থলে-আকাশে সপ্তলোক ভেদ করিয়া ধ্বনিত শুনিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার খাতাপত্র সমস্ত রহিল! আমার জরুরি-কাজের বোঝা ঐ সৃষ্টিছাড়ার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলাম—তাঁহার তাণ্ডবনৃত্যের আঘাতে তাহা চূর্ণচূর্ণ হইয়া ধূলি হইয়া উড়িয়া যাক্!

১৩১১।

রঙ্গমঞ্চ।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমঞ্চের বর্ণনা আছে। তাহাতে দৃশ্যপটের কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, এরূপ আমি বোধ করি না।

কলাবিদ্যা যেখানে একেশ্বরী, সেইখানেই তাহার পূর্ণগৌরব। সতীনের সঙ্গে ঘর করিতে গেলে তাহাকে খাটো হইতেই হইবে। বিশেষত সতীন যদি প্রবল হয়। রামায়ণকে যদি সুর করিয়া পড়িতে হয়, তবে আদি-কাণ্ড হইতে উত্তরকাণ্ড পর্য্যন্ত সে সুরকে চিরকাল সমান একঘেয়ে হইয়া থাকিতে হয়; রাগিণী-হিসাবে সে বেচারার কোনকালে পদোন্নতি ঘটে না। যাহা উচ্চদরের কাব্য, তাহা আপনার সঙ্গীত আপনার নিয়মেই জোগাইয়া থাকে, বাহিরের সঙ্গীতের সাহায্য অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে। যাহা উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত, তাহা আপনার কথা আপনার নিয়মেই বলে; তাহা কথার জন্য কালিদাস-মিল্‌টনের মুখাপেক্ষা করে না—তাহা নিতান্ত তুচ্ছ তোম্‌-তানা-নানা লইয়াই চমৎকার কাজ চালাইয়া দেয়। ছবিতে, গানেতে, কথায় মিশাইয়া ললিতকলার একটা বারোয়ারি ব্যাপার করা যাইতে পারে—কিন্তু সে কতকটা খেলা-হিসাবে—তাহা হাটের জিনিষ—তাহাকে রাজকীয় উৎসবের উচ্চ আসন দেওয়া যাইতে পারে না।

কিন্তু শ্রাব্যকাব্যের চেয়ে দৃশ্যকাব্য স্বভাবতই কতকটা পরাধীন বটে। বাহিরের সাহায্যেই নিজেকে সার্থক করিবার জন্য সে বিশেষভাবে সৃষ্ট। সে যে অভিনয়ের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, এ কথা তাহাকে স্বীকার করিতেই হয়।

আমরা এ কথা স্বীকার করি না। সাধ্বী স্ত্রী যেমন স্বামীকে ছাড়া

আর কাহাকেও চায় না, ভাল কাব্য তেমনি ভাবুক ছাড়া আর কাহারো অপেক্ষা করে না। সাহিত্য পাঠ করিবার সময় আমরা সকলেই মনে মনে অভিনয় করিয়া থাকি—সে অভিনয়ে যে কাব্যের সৌন্দর্য্য খোলে না, সে কাব্য কোন কবিকে যশস্বী করে নাই।

বরঞ্চ এ কথা বলিতে পার যে, অভিনয়বিদ্যা নিতান্ত পরাশ্রিতা। সে অনাথা নাটকের জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে। নাটকের গৌরব অবলম্বন করিয়াই সে আপনার গৌরব দেখাইতে পারে।

স্ত্রৈণ স্বামী যেমন লোকের কাছে উপহাস পায়, নাটক তেমনি যদি অভিনয়ের অপেক্ষা করিয়া আপনাকে নানাদিকে খর্ব্ব করে, তবে সেও সেইরূপ উপহাসের যোগ্য হইয়া উঠে। নাটকের ভাবখানা এইরূপ হওয়া উচিত যে,—"আমার যদি অভিনয় হয় ত হউক্, না হয় ত অভিনয়ের পোড়াকপাল—আমার কোনই ক্ষতি নাই!"

যাহাই হউক, অভিনয়কে কাব্যের অধীনতা স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু তাই বলিয়া সকল কলাবিদ্যারই গোলামি তাহাকে করিতে হইবে, এমন কি কথা আছে! যদি সে আপনার গৌরব রাখিতে চায়, তবে যেটুকু অধীনতা তাহার আত্মপ্রকাশের জন্য নিতান্তই না হইলে নয়, সেই-টুকুই সে যেন গ্রহণ করে;—তাহার বেশি সে যাহা কিছু অবলম্বন করে, তাহাতে তাহার নিজের অবমাননা হয়।

ইহা বলা বাহুল্য, নাট্যোক্ত কথাগুলি অভিনেতার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কবি তাহাকে যে হাসির কথাটি জোগান, তাহা লইয়াই তাহাকে হাসিতে হয়; কবি তাহাকে যে কান্নার অবসর দেন, তাহা লইয়াই কাঁদিয়া সে দর্শকের চোখে জল টানিয়া আনে। কিন্তু ছবিটা কেন? তাহা অভিনেতার পশ্চাতে ঝুলিতে থাকে—অভিনেতা তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তোলে না; তাহা আঁকামাত্র;—আমার মতে তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা, কাপুরুষতা প্রকাশ পায়। এইরূপে যে উপায়ে

দের মনে বিভ্রম উৎপাদন করিয়া সে নিজের কাজকে সহজ করিয়া লে, তাহা চিত্রকরের কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া আনা।

তা ছাড়া যে দর্শক তোমার অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে, তাহার কি নিজের সম্বল কাণা-কড়াও নাই? সে কি শিশু? বিশ্বাস করিয়া তাহার উপরে কি কোন বিষয়েই নির্ভর করিবার জো নাই? যদি তাহা সত্য হয়, তবে ডবল্ দাম দিলেও এমন সকল লোককে টিকিট্ বেচিতে নাই।

এ ত আদালতের কাছে সাক্ষ্য দেওয়া নয় যে, প্রত্যেক কথাটাকে হলফ করিয়া প্রমাণ করিতে হইবে? যাহারা বিশ্বাস করিবার জন্য—আনন্দ করিবার জন্য আসিয়াছে, তাহাদিগকে এত ঠকাইবার আয়োজন কেন? তাহারা নিজের কল্পনাশক্তি বাড়ীতে চাবি বন্ধ করিয়া আসে নাই। কতক তুমি বোঝাইবে, কতক তাহারা বুঝিবে, তোমার সহিত তাহাদের এইরূপ আপোষের সম্বন্ধ।

দুষ্যন্ত গাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়াইয়া সখীদের সহিত শকুন্তলার কথাবার্ত্তা শুনিতেছেন। অতি উত্তম। কথাবার্ত্তা বেশ রসে জমাইয়া বলিয়া যাও! আস্ত গাছের গুঁড়িটা আমার সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলেও সেটা আমি ধরিয়া লইতে পারি—এতটুকু সৃজনশক্তি আমার আছে। দুষ্যন্ত-শকুন্তলা অনসূয়া-প্রিয়ংবদার চরিত্রানুরূপ প্রত্যেক হাবভাব এবং কণ্ঠস্বরের প্রত্যেক ভঙ্গী একেবারে প্রত্যক্ষবৎ অনুমান করিয়া লওয়া শক্ত—সুতরাং সেগুলি যখন প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান দেখিতে পাই, তখন হৃদয় রসে অভিষিক্ত হয়—কিন্তু দুটো গাছ বা একটা ঘর বা একটা নদী কল্পনা করিয়া লওয়া কিছুই শক্ত নয়, সেটাও আমাদের হাতে না রাখিয়া চিত্রের দ্বারা উপস্থিত করিলে আমাদের প্রতি ঘোরতর অবিশ্বাস প্রকাশ করা হয়।

আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐজন্য ভাল লাগে। যাত্রার অভি-

মঞ্চে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পর বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। কাব্যরস, যেটা আসল জিনিষ, সেইটেই মঞ্চের সাহায্যে ফোয়ারার মত চারিদিকে দর্শকদের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে। মালিনী যখন তাহার পুষ্পবিরল বাগানে ফুল খুঁজিয়া বেলা করিয়া দিতেছে, তখন সেটাকে সপ্রমাণ করিবার জন্য আসরের মধ্যে আস্ত আস্ত গাছ আনিয়া ফেলিবার কি দরকার আছে—একা মালিনীর মধ্যে সমস্ত বাগান আপনি জাগিয়া উঠে। তাই যদি না হইবে, তবে মালিনীরই বা কি গুণ, আর দর্শকগুলোই বা কাঠের মূর্ত্তির মত কি করিতে বসিয়া আছে?

শকুন্তলার কবিকে যদি রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপটের কথা ভাবিতে হইত, তবে তিনি গোড়াতেই মৃগের পশ্চাতে রথ ছোটান বন্ধ করিতেন। অবশ্য, তিনি বড় কবি—রথ বন্ধ হইলেই যে তাঁহার কলম বন্ধ হইত, তাহা নহে —কিন্তু আমি বলিতেছি, যেটা তুচ্ছ তাহার জন্য যাহা বড় তাহা কেন নিজেকে কোন অংশে খর্ব্ব করিতে যাইবে? ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে যাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকরের লক্ষ্যস্থল, কোন কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।

অতএব যখন দুষ্যন্ত ও সারথি একই স্থানে স্থির দাঁড়াইয়া বর্ণনা ও অভিনয়ের দ্বারা রথবেগের আলোচনা করেন, সেখানে দর্শক এই অতি সামান্য কথাটুকু অনায়াসেই ধরিয়া লন যে, মঞ্চ ছোট, কিন্তু কাব্য ছোট নয়;—অতএব কাব্যের খাতিরে মঞ্চের এই অনিবার্য্য ক্রটিকে প্রসন্নচিত্তে তাঁহারা মার্জ্জনা করেন এবং নিজের চিত্তক্ষেত্রকে সেই ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিয়া মঞ্চকেই মহীয়ান্ করিয়া তোলেন। কিন্তু

মঞ্চের খাতিরে কাব্যকে যদি খাট হইতে হইত, তবে ঐ কয়েকটা হতভাগ্য কাষ্ঠখণ্ডকে কে মাপ করিতে পারিত?

শকুন্তলা-নাটক বাহিরের চিত্রপটের কোন অপেক্ষা রাখে নাই বলিয়া আপনার চিত্রপটগুলিকে আপনি সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। তাহার কথাশ্রম, তাহার স্বর্গপথের মেঘলোক, তাহার মারীচের তপোবনের জন্য সে আর কাহারো উপর কোন বরাত দেয় নাই। সে নিজেকে নিজে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। কি চরিত্রসৃজনে, কি স্বভাবচিত্রে নিজের কাব্যসম্পদের উপরেই তাহার একমাত্র নির্ভর।

আমরা অন্য প্রবন্ধে বলিয়াছি, য়ুরোপীয়ের বাস্তব সত্য নহিলে নয়। কল্পনা যে কেবল তাহাদের চিত্তরঞ্জন করিবে তাহা নয়, কাল্পনিককে অবিকল বাস্তবিকের মত করিয়া বালকের মত তাহাদিগকে ভুলাইবে। কেবল কাব্যরসের প্রাণদায়িনী বিশল্যকরণীটুকু হইলে চলিবে না, তাহার সঙ্গে বাস্তবিকতার আস্ত গন্ধমাদনটা পর্য্যন্ত চাই। এখন কলিযুগ, সুতরাং গন্ধমাদন টানিয়া আনিতে এঞ্জিনিয়ারিং চাই—তাহার ব্যয়ও সামান্য নহে। বিলাতের ষ্টেজে শুদ্ধমাত্র এই খেলার জন্য যে বাজে খরচ হয়, ভারতবর্ষের কত অভ্রভেদী দুর্ভিক্ষ তাহার মধ্যে তলাইয়া যাইতে পারে।

প্রাচ্যদেশের ক্রিয়া-কর্ম্ম খেলা-আনন্দ সমস্ত সরল-সহজ। কলাপাতায় আমাদের ভোজ সম্পন্ন হয় বলিয়া ভোজের যাহা প্রকৃততম আনন্দ—অর্থাৎ বিশ্বকে অবারিতভাবে নিজের ঘরটুকুর মধ্যে আমন্ত্রণ করিয়া আনা—সম্ভবপর হয়। আয়োজনের ভার যদি জটিল ও অতিরিক্ত হইত, তবে আসল জিনিষটাই মারা যাইত।

বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি, তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য;—তাহাতে লক্ষ্মীর পেঁচাই সরস্বতীর

পদ্মকে প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে। তাহাতে কবি ও গুণীর প্রতিভার চেয়ে ধনীর মূলধন ঢের বেশি থাকা চাই। দর্শক যদি বিলাতি ছেলে-মানুষিতে দীক্ষিত না হইয়া থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের প্রতি ও কাব্যের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে, তবে অভিনয়ের চারিদিক্ হইতে তাহার বহুমূল্য বাজে জঞ্জালগুলো ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরবদান করিলেই সহৃদয় হিন্দুসন্তানের মত কাজ হয়। বাগানকে যে অবিকল বাগান আঁকিয়াই খাড়া করিতে হইবে এবং স্ত্রী-চরিত্র অকৃত্রিম স্ত্রীলোককে দিয়াই অভিনয় করাইতে হইবে, এরূপ অত্যন্ত স্থূল বিলাতি বর্ব্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে।

মোটের উপরে বলা যাইতে পারে যে, জটিলতা অক্ষমতারই পরিচয়; বাস্তবিকতা কাঁচপোকার মত আর্টের মধ্যে প্রবেশ করিলে তেলা-পোকার মত তাহার অন্তরের সমস্ত রস নিঃশেষ করিয়া ফেলে এবং যেখানে অজীর্ণবশত যথার্থ রসের ক্ষুধার অভাব, সেখানে বহুমূল্য বাহ্য প্রাচুর্য্য ক্রমশই ভীষণরূপে বাড়িয়া চলে—অবশেষে অন্নকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া চাটনিই স্তূপাকার হইয়া উঠে।

১৩০৯।

কেকাধ্বনি।

হঠাৎ গৃহপালিত ময়ূরের ডাক শুনিয়া আমার বন্ধু বলিয়া উঠিলেন—আমি ঐ ময়ূরের ডাক সহ্য করিতে পারি না; কবিরা কেকারবকে কেন যে তাঁহাদের কাব্যে স্থান দিয়াছেন, বুঝিবার জো নাই।

কবি যখন বসন্তের কুহুস্বর এবং বর্ষার কেকা—দুটাকেই সমান

আদর দিয়াছেন, তখন হঠাৎ মনে হইতে পারে, কবির বুঝিবা কৈবল্যদশাপ্রাপ্তি হইয়াছে, তাঁহার কাছে ভাল ও মন্দ, ললিত ও কর্কশের ভেদ লুপ্ত।

কেবল কেকা কেন, ব্যাঙের ডাক এবং ঝিল্লীর ঝঙ্কারকে কেহ মধুর বলিতে পারে না। অথচ কবিরা এ শব্দগুলিকেও উপেক্ষা করেন নাই। প্রেয়সীর কণ্ঠস্বরের সহিত ইহাদের তুলনা করিতে সাহস পান নাই, কিন্তু ষড়্ঋতুর মহাসঙ্গীতের প্রধান অঙ্গ বলিয়া তাঁহারা ইহাদিগকে সম্মান দিয়াছেন।

একপ্রকারের মিষ্টতা আছে, তাহা নিঃসংশয় মিষ্ট, নিতান্তই মিষ্ট। তাহা নিজের লালিত্য সপ্রমাণ করিতে মুহূর্ত্তমাত্র সময় লয় না। ইন্দ্রিয়ের অসন্দিগ্ধ সাক্ষ্য লইয়া, মন তাহার সৌন্দর্য্য স্বীকার করিতে কিছুমাত্র তর্ক করে না। তাহা আমাদের মনের নিজের আবিষ্কার নহে— ইন্দ্রিয়ের নিকট হইতে পাওয়া; এইজন্য মন তাহাকে অবজ্ঞা করে;— বলে, ও নিতান্তই মিষ্ট, কেবলি মিষ্ট। অর্থাৎ উহার মিষ্টতা বুঝিতে অন্তঃকরণের কোন প্রয়োজন হয় না, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই বোঝা যায়। যাহারা গানের সমজ্‌দার, এইজন্যই তাহারা অত্যন্ত উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া বলে, অমুক লোক মিষ্ট গান করে। ভাবটা এই যে, মিষ্ট গায়ক গানকে আমাদের ইন্দ্রিয়সভায় আনিয়া নিতান্ত সুলভ প্রশংসা দ্বারা অপমানিত করে;—মার্জ্জিত রুচি ও শিক্ষিত মনের দরবারে সে প্রবেশ করে না। যে লোক পাটের অভিজ্ঞ যাচনদার সে রসসিক্ত পাট চায় না; সে বলে, আমাকে শুক্‌নো পাট দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটা বুঝিব। গানের উপযুক্ত সমজ্‌দার বলে, বাজে রস দিয়া গানের বাজে গৌরব বাড়াইও না, —আমাকে শুক্‌নো মাল দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটি পাইব, আমি খুসি হইয়া ঠিক দামটি চুকাইয়া দিব। বাহিরের বাজে মিষ্টতায় আসল জিনিষের মূল্য নামাইয়া দেয়।

যাহা সহজেই মিষ্ট, তাহাতে অতি শীঘ্র মনের আলস্য আনে, বেশিক্ষণ মনোযোগ থাকে না। অবিলম্বেই তাহার সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া মন বলে, আর কেন ঢের হইয়াছে!

এই জন্য যে লোক যে বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছে, সে তাহার গোড়ার দিক্‌কার নিতান্ত সহজ ও ললিত অংশকে আর খাতির করে না। কারণ সেটুকুর সীমা সে জানিয়া লইয়াছে; সেটুকুর দৌড় যে বেশিদূর নহে, তাহা সে বোঝে; এইজন্য তাহার অন্তঃকরণ তাহাতে জাগে না। অশিক্ষিত সেই সহজ অংশটুকুই বুঝিতে পারে, অথচ তখনো সে তাহার সীমা পায় না—এইজন্যই সেই অগভীর অংশেই তাহার একমাত্র আনন্দ। সমজ্‌দারের আনন্দকে সে একটা কিম্ভূত-ব্যাপার বলিয়া মনে করে, অনেকসময় তাহাকে কপটতার আড়ম্বর বলিয়াও গণ্য করিয়া থাকে।

এইজন্যই সর্ব্বপ্রকার কলাবিদ্যাসম্বন্ধে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের আনন্দ ভিন্ন ভিন্ন পথে যায়। তখন এক পক্ষ বলে, তুমি কি বুঝিবে! আর এক পক্ষ রাগ করিয়া বলে, যাহা বুঝিবার তাহা কেবল তুমিই বোঝ, জগতে আর কেহ বোঝে না!

একটি সুগভীর সামঞ্জস্যের আনন্দ, সংস্থান-সমাবেশের আনন্দ, দূরবর্ত্তীর সহিত যোগ-সংযোগের আনন্দ, পার্শ্ববর্ত্তীর সহিত বৈচিত্র্যসাধনের আনন্দ—এইগুলি মানসিক আনন্দ। ভিতরে প্রবেশ না করিলে, না বুঝিলে, এ আনন্দ ভোগ করিবার উপায় নাই। উপর হইতেই চট্‌ করিয়া যে সুখ পাওয়া যায়, ইহা তাহা অপেক্ষা স্থায়ী ও গভীর।

এবং এক হিসাবে তাহা অপেক্ষা ব্যাপক। যাহা অগভীর, লোকের শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে—অভ্যাসের সঙ্গে ক্রমেই তাহা ক্ষয় হইয়া তাহার রিক্ততা বাহির হইয়া পড়ে। যাহা গভীর, তাহা আপাতত বহুলোকের

গম্য না হইলেও বহুকাল তাহার পরমায়ু থাকে—তাহার মধ্যে যে একটি শ্রেষ্ঠতার আদর্শ আছে, তাহা সহজে জীর্ণ হয় না।

জয়দেবের "ললিতলবঙ্গলতা" ভাল বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ নহে। ইন্দ্রিয় তাহাকে মন মহারাজের কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে একবার স্পর্শ করিয়াই রাখিয়া দেয়—তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের ভোগেই শেষ হইয়া যায়। ললিতলবঙ্গলতার পার্শ্বে কুমারসম্ভবের একটা শ্লোক ধরিয়া দেখা যাক্ :—

আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।

ছন্দ আলুলায়িত নহে, কথাগুলি যুক্তাক্ষরবহুল,—তবু ভ্রম হয়, এই শ্লোক ললিতলবঙ্গলতার অপেক্ষা কানেও মিষ্ট শুনাইতেছে। কিন্তু তাহা ভ্রম। মন নিজের সৃজনশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখ পূরণ করিয়া দিতেছে। যেখানে লোলুপ ইন্দ্রিয়গণ ভিড় করিয়া না দাঁড়ায়, সেইখানেই মন এইরূপ সৃজনের অবসর পায়। "পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা"—ইহার মধ্যে লয়ের যে উত্থান-পতন আছে, কঠোরে কোমলে যথাযথরূপে মিশ্রিত হইয়া ছন্দকে যে দোলা দিয়াছে, তাহা জয়দেবী লয়ের মত অতিপ্রত্যক্ষ নহে—তাহা নিগূঢ়; মন তাহা আলস্যভরে পড়িয়া পায় না, নিজে আবিষ্কার করিয়া লইয়া খুসি হয়। এই শ্লোকের মধ্যে যে একটি ভাবের সৌন্দর্য্য, তাহাও আমাদের মনের সহিত চক্রান্ত করিয়া অশ্রুতিগম্য একটি সঙ্গীত রচনা করে—সে সঙ্গীত সমস্ত শব্দসঙ্গীতকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়,—মনে হয়, যেন কান জুড়াইয়া গেল—কিন্তু কান জুড়াইবার কথা নহে, মানসী মায়ায় কানকে প্রতারিত করে।

আমাদের এই মায়াবী মনটিকে সৃজনের অবকাশ না দিলে, সে

কোন মিষ্টতাকেই বেশিক্ষণ মিষ্ট বলিয়া গণ্য করে না। সে উপযুক্ত উপকরণ পাইলে কঠোর ছন্দকে ললিত, কঠিন শব্দকে কোমল করিয়া তুলিতে পারে। সেই শক্তি খাটাইবার জন্য সে কবিদের কাছে অনুরোধ প্রেরণ করিতেছে।

কেকারব কানে শুনিতে মিষ্ট নহে, কিন্তু অবস্থাবিশেষে, সময়-বিশেষে মন তাহাকে মিষ্ট করিয়া শুনিতে পারে, মনের সেই ক্ষমতা আছে। সেই মিষ্টতার স্বরূপ, কুহুতানের মিষ্টতা হইতে স্বতন্ত্র। নব-বর্ষাগমে গিরিপাদমূলে লতাজটিল প্রাচীন মহারণ্যের মধ্যে যে মত্ততা উপস্থিত হয়, কেকারব তাহারি গান। আষাঢ়ে শ্যামায়মান তমাল-তালী-বনের দ্বিগুণতর ঘনায়িত অন্ধকারে, মাতৃস্তন্যপিপাসু ঊর্দ্ধবাহু শতসহস্র শিশুর মত অগণ্য শাখাপ্রশাখার আন্দোলিত মর্ম্মরমুখর মহোল্লাসের মধ্যে রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে একটি কাংস্যক্রেঙ্কার ধ্বনি উত্থিত করে, তাহাতে প্রবীণ বনস্পতিমণ্ডলীর মধ্যে আরণ্য মহোৎসবের প্রাণ জাগিয়া উঠে। কবির কেকারব সেই বর্ষার গান,—কান তাহার মাধুর্য্য জানে না, মনই জানে। সেইজন্যই মন তাহাতে অধিক মুগ্ধ হয়। মন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকখানি পায়;—সমস্ত মেঘাবৃত আকাশ, ছায়াবৃত অরণ্য, নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিখর, বিপুল মূঢ় প্রকৃতির অব্যক্ত অন্ধ আনন্দরাশি।

বিরহিণীর বিরহবেদনার সঙ্গে কবির কেকারব এইজন্যই জড়িত। তাহা শ্রুতিমধুর বলিয়া পথিকবধূকে ব্যাকুল করে না—তাহা সমস্ত বর্ষার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিয়া দেয়। নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম প্রাথমিক ভাব আছে—তাহা বহিঃপ্রকৃতির অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী, তাহা জল-স্থল আকাশের গায়ে সংলগ্ন। ষড়্‌ঋতু আপন পুষ্পপর্য্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রেমকে নানারঙে রাঙাইয়া দিয়া যায়। যাহাতে পল্লবকে স্পন্দিত, নদীকে তরঙ্গিত, শস্যশীর্ষকে হিল্লোলিত করে, তাহা ইহাকেও অপূর্ব্ব-

চাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিতে থাকে। পূর্ণিমার কোটাল ইহাকে স্ফীত করে এবং সন্ধ্যাভ্রের রক্তিমায় ইহাকে লজ্জামণ্ডিত বধূবেশ পরাইয়া দেয়। এক-একটি ঋতু যখন আপন সোনার কাঠি লইয়া প্রেমকে স্পর্শ করে, তখন সে রোমাঞ্চকলেবরে না জাগিয়া থাকিতে পারে না। সে অরণ্যের পুষ্প-পল্লবেরই মত প্রকৃতির নিগূঢ়স্পর্শাধীন। সেই জন্য যৌবনাবেশবিধুর কালিদাস ছয় ঋতুর ছয় তারে নরনারীর প্রেম কি কি সুরে বাজিতে থাকে, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন—তিনি বুঝিয়াছেন, জগতে ঋতু আবর্ত্তনের সর্ব্বপ্রধান কাজ প্রেম-জাগান; ফুল-ফুটানো প্রভৃতি অন্য সমস্তই তাহার আনুষঙ্গিক। তাই যে কেকারব বর্ষাঋতুর নিখাদ সুর, তাহার আঘাত বিরহবেদনার ঠিক উপরে গিয়াই পড়ে।

বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।

এই ব্যাঙের ডাক নববর্ষার মত্তভাবের সঙ্গে নহে, ঘনবর্ষার নিবিড় ভাবের সঙ্গে বড় চমৎকার খাপ খায়। মেঘের মধ্যে আজ কোন বর্ণ বৈচিত্র্য নাই, স্তরবিন্যাস নাই, শচীর কোন প্রাচীন কিঙ্করী আকাশের প্রাঙ্গণ মেঘ দিয়া সমান করিয়া লেপিয়া দিয়াছে, সমস্তই কৃষ্ণধূসর বর্ণ। নানাশস্য-বিচিত্রা পৃথিবীর উপরে উজ্জ্বল আলোকের তুলিকা পড়ে নাই বলিয়া বৈচিত্র্য ফুটিয়া ওঠে নাই। ধানের কোমল মসৃণ সবুজ, পাটের গাঢ় বর্ণ এবং ইক্ষুর হরিদ্রাভা একটি বিশ্বব্যাপি-কালিমায় মিশিয়া আছে। বাতাস নাই। আসন্ন-বৃষ্টির আশঙ্কায় পঙ্কিল পথে লোক বাহির হয় নাই। মাঠে বহুদিন পূর্ব্বে ক্ষেতের কাজ সমস্ত শেষ হইয়া গেছে। পুকুরে পাড়ির সমান জল। এইরূপ জ্যোতির্হীন, গতিহীন, কর্ম্মহীন, বৈচিত্র্যহীন, কালিমালিপ্ত একা-কারের দিনে ব্যাঙের ডাক ঠিক সুরটি লাগাইয়া থাকে। তাহার সুর ঐ বর্ণহীন মেঘের মত, এই দীপ্তিশূন্য আলোকের মত, নিস্তব্ধ

নিবিড় বর্ষাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে; বর্ষার গণ্ডিকে আরো ঘন করিয়া চারিদিকে টানিয়া দিতেছে। তাহা নীরবতার অপেক্ষাও এক-ঘেয়ে। তাহা নিভৃত কোলাহল। ইহার সঙ্গে ঝিল্লীরব ভালরূপ মেশে; কারণ—যেমন মেঘ, যেমন ছায়া, তেমনি ঝিল্লীরবও আর-একটা আচ্ছাদন-বিশেষ; তাহা স্বরমণ্ডলে অন্ধকারের প্রতিরূপ; তাহা বর্ষা-নিশীথিনীকে সম্পূর্ণতা দান করে।

১৩০৮।

বাজে কথা।

অন্ন খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়। কারণ, মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়ম অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে।

যেমন বাজে খরচ, তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়। উপদেশের কথা যে রাস্তা দিয়া চলে, মনুর আমল হইতে তাহা বাঁধা, কাজের কথা যে পথে আপনার গো-যান টানিয়া আনে, সে পথ কেজো সম্প্রদায়ের পায়ে পায়ে তৃণপুষ্পশূন্য চিহ্নিত হইয়া গেছে। বাজে কথা নিজের মত করিয়াই বলিতে হয়।

এইজন্য চাণক্য ব্যক্তিবিশেষকে যে একেবারেই চুপ করিয়া যাইতে বলিয়াছেন, সেই কঠোর বিধানের কিছু পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে; আমাদের বিবেচনায় চাণক্যকথিত উক্ত ভদ্রলোক 'তাবচ্চ শোভতে' যাবৎ তিনি উচ্চ অঙ্গের কথা বলেন, যাবৎ তিনি আবহমান কালের পরীক্ষিত সর্ব্বজনবিদিত সত্য ঘোষণায় প্রবৃত্ত থাকেন—কিন্তু তখনি তাঁহার বিপদ্, যখনি তিনি সহজ কথা নিজের ভাষায় বলিবার চেষ্টা করেন।

যে লোক একটা বলিবার বিশেষ কথা না থাকিলে কোন কথাই

বলিতে পারে না ; হয় বেদবাক্য বলে, নয় চুপ করিয়া থাকে ; হে চতুরানন, তাহার কুটুম্বিতা, তাহার সাহচর্য্য, তাহার প্রতিবেশ—

শিরসি মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ !

পৃথিবীতে জিনিষমাত্রই প্রকাশধর্ম্মী নয়। কয়লা আগুন না পাইলে জ্বলে না, স্ফটিক অকারণে ঝক্‌ঝক্‌ করে। কয়লায় বিস্তর কল চলে, স্ফটিক হার গাঁথিয়া প্রিয়জনের গলায় পরাইবার জন্য। কয়লা আবশ্যক, স্ফটিক মূল্যবান্।

এক একটি দুর্লভ মানুষ এইরূপ স্ফটিকের মত অকারণ ঝল্‌মল্‌ করিতে পারে। সে সহজেই আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে—তাহার কোন বিশেষ উপলক্ষ্যের আবশ্যক হয় না। তাহার নিকট হইতে কোন বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লইবার গরজ কাহারো থাকে না —সে অনায়াসে আপনাকে আপনি দেদীপ্যমান করে, ইহা দেখিয়াই আনন্দ। মানুষ, প্রকাশ এত ভালবাসে, আলোক তাহার এত প্রিয় যে, আবশ্যককে বিসর্জ্জন দিয়া, পেটের অন্ন ফেলিয়াও উজ্জ্বলতার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। এই গুণটি দেখিলে, মানুষ যে পতঙ্গশ্রেষ্ঠ, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। উজ্জ্বল চক্ষু দেখিয়া যে জাতি অকারণে প্রাণ দিতে পারে, তাহার পরিচয় বিস্তারিত করিয়া দেওয়া বাহুল্য।

কিন্তু সকলেই পতঙ্গের ডানা লইয়া জন্মায় নাই। জ্যোতির মোহ সকলের নাই। অনেকেই বুদ্ধিমান্, বিবেচক। গুহা দেখিলে তাঁহারা গভীরতার মধ্যে তলাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু আলো দেখিলে উপরে উড়িবার ব্যর্থ উদ্যমমাত্রও করেন না। কাব্য দেখিলে ইঁহারা প্রশ্ন করেন ইহার মধ্যে লাভ করিবার বিষয় কি আছে, গল্প শুনিলে অষ্টাদশ সংহিতার সহিত মিলাইয়া ইঁহারা ভূয়সী গবেষণার সহিত বিশুদ্ধ ধর্ম্মমতে তুয়ো বা বাহবা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসেন। যাহা অকারণ, যাহা অনাবশ্যক, তাহার প্রতি ইঁহাদের কোন লোভ নাই।

যাহারা আলোক-উপাসক, তাহারা এই সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে নাই। তাহারা ইঁহাদিগকে যে সকল নামে অভিহিত করিয়াছে, আমরা তাহার অনুমোদন করি না। বররুচি ইঁহাদিগকে অরসিক বলিয়াছেন, আমাদের মতে ইহা রুচিগর্হিত। আমরা ইঁহাদিগকে যাহা মনে করি, তাহা মনেই রাখিয়া দিই। কিন্তু প্রাচীনেরা মুখ সাম্‌লাইয়া কথা কহিতেন না—তাহার পরিচয় একটি 'সংস্কৃতশ্লোকে পাই। ইহাতে বলা হইতেছে, সিংহনখরের দ্বারা উৎপাটিত একটি গজমুক্তা বনের মধ্যে পড়িয়াছিল, কোন ভীলরমণী দূর হইতে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহা তুলিয়া লইল—যখন টিপিয়া দেখিল তাহা পাকা কুল নহে, তাহা মুক্তামাত্র' তখন দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, প্রয়োজনীয়তা-বিবেচনায় যাঁহারা সকল জিনিষের মূল্যনির্দ্ধারণ করেন, শুদ্ধমাত্র সৌন্দর্য্য ও উজ্জ্বলতার বিকাশ যাঁহাদিগকে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারে না, কবি বর্ব্বরনারীর সহিত তাঁহাদের তুলনা দিতেছেন। আমাদের বিবেচনায় কবি ইঁহাদের সম্বন্ধে নীরব থাকিলেই ভাল করিতেন—কারণ, ইঁহারা ক্ষমতাশালী লোক, বিশেষত, বিচারের ভার প্রায় ইঁহাদেরই হাতে। ইঁহারা গুরুমহাশয়ের কাজ করেন। যাঁহারা সরস্বতীর কাব্যকমলবনে বাস করেন, তাঁহারা তটবর্ত্তী বেত্রবনবাসীদিগকে উত্তেজিত না করুন, এই আমার প্রার্থনা।

সাহিত্যের যথার্থ বাজে রচনাগুলি কোন বিশেষ কথা বলিবার স্পর্দ্ধা রাখে না। সংস্কৃতসাহিত্যে মেঘদূত তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাহা ধর্ম্মের কথা নহে, কর্ম্মের কথা নহে, পুরাণ নহে, ইতিহাস নহে। যে অবস্থায় মানুষের চেতন-অচেতনের বিচার লোপ পাইয়া যায়, ইহা সেই অবস্থার প্রলাপ। ইহাকে যদি কেহ বদরীফল মনে করিয়া পেট ভরাইবার আশ্বাসে তুলিয়া লন, তবে তখনি ফেলিয়া দিবেন। ইহাতে প্রয়োজনের কথা কিছুই নাই। ইহা নিটোল মুক্তা, এবং ইহাতে

বিরহীর বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তচিহ্ন কিছু লাগিয়াছে, কিন্তু সেটুকু মুছিয়া ফেলিলেও ইহার মূল্য কমিবে না।

ইহার কোন উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই এ কাব্যখানি এমন স্বচ্ছ, এমন উজ্জ্বল। ইহা একটি মায়াতরী;—কল্পনার হাওয়ায় ইহার সজল মেঘ-নির্ম্মিত পাল ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং একটি বিরহীর হৃদয়ের কামনা বহন করিয়া ইহা অবারিতবেগে একটি অপরূপ নিরুদ্দেশের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে—আর-কোন বোঝা ইহাতে নাই।

টেনিসন্ যে idle tears, যে অকারণ অশ্রুবিন্দুর কথা বলিয়াছেন, মেঘদূত সেই বাজে চোখের জলের কাব্য। এই কথা শুনিয়া অনেকে আমার সঙ্গে তর্ক করিতে উদ্যত হইবেন। অনেকে বলিবেন, যক্ষ যখন প্রভুশাপে তাহার প্রেয়সীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তখন মেঘদূতের অশ্রুধারাকে অকারণ বলিতেছেন কেন? আমি তর্ক করিতে চাই না—এ সকল কথার আমি কোন উত্তর দিব না। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, ঐ যে যক্ষের নির্ব্বাসন প্রভৃতি ব্যাপার, ও সমস্তই কালিদাসের বানানো,—কাব্যরচনার ও একটা উপলক্ষমাত্র। ঐ ভারা বাঁধিয়া তিনি এই ইমারত গড়িয়াছেন—এখন আমরা ঐ ভারাটা ফেলিয়া দিব। আসল কথা, "রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্" মন অকারণ বিরহে বিকল হইয়া উঠে, কালিদাস অন্যত্র তাহা স্বীকার করিয়াছেন;—আষাঢ়ের প্রথমদিনে অকস্মাৎ ঘনমেঘের ঘটা দেখিলে আমাদের মনে এক সৃষ্টিছাড়া বিরহ জাগিয়া উঠে, মেঘদূত সেই অকারণ বিরহের অমূলক প্রলাপ। তা যদি না হইত,তবে বিরহী মেঘকে ছাড়িয়া বিদ্যুৎকে দূত পাঠাইত। তবে পূর্ব্বমেঘ এত রহিয়া-বসিয়া, এত ঘুরিয়া ফিরিয়া, এত যূথীবন প্রফুল্ল করিয়া, এত জনপদবধূর উৎক্ষিপ্ত দৃষ্টির কটাক্ষপাত লুটিয়া লইয়া চলিত না।

কাব্য পড়িবার সময়ও যদি হিসাবের খাতা খুলিয়া রাখিতেই হয়,

যদি কি লাভ করিলাম, হাতে হাতে তাহার নিকাশ চুকাইয়া লইতেই হয় তবে স্বীকার করিব মেঘদূত হইতে আমরা একটি তথ্য লাভ করিয়া পুলকিত হইয়াছি। সেটি এই যে, তখনো মানুষ ছিল এবং তখনো আষাঢ়ের প্রথম দিন যথানিয়মে আসিত।

কিন্তু অসহিষ্ণু বররুচি যাঁহাদের প্রতি অশিষ্ট বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাঁহারা কি এরূপ লাভকে লাভ বলিয়াই গণ্য করিবেন? ইহাতে কি জ্ঞানের বিস্তার, দেশের উন্নতি, চরিত্রের সংশোধন ঘটিবে? অতএব, যাহা অকারণ যাহা অনাবশ্যক, হে চতুরানন, তাহা রসের কাব্যে রসিকদের জন্যই ঢাকা থাকুক—যাহা আবশ্যক, যাহা হিতকর, তাহার ঘোষণার বিরতি ও তাহার খরিদ্দারের অভাব হইবে না!

১৩০৯।

পনেরো-আনা।

যে লোক ধনী, ঘরের চেয়ে তাহার বাগান বড় হইয়া থাকে। ঘর অত্যাবশ্যক; বাগান অতিরিক্ত—না হইলেও চলে। সম্পদের উদারতা অনাবশ্যকেই আপনাকে সপ্রমাণ করে। ছাগলের যতটুকু শিং আছে, তাহাতে তাহার কাজ চলিয়া যায়, কিন্তু হরিণের শিঙের পনেরো আনা অনাবশ্যকতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া থাকি। ময়ূরের লেজ যে কেবল রংচঙে জিতিয়াছে, তাহা নহে—তাহার বাহুল্যগৌরবে শালিক-খঞ্জন-ফিঙার পুচ্ছ লজ্জায় অহরহ অস্থির।

যে মানুষ আপনার জীবনকে নিঃশেষে অত্যাবশ্যক করিয়া তুলিয়াছে, সে ব্যক্তি আদর্শপুরুষ সন্দেহ নাই, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার আদর্শ অধিক লোকে অনুসরণ করে না;—যদি করিত, তবে মনুষ্যসমাজ

এমন একটি ফলের মত হইয়া উঠিত, যাহার বীচিই সমস্তটা, শাঁস একেবারেই নাই। কেবলই যে লোক উপকার করে, তাহাকে ভাল না বলিয়া থাকিবার জো নাই, কিন্তু যে লোকটা বাহুল্য, মানুষ তাহাকে ভালবাসে।

কারণ, বাহুল্যমানুষটি সর্ব্বতোভাবেই আপনাকে দিতে পারে। পৃথিবীর উপকারী মানুষ কেবল উপকারের সঙ্কীর্ণ দিক্ দিয়াই আমাদের একটা অংশকে স্পর্শ করে;—সে আপনার উপকারিতার মহৎ প্রাচীরের দ্বারা আর-সকল দিকেই ঘেরা; কেবল একটি দরজা খোলা, সেখানে আমরা হাত পাতি, সে দান করে। আর, আমাদের বাহুল্যলোকটি কোন কাজের নহে, তাই তাহার কোন প্রাচীর নাই। সে আমাদের সহায় নহে, সে আমাদের সঙ্গিমাত্র। উপকারী লোকটির কাছ হইতে আমরা অর্জ্জন করিয়া আনি, এবং বাহুল্যলোকটির সঙ্গে মিলিয়া আমরা খরচ করিয়া থাকি। যে আমাদের খরচ করিবার সঙ্গী, সেই আমাদের বন্ধু।

বিধাতার প্রসাদে হরিণের শিং ও ময়ূরের পুচ্ছের মত সংসারে আমরা অধিকাংশ লোকই বাহুল্য, আমাদের অধিকাংশেরই জীবন জীবনচরিত লিখিবার যোগ্য নহে, এবং সৌভাগ্যক্রমে আমাদের অধিকাংশেরই মৃত্যুর পরে পাথরের মূর্ত্তি গড়িবার নিষ্ফল চেষ্টায় চাঁদার খাতা দ্বারে-দ্বারে কাঁদিয়া ফিরিবে না।

মরার পরে অল্প লোকেই অমর হইয়া থাকেন, সেইজন্যই পৃথিবীটা বাসযোগ্য হইয়াছে। ট্রেণের সব গাড়িই যদি রিজার্ভ গাড়ি হইত, তাহা হইলে সাধারণ প্যাসেঞ্জারদের গতি কি হইত? একে ত বড় লোকেরা একাই একশো—অর্থাৎ যতদিন বাঁচিয়া থাকেন, ততদিন অন্তত তাঁহাদের ভক্ত ও নিন্দুকের হৃদয়ক্ষেত্রে শতাধিক লোকের জায়গা জুড়িয়া থাকেন—তাহার পরে, আবার, মরিয়াও তাঁহারা স্থান ছাড়েন না।

ছাড়া দূরে যাক্, অনেকে মরার সুযোগ লইয়া অধিকার বিস্তার করিয়াই থাকেন। আমাদের একমাত্র রক্ষা এই যে, ইঁহাদের সংখ্যা অল্প। নহিলে কেবল সমাধিস্তম্ভে সামান্য ব্যক্তিদের কুটীরের স্থান থাকিত না। পৃথিবী এত সঙ্কীর্ণ যে, জীবিতেব সঙ্গে জীবিতকে জায়গার জন্যে লড়িতে হয়। জমির মধ্যেই হউক্ বা হৃদয়ের মধ্যেই হউক্, অন্য পাঁচজনের চেয়ে একটুখানি ফলাও অধিকার পাইবার জন্য কত লোকে জালজালিয়াতি করিয়া ইহকাল-পরকাল খোয়াইতে উদ্যত। এই যে জীবিতে-জীবিতে লড়াই, ইহা সমকক্ষের লড়াই, কিন্তু মৃতের সঙ্গে জীবিতের লড়াই বড় কঠিন। তাহারা এখন সমস্ত দুর্ব্বলতা, সমস্ত খণ্ডতার অতীত, তাহারা কল্পলোকবিহারী—আমরা মাধ্যাকর্ষণ, কৈশিকাকর্ষণ, এবং বহুবিধ আকর্ষণবিকর্ষণের দ্বারা পীড়িত মর্ত্ত্যমানুষ, আমরা পারিয়া উঠিব কেন? এইজন্যই বিধাতা অধিকাংশ মৃতকেই বিস্মৃতিলোকে নির্ব্বাসন দিয়া থাকেন,—সেখানে কাহারো স্থানাভাব নাই। বিধাতা যদি বড়-বড় মৃতের আওতায় আমাদের মত ছোট-ছোট জীবিতকে নিতান্ত বিমর্ষ-মলিন, নিতান্তই কোণঘেঁষা করিয়া রাখিবেন, তবে পৃথিবীকে এমন উজ্জ্বল সুন্দর করিলেন কেন, মানুষের হৃদয়টুকু মানুষের কাছে এমন একান্তলোভনীয় হইল কি কারণে?

নীতিজ্ঞেরা আমাদিগকে নিন্দা করেন। বলেন, আমাদের জীবন বৃথা গেল। তাঁহারা আমাদিগকে তাড়না করিয়া বলিতেছেন—উঠ, জাগ, কাজ কর, সময় নষ্ট করিয়ো না!

কাজ না করিয়া অনেকে সময় নষ্ট করে সন্দেহ নাই—কিন্তু কাজ করিয়া যাহারা সময় নষ্ট করে, তাহারা কাজও নষ্ট করে, সময়ও নষ্ট করে। তাহাদের পদভারে পৃথিবী কম্পান্বিত এবং তাহাদেরই সচেষ্টতার হাত হইতে অসহায় সংসারকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান বলিয়াছেন—"সম্ভবামি যুগে যুগে।"

জীবন বৃথা গেল! বৃথা যাইতে দাও! অধিকাংশ জীবনই বৃথা যাইবার জন্য হইয়াছে! এই পনেরো-আনা অনাবশ্যক জীবনই বিধাতার ঐশ্বর্য্য সপ্রমাণ করিতেছে। তাঁহার জীবনভাণ্ডারে যে দৈন্য নাই, ব্যর্থ প্রাণ আমরাই তাহার অগণ্য সাক্ষী। আমাদের অফুরাণ অজস্রতা, আমাদের অহেতুক বাহুল্য দেখিয়া বিধাতার মহিমা স্মরণ কর। বাঁশী যেমন আপন শূন্যতার ভিতর দিয়া সঙ্গীত প্রচার করে, আমরা সংসারের পনেরো-আনা আমাদের ব্যর্থতার দ্বারা বিধাতার গৌরব ঘোষণা করিতেছি। বুদ্ধ আমাদের জন্যই সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, খৃষ্ট আমাদের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, ঋষিরা আমাদের জন্য তপস্যা করিয়াছেন এবং সাধুরা আমাদের জন্য জাগ্রত রহিয়াছেন।

জীবন বৃথা গেল! যাইতে দাও! কারণ, যাওয়া চাই। যাওয়াটাই একটা সার্থকতা। নদী চলিতেছে—তাহার সকল জলই আমাদের স্নানে এবং পানে এবং আমন ধানের ক্ষেতে ব্যবহার হইয়া যায় না। তাহার অধিকাংশ জলই কেবল প্রবাহ রাখিতেছে। আর-কোন কাজ না করিয়া কেবল প্রবাহরক্ষা করিবার একটা বৃহৎ-সার্থকতা আছে। তাহার যে জল আমরা খাল কাটিয়া পুকুরে আনি, তাহাতে স্নান করা চলে, কিন্তু তাহা পান করে না; তাহার যে জল ঘটে করিয়া আনিয়া আমরা জালায় ভরিয়া রাখি, তাহা পান করা চলে, কিন্তু তাহার উপরে আলো-ছায়ার উৎসব হয় না। উপকারকেই একমাত্র সাফল্য বলিয়া জ্ঞান করা কৃপণতার কথা, উদ্দেশ্যকেই একমাত্র পরিণাম বলিয়া গণ্য করা দীনতার পরিচয়।

আমরা সাধারণ পনেরো-আনা, আমরা নিজেদের যেন হেয় বলিয়া না জ্ঞান করি। আমরাই সংসারের গতি। পৃথিবীতে, মানুষের হৃদয়ে আমাদের জীবনস্বত্ব। আমরা কিছুতেই দখল রাখি না, আঁকড়িয়া থাকি না, আমরা চলিয়া যাই। সংসারের সমস্ত কলগান আমাদের

দ্বারা ধ্বনিত, সমস্ত ছায়ালোক আমাদের উপরেই স্পন্দমান। আমরা যে হাসি, কাঁদি, ভালবাসি; বন্ধুর সঙ্গে অকারণ খেলা করি; স্বজনের সঙ্গে অনাবশ্যক আলাপ করি; দিনের অধিকাংশ সময়ই চারিপাশের লোকের সহিত উদ্দেশ্যহীনভাবে যাপন করি, তার পরে ধুম করিয়া ছেলের বিবাহ দিয়া তাহাকে আপিসে প্রবেশ করাইয়া পৃথিবীতে কোন খ্যাতি না রাখিয়া মরিয়া-পুড়িয়া ছাই হইয়া যাই—আমরা বিপুল সংসারের বিচিত্র তরঙ্গলীলার অঙ্গ; আমাদের ছোটখাট হাসিকৌতুকে সমস্ত জনপ্রবাহ ঝল্‌মল্ করিতেছে, আমাদের ছোটখাট আলাপে-বিলাপে সমস্ত সমাজ মুখরিত হইয়া আছে।

আমরা যাহাকে ব্যর্থ বলি, প্রকৃতির অধিকাংশই তাই। সূর্য্যকিরণের বেশির ভাগ শূন্যে বিকীর্ণ হয়, গাছের মুকুল অতি অল্পই ফল পর্য্যন্ত টিঁকে। কিন্তু সে যাঁহার ধন তিনিই বুঝিবেন। সে ব্যয় অপব্যয় কি না, বিশ্বকর্ম্মার খাতা না দেখিলে তাহার বিচার করিতে পারি না। আমরাও তেমনি অধিকাংশই পরস্পরকে সঙ্গদান ও গতিদান ছাড়া আর-কোন কাজে লাগি না; সেজন্য নিজেকে ও অন্যকে কোন দোষ না দিয়া, ছট্‌ফট্ না করিয়া, প্রফুল্ল হাস্যে ও প্রসন্নগানে সহজেই অখ্যাত অবসানের মধ্যে যদি শান্তিলাভ করি, তাহা হইলেই সেই উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যেই যথার্থভাবে জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারি।

বিধাতা যদি আমাকে ব্যর্থ করিয়াই সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে আমি ধন্য; কিন্তু যদি উপদেষ্টার তাড়নায় আমি মনে করি আমাকে উপকার করিতেই হইবে, কাজে লাগিতেই হইবে, তবে যে উৎকট ব্যর্থতার সৃষ্টি করি, তাহা আমার স্বকৃত। তাহার জবাবদিহী আমাকে করিতে হইবে। পরের উপকার করিতে সকলেই জন্মাই নাই—অতএব উপকার না করিলে লজ্জা নাই। মিশনারী হইয়া চীন উদ্ধার করিতে না-ই গেলাম; —দেশে থাকিয়া শেয়াল শিকার করিয়া ও ঘোড়দৌড়ে জুয়া খেলিয়া

দিন-কাটানকে যদি ব্যর্থতা বল, তবে তাহা চীন-উদ্ধারচেষ্টার মত এমন লোমহর্ষক নিদারুণ ব্যর্থতা নহে।

সকল ঘাস ধান হয় না। পৃথিবীতে ঘাসই প্রায় সমস্ত, ধান অল্পই। কিন্তু ঘাস যেন আপনার স্বাভাবিক নিষ্ফলতা লইয়া বিলাপ না করে— সে যেন স্মরণ করে যে, পৃথিবীর শুষ্কধূলীকে সে শ্যামলতার দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছে, রৌদ্রতাপকে সে চিরপ্রসন্ন স্নিগ্ধতার দ্বারা কোমল করিয়া লইতেছে। বোধ করি ঘাসজাতির মধ্যে কুশতৃণ গায়ের জোরে ধান্য হইবার চেষ্টা করিয়াছিল—বোধ করি, সামান্য ঘাস হইয়া না থাকিবার জন্য, পরের প্রতি একান্ত মনোনিবেশ করিয়া জীবনকে সার্থক করিবার জন্য তাহার মধ্যে অনেক উত্তেজনা জন্মিয়াছিল—তবু সে ধান্য হইল না। কিন্তু সর্ব্বদা পরের প্রতি তাহার তীক্ষ্ণলক্ষ্য নিবিষ্ট করিবার একাগ্র চেষ্টা কিরূপ, তাহা পরই বুঝিতেছে। মোটের উপর এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এরূপ উগ্র পরপরায়ণতা বিধাতার অভিপ্রেত নহে। ইহা অপেক্ষা সাধারণ তৃণের খ্যাতিহীন, স্নিগ্ধ-সুন্দর, বিনম্র-কোমল নিষ্ফলতা ভাল।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে মানুষ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—পনেরো-আনা এবং বাকি এক-আনা। পনেরো-আনা শান্ত এবং এক-আনা অশান্ত। পনেরো-আনা অনাবশ্যক এবং এক-আনা আবশ্যক। বাতাসে চলনশীল জ্বলনধর্ম্মী অক্সিজেনের পরিমাণ অল্প, স্থির-শান্ত নাইট্রোজেন্‌ই অনেক। যদি তাহার উল্টা হয়, তবে পৃথিবী জ্বলিয়া ছাই হয়। তেমনি সংসারে যখন কোন-একদল পনেরো-আনা, এক-আনার মতই অশান্ত ও আবশ্যক হইয়া উঠিবার উপক্রম করে, তখন জগতে আর কল্যাণ নাই, তখন যাহাদের অদৃষ্টে মরণ আছে, তাহাদিগকে মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

১৩০২।

নববর্ষা।

যৌবনে নিজের অন্ত পাই নাই, সংসারেরও অন্ত ছিল না। আমি কি যে হইব, না হইব, কি করিতে পারি, না পারি, কাজে ভাবে অনুভাবে আমার প্রকৃতির দৌড় কতদূর, তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, সংসারও অনির্দ্দিষ্ট রহস্যপূর্ণ ছিল। এখন নিজের সম্বন্ধে সকল সম্ভাবনার সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি; পৃথিবীও সেই সঙ্গে সঙ্কুচিত হইয়া গেছে। এখন ইহা আমারি আপিসঘর, বৈঠকখানা, দরদালানের সামিল হইয়া পড়িয়াছে। সেই ভাবেই পৃথিবী এত বেশি অভ্যস্ত পরিচিত হইয়া গেছে যে, ভুলিয়া গেছি এমন কত আপিসঘর, বৈঠকখানা, দরদালান, ছায়ার মত এই পৃথিবীর উপর দিয়া গেছে, ইহাতে চিহ্নও রাখিতে পারে নাই। কত প্রৌঢ় নিজের মাম্‌লা-মকদ্দমার মন্ত্রগৃহকেই পৃথিবীর ধ্রুব কেন্দ্রস্থল গণ্য করিয়া তাকিয়ার উপর ঠেসান্‌ দিয়া বসিয়াছিল, তাহাদের নাম তাহাদের ভস্মের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে উড়িয়া গেছে, সে এখন আর খুঁটিয়া পাইবার জো নাই—তবু পৃথিবী সমান বেগে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিতেছে।

কিন্তু আষাঢ়ের মেঘ প্রতি বৎসর যখনি আসে, তখনই তাহার নূতনত্বে রসাক্রান্ত ও পুরাতনত্বে পুঞ্জীভূত হইয়া আসে। তাহাকে আমরা ভুল করি না, কারণ, সে আমাদের ব্যবহারের বাহিরে থাকে। আমার সঙ্কোচের সঙ্গে সে সঙ্কুচিত হয় না। যখন বন্ধুর দ্বারা বঞ্চিত, শত্রুর দ্বারা পীড়িত, দুরদৃষ্টের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছি, তখন যে কেবল হৃদয়ের মধ্যে বেদনার চিহ্ন লাগিয়াছে, ললাটের উপর বলি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা নহে, যে পৃথিবী আমার চারিদিকে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, আমার আঘাতের দাগ তাহার উপর পড়িয়াছে। তাহার জলস্থল আমার বেদনায় বিক্ষত, আমার দুশ্চিন্তায় চিহ্নিত। আমার উপর যখন অস্ত্র আসিয়া

পড়িয়াছে, তখন আমার চারিদিকের পৃথিবী সরিয়া দাঁড়ায় নাই, শর আমাকে ভেদ করিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিয়াছে। এমনি করিয়া বারংবার আমার সুখদুঃখের ছাপ লাগিয়া পৃথিবীটা আমারই বলিয়া চিহ্নিত হইয়া গেছে।

মেঘে আমার কোন চিহ্ন নাই। সে পথিক আসে যায়, থাকে না। আমার জরা তাহাকে স্পর্শ করিবার অবকাশ পায় না। আমার আশা-নৈরাশ্য হইতে সে বহুদূরে।

এই জন্য, কালিদাস উজ্জয়িনীর প্রাসাদ-শিখর হইতে যে আষাঢ়ের মেঘ দেখিয়াছিলেন, আমরাও সেই মেঘ দেখিয়াছি, ইতিমধ্যে পরিবর্ত্তমান মানুষের ইতিহাস তাহাকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু সে অবন্তী, সে বিদিশা কোথায়? মেঘদূতের মেঘ প্রতিবৎসর চিরনূতন চিরপুরাতন হইয়া দেখা দেয়, বিক্রমাদিত্যের যে উজ্জয়িনী মেঘের চেয়ে দৃঢ় ছিল, বিনষ্ট স্বপ্নের মত তাহাকে আর ইচ্ছা করিলে গড়িবার জো নাই।

মেঘ দেখিলে "সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ" সুখিলোকেরও আনমনা ভাব হয়, এইজন্যই। মেঘ মনুষ্যলোকের কোন ধার ধারে না বলিয়া, মানুষকে অভ্যস্ত গণ্ডীর বাহিরে লইয়া যায়। মেঘের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের চিন্তা, চেষ্টা, কাজকর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া, সে আমাদের মনকে ছুটি দেয়। মন তখন বাঁধন মানিতে চাহে না, প্রভুশাপে নির্ব্বাসিত যক্ষের বিরহ তখন উদ্দাম হইয়া উঠে। প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ, সংসারের সম্বন্ধ; মেঘ সংসারের এই সকল প্রয়োজনীয় সম্বন্ধগুলাকে ভুলাইয়া দেয়, তখনি হৃদয় বাঁধ ভাঙিয়া আপনার পথ বাহির করিতে চেষ্টা করে।

মেঘ আপনার নিত্যনূতন চিত্রবিন্যাসে, অন্ধকারে, গর্জ্জনে, বর্ষণে, চেনা পৃথিবীর উপর একটা প্রকাণ্ড অচেনার আভাস নিক্ষেপ করে,—একটা বহুদূর কালের এবং বহুদূর দেশের নিবিড় ছায়া ঘনাইয়া তোলে,—

তখন পরিচিত পৃথিবীর হিসাবে যাহা অসম্ভব ছিল, তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কর্ম্মপাশবদ্ধ প্রিয়তম যে আসিতে পারে না, পথিকবধূ তখন এ কথা আর মানিতে চাহে না। সংসারের কঠিন নিয়ম সে জানে, কিন্তু জানে মাত্র; সে নিয়ম যে এখনো বলবান্ আছে, নিবিড় বর্ষার দিনে এ কথা তাহার হৃদয়ে প্রতীতি হয় না।

সেই কথাই ভাবিতেছিলাম, ভোগের দ্বারা এই বিপুল পৃথিবী—এই চিরকালের পৃথিবী, আমার কাছে খর্ব্ব হইয়া গেছে। আমি তাহাকে যতটুকু পাইয়াছি, তাহাকে ততটুকু বলিয়াই জানি, আমার ভোগের বাহিরে তাহার অস্তিত্ব আমি গণ্যই করি না। জীবন শক্ত হইয়া বাঁধিয়া গেছে, সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের আবশ্যক পৃথিবীটুকুকে টানিয়া আঁটিয়া লইয়াছে। নিজের মধ্যে এবং নিজের পৃথিবীর মধ্যে এখন আর কোন রহস্য দেখিতে পাই না বলিয়াই শান্ত হইয়া আছি; নিজেকে সম্পূর্ণ জানি মনে করি এবং নিজের পৃথিবীটুকুকেও সম্পূর্ণ জানিয়াছি বলিয়া স্থির করিয়াছি। এমন সময় পূর্ব্বদিগন্ত স্নিগ্ধ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া কোথা হইতে সেই শত-শতাব্দী পূর্ব্বেকার কালিদাসের মেঘ আসিয়া উপস্থিত হয়! সে আমার নহে, আমার পৃথিবীটুকুর নহে; সে আমাকে কোন্ অলকা-পুরীতে, কোন্ চিরযৌবনের রাজ্যে, চিরবিচ্ছেদের বেদনায়, চিরমিলনের আশ্বাসে, চিরসৌন্দর্য্যের কৈলাসপুরীর পথচিহ্নহীন তীর্থাভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে! তখন, পৃথিবীর যেটুকু জানি সেটুকু তুচ্ছ হইয়া যায়, যাহা জানিতে পারি নাই তাহাই বড় হইয়া উঠে, যাহা পাইলাম না তাহাকেই লব্ধ জিনিষের চেয়ে বেশি সত্য মনে হইতে থাকে। জানিতে পারি, আমার জীবনে, আমার শক্তিতে, অতি অল্পই অধিকার করিতে পারিয়াছি, যাহা বৃহৎ তাহাকে স্পর্শও করি নাই।

আমার নিত্যকর্ম্মক্ষেত্রকে নিত্যপরিচিত সংসারকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া সজলমেঘ-মেদুর পরিপূর্ণ নববর্ষা আমাকে অজ্ঞাত ভাবলোকের

মধ্যে সমস্ত বিধিবিধানের বাহিরে একেবারে একাকী দাঁড় করাইয়া দেয়,—পৃথিবীর এই কয়টা বৎসর কাড়িয়া লইয়া আমাকে একটি প্রকাণ্ড পরমায়ুর বিশালত্বের মাঝখানে স্থাপন করে; আমাকে রামগিরি আশ্রমের জনশূন্য শৈলশৃঙ্গের শিলাতলে সঙ্গিহীন ছাড়িয়া দেয়। সেই নির্জ্জন শিখর, এবং আমার কোন এক চিরনিকেতন, অন্তরাত্মার চিরগম্যস্থান অলকাপুরীর মাঝখানে একটি সুবৃহৎ-সুন্দর-পৃথিবী পড়িয়া আছে মনে পড়ে;—নদীকলধ্বনিত, সানুমৎপর্ব্বতবন্ধুর, জম্বুকুঞ্জচ্ছায়ান্ধকার, নব-বারিসিঞ্চিত-যূথীসুগন্ধি একটি বিপুল পৃথিবী। হৃদয় সেই পৃথিবীর বনে বনে গ্রামে গ্রামে শৃঙ্গে শৃঙ্গে নদীর কূলে কূলে ফিরিতে ফিরিতে, অপরিচিত সুন্দরের পরিচয় লইতে লইতে, দীর্ঘ বিরহের শেষ মোক্ষ-স্থানে যাইবার জন্য মানসোৎক হংসের ন্যায় উৎসুক হইয়া উঠে।

মেঘদূত ছাড়া নববর্ষার কাব্য কোন সাহিত্যে কোথাও নাই। ইহাতে বর্ষার সমস্ত অন্তর্বেদনা নিত্যকালের ভাষায় লিখিত হইয়া গেছে। প্রকৃতির সাংবৎসরিক মেঘোৎসবের অনির্ব্বচনীয় কবিত্বগাথা মানবের ভাষায় বাঁধা পড়িয়াছে।

পূর্ব্বমেঘে বৃহৎ-পৃথিবী আমাদের কল্পনার কাছে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। আমরা সম্পন্ন গৃহস্থটি হইয়া আরামে সন্তোষের অর্দ্ধনিমীলিতলোচনে যে গৃহটুকুর মধ্যে বাস করিতেছিলাম, কালিদাসের মেঘ "আষাঢ়স্য প্রথম-দিবসে" হঠাৎ আসিয়া আমাদিগকে সেখান হইতে ঘরছাড়া করিয়া দিল। আমাদের গোয়ালঘর-গোলাবাড়ীর বহুদূরে যে আবর্ত্তচঞ্চলা নর্ম্মদা ভ্রূকুটি রচনা করিয়া চলিয়াছে, যে চিত্রকূটের পাদকুঞ্জ প্রফুল্ল নব নীপে বিকশিত, উদয়নকথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধদের দ্বারের নিকট যে চৈত্য-বট শুককাক-লীতে মুখর, তাহাই আমাদের পরিচিত ক্ষুদ্র সংসারকে নিরস্ত করিয়া বিচিত্র সৌন্দর্য্যের চিরসত্যে উদ্ভাসিত হইয়া দেখা দিয়াছে।

বিরহীর ব্যগ্রতাতেও কবি পথসংক্ষেপ করেন নাই। আষাঢ়ের

নীলাভ-মেঘচ্ছায়াবৃত নগ-নদী-নগর-জনপদের উপর দিয়া রহিয়া রহিয়া ভাবাবিষ্ট অলসগমনে যাত্রা করিয়াছেন। যে তাঁহার মুগ্ধনয়নকে অভ্যর্থনা করিয়া ডাকিয়াছে, তিনি তাহাকে আর "না" বলিতে পারেন নাই। পাঠকের চিত্তকে কবি বিরহের বেগে বাহির করিয়াছেন, আবার পথের সৌন্দর্য্যে মন্থর করিয়া তুলিয়াছেন। যে চরম স্থানে মন ধাবিত হইতেছে, তাহার সুদীর্ঘ পথটিও মনোহর, সে পথকে উপেক্ষা করা যায় না।

বর্ষায় অভ্যস্ত পরিচিত সংসার হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া মন বাহিরের দিকে যাইতে চায়, পূর্ব্বমেঘে কবি আমাদের সেই আকাঙ্ক্ষাকে উদ্বেলিত করিয়া তাহারই কলগান জাগাইয়াছেন—আমাদিগকে মেঘের সঙ্গী করিয়া অপরিচিত পৃথিবীর মাঝখান দিয়া লইয়া চলিয়াছেন। সে পৃথিবী 'অনাঘ্রাতং পুষ্পম্', তাহা আমাদের প্রাত্যহিক ভোগের দ্বারা কিছুমাত্র মলিন হয় নাই, সে পৃথিবীতে আমাদের পরিচয়ের প্রাচীরদ্বারা কল্পনা কোনখানে বাধা পায় না। যেমন ঐ মেঘ, তেমনি সেই পৃথিবী। আমার এই সুখদুঃখ-ক্লান্তি-অবসাদের জীবন তাহাকে কোথাও স্পর্শ করে নাই। প্রৌঢ়বয়সের নিশ্চয়তা বেড়া দিয়া ঘের দিয়া তাহাকে নিজের বাস্তুবাগানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয় নাই।

অজ্ঞাত নিখিলের সহিত নবীন পরিচয়, এই হইল পূর্ব্বমেঘ। নব মেঘের আর একটি কাজ আছে। সে আমাদের চারিদিকে একটি পরম-নিভৃত পরিবেষ্টন রচনা করিয়া, "জননান্তরসৌহৃদানি" মনে করাইয়া দেয় —অপরূপ সৌন্দর্য্যলোকের মধ্যে কোন একটি চিরজ্ঞাত চিরপ্রিয়ের জন্য মনকে উতলা করিয়া তোলে।

পূর্ব্বমেঘে বহুবিচিত্রের সহিত সৌন্দর্য্যের পরিচয় এবং উত্তরমেঘে সেই একের সহিত আনন্দের সম্মিলন। পৃথিবীতে বহুর মধ্য দিয়া সেই সুখের যাত্রা, এবং স্বর্গলোকে একের মধ্যে সেই অভিসারের পরিণাম!

নববর্ষার দিনে এই বিষয়কর্ম্মের ক্ষুদ্র সংসারকে কে না বলিবে নির্ব্বাসন! প্রভুর অভিশাপেই এখানে আট্‌কা পড়িয়া আছি। মেঘ আসিয়া বাহিরে যাত্রা করিবার জন্য আহ্বান করে, তাহাই পূর্ব্বমেঘের গান এবং যাত্রার অবসানে চিরমিলনের জন্য আশ্বাস দেয়, তাহাই উত্তরমেঘের সংবাদ।

সকল কবির কাব্যেই গূঢ় অভ্যন্তরে এই পূর্ব্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে। সকল বড় কাব্যই আমাদিগকে বৃহতের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনে ও নিভৃতের দিকে নির্দ্দেশ করে। প্রথমে বন্ধন ছেদন করিয়া বাহির করে, পরে একটি ভূমার সহিত বাঁধিয়া দেয়। প্রভাতে পথে লইয়া আসে, সন্ধ্যায় ঘরে লইয়া যায়। একবার তানের মধ্যে আকাশ-পাতাল ঘুরাইয়া সমের মধ্যে পূর্ণ আনন্দে দাঁড় করাইয়া দেয়।

যে কবির তান আছে, কিন্তু কোথাও সম নাই, যাহার মধ্যে, কেবল উদ্যম আছে, আশ্বাস নাই, তাহার কবিত্ব উচ্চকাব্যশ্রেণীতে স্থায়ী হইতে পারে না। শেষের দিকে একটা কোথাও পৌঁছাইয়া দিতে হইবে, এই ভরসাতেই আমরা আমাদের চিরাভ্যস্ত সংসারের বাহির হইয়া কবির সহিত যাত্রা করি,—পুষ্পিত পথের মধ্য দিয়া আনিয়া হঠাৎ একটা শূন্য-গহ্বরের ধারের কাছে ছাড়িয়া দিলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। এইজন্য কোন কবির কাব্য পড়িবার সময় আমরা এই দুটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার পূর্ব্বমেঘ আমাদিগকে কোথায় বাহির করে এবং উত্তরমেঘ কোন্ সিংহদ্বারের সম্মুখে আনিয়া উপনীত করে।

১৩০৮।

পরনিন্দা।

পরনিন্দা পৃথিবীতে এত প্রাচীন এবং এত ব্যাপক যে, সহসা ইহার বিরুদ্ধে একটা যে-সে মত প্রকাশ করা ধৃষ্টতা হইয়া পড়ে।

নোনা জল পানের পক্ষে উপযোগী নহে, এ কথা শিশুও জানে—কিন্তু যখন দেখি, সাত সমুদ্রের জল নুনে পরিপূর্ণ; যখন দেখি, এই নোনা জল সমস্ত পৃথিবীকে বেড়িয়া আছে, তখন এ কথা বলিতে কোন-মতেই সাহস হয় না যে, সমুদ্রের জলে নুন না থাকিলেই ভাল হইত। নিশ্চয়ই ভাল হইত না—হয় ত লবণজলের অভাবে সমস্ত পৃথিবী পচিয়া উঠিত।

তেমনি, পরনিন্দা সমাজের কণায় কণায় যদি মিশিয়া না থাকিত, তবে নিশ্চয়ই একটা বড়রকমের অনর্থ ঘটিত। উহা লবণের মত সমস্ত সংসারকে বিকার হইতে রক্ষা করিতেছে।

পাঠক বলিবেন, "বুঝিয়াছি। তুমি যাহা বলিতে চাও, তাহা অত্যন্ত পুরাতন। অর্থাৎ নিন্দার ভয়ে সমাজ প্রকৃতিস্থ হইয়া আছে।"

এ কথা যদি পুরাতন হয়, তবে আনন্দের বিষয়। আমি ত বলিয়াছি, যাহা পুরাতন, তাহা বিশ্বাসের যোগ্য।

বস্তুত নিন্দা না থাকিলে পৃথিবীতে জীবনের গৌরব কি থাকিত? একটা ভাল কাজে হাত দিলাম, তাহার নিন্দা কেহ করে না—সে ভাল কাজের দাম কি! একটা ভাল কিছু লিখিলাম, তাহার নিন্দুক কেহ নাই, ভাল গ্রন্থের পক্ষে এমন মর্ম্মান্তিক অনাদর কি হইতে পারে! জীবনকে ধর্ম্মচর্চ্চায় উৎসর্গ করিলাম, যদি কোন লোক তাহার মধ্যে গূঢ় মন্দ অভিপ্রায় না দেখিল, তবে সাধুতা যে নিতান্তই সহজ হইয়া পড়িল!

মহত্ত্বকে পদে পদে নিন্দার কাঁটা মাড়াইয়া চলিতে হয়। ইহাতে যে হার মানে, বীরের সদ্গতি সে লাভ করে না। পৃথিবীতে নিন্দা দোষীকে

সংশোধন করিবার জন্য আছে তাহা নহে, মহত্ত্বকে গৌরব দেওয়া তাহার একটা মস্ত কাজ !

নিন্দা-বিরোধ গায়ে বাজে না, এমন কথা অল্প লোকই বলিতে পারে। কোন সহৃদয় লোক ত বলিতে পারে না। যাহার হৃদয় বেশি, তাহার ব্যথা পাইবার শক্তিও বেশি। যাহার হৃদয় আছে, সংসারে সেই লোকই কাজের মত কাজে হাত দেয়। আবার লোকের মত কাজ দেখিলেই নিন্দার ধার চারগুণ শাণিত হইয়া উঠে। ইহাতেই দেখা যায়, বিধাতা যেখানে অধিকার বেশি দিয়াছেন, সেইখানেই দুঃখ এবং পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন করিয়াছেন। বিধাতার সেই বিধানই জয়ী হউক ! নিন্দা, দুঃখ, বিরোধ যেন ভাল লোকের, গুণী লোকের ভাগ্যেই বেশি করিয়া জোটে। যে যথার্থরূপে ব্যথা ভোগ করিতে জানে, সেই যেন ব্যথা পায় ! অযোগ্য ক্ষুদ্র ব্যক্তির উপরে যেন নিন্দাবেদনার অনাবশ্যক অপব্যয় না হয় !

সরলহৃদয় পাঠক পুনশ্চ বলিবেন—"জানি, নিন্দায় উপকার আছে। যে লোক দোষ করে, তাহার দোষকে ঘোষণা করা ভাল ; কিন্তু যে করে না, তাহার নিন্দায় সংসারে ভাল হইতেই পারে না। মিথ্যা-জিনিষটা কোন অবস্থাতেই ভাল নয়।"

এ হইলে ত নিন্দা টিকে না। প্রমাণ লইয়া দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করা, সে ত হইল বিচার। সে গুরুভার কয়জন লইতে পারে, এবং এত সময়ই বা কাহার হাতে আছে ? তাহা ছাড়া পরের সম্বন্ধে এত অতিরিক্ত মাত্রায় কাহারো গরজ নাই। যদি থাকিত, তবে পরের পক্ষে তাহা একেবারেই অসহ্য হইত। নিন্দুককে সহ্য করা যায়, কারণ, তাহার নিন্দুকতাকে নিন্দা করিবার সুখ আমারো হাতে আছে, কিন্তু বিচারককে সহ্য করিবে কে ?

বস্তুত আমরা অতি সামান্য প্রমাণেই নিন্দা করিয়া থাকি, নিন্দার সেই লাঘবতাটুকু না থাকিলে সমাজের হাড় গুঁড়া হইয়া যাইত। নিন্দার

রায় চূড়ান্ত রায় নহে—নিন্দিত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তাহার প্রতিবাদ না করিতেও পারে। এমন কি, নিন্দাবাক্য হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াই সুবুদ্ধি বলিয়া গণ্য। কিন্তু নিন্দা যদি বিচারকের রায় হইত, তবে সুবুদ্ধিকে উকীল-মোক্তারের শরণ লইতে হইত। যাঁহারা জানেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন, উকীল-মোক্তারের সহিত কারবার হাসির কথা নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, সংসারের প্রয়োজনহিসাবে নিন্দার যতটুকু গুরুত্ব আবশ্যক তাহাও আছে, যতটুকু লঘুত্ব থাকা উচিত তাহারো অভাব নাই।

পূর্ব্বে যে পাঠকটি আমার কথায় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন—"তুচ্ছ অনুমানের উপরেই হউক বা নিশ্চিত প্রমাণের উপরেই হউক্, নিন্দা যদি করিতেই হয় তবে ব্যথার সহিত করা উচিত—নিন্দায় সুখ পাওয়া উচিত নহে।"

এমন কথা যিনি বলিবেন, তিনি নিশ্চয়ই সহৃদয় ব্যক্তি। সুতরাং তাঁহার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত—নিন্দায় নিন্দিত ব্যক্তি ব্যথা পায়, আবার নিন্দুকও যদি বেদনা বোধ করে, তবে সংসারে দুঃখবেদনার পরিমাণ কিরূপ অপরিমিতরূপে বাড়িয়া উঠে! তাহা হইলে নিমন্ত্রণসভা নিস্তব্ধ, বন্ধুসভা বিষাদে ম্রিয়মাণ, সমালোচকের চক্ষু অশ্রুপ্লুত এবং তাঁহার পাঠকগণের হৃদ্‌গহ্বর হইতে উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ঘনঘন উচ্ছ্বসিত। আশা করি, শনিগ্রহের অধিবাসীদেরও এমন দশা নয়!

তা ছাড়া সুখও পাইব না অথচ নিন্দাও করিব, এমন ভয়ঙ্কর নিন্দুক মনুষ্যজাতিও নহে। মানুষকে বিধাতা এতই সৌখীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন যে, যখন সে নিজের পেট ভরাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে যাইতেছে, তখনও ক্ষুধানিবৃত্তি ও রুচিপরিতৃপ্তির যে সুখ, সেটুকুও তাহার চাই—সেই মানুষ ট্রামভাড়া করিয়া বন্ধুর বাড়ী গিয়া পরের নিন্দা করিয়া আসিবে অথচ তাহাতে সুখ পাইবে না, যে ধর্ম্মনীতি এমন অসম্ভব প্রত্যাশা করে তাহা পূজনীয়, কিন্তু পালনীয় নহে।

আবিষ্কারমাত্রেরই মধ্যে সুখের অংশ আছে। শিকার কিছুমাত্র সুখের হইত না, যদি মৃগ যেখানে-সেখানে থাকিত এবং ব্যাধকে দেখিয়া পলাইয়া না যাইত। মৃগের উপরে আমাদের আক্রোশ আছে বলিয়াই যে তাহাকে মারি তাহা নহে, সে বেচারা গহন বনে থাকে এবং সে পলায়নপটু বলিয়া তাহাকে কাজেই মারিতে হয়।

মানুষের চরিত্র, বিশেষত তাহার দোষগুলি, ঝোপঝাপের মধ্যেই থাকে এবং পায়ের শব্দ শুনিলেই দৌড় মারিতে চায়, এইজন্যই নিন্দার এত সুখ। আমি নাড়ী-নক্ষত্র জানি, আমার কাছে কিছুই গোপন নাই, নিন্দুকের মুখে এ কথা শুনিলেই বোঝা যায়, সে ব্যক্তি জাত-শিকারী। তুমি তোমার যে অংশটা দেখাইতে চাও না, আমি সেই-টাকেই তাড়াইয়া ধরিয়াছি। জলের মাছকে আমি ছিপ ফেলিয়া ধরি; আকাশের পাখীকে বাণ মারিয়া পাড়ি, বনের পশুকে জাল পাতিয়া বাঁধি —ইহা কত সুখের! যাহা লুকায় তাহাকে বাহির করা, যাহা পালায় তাহাকে বাঁধা, ইহার জন্যে মানুষ কি না করে!

দুর্লভতার প্রতি মানুষের একটা মোহ আছে। সে মনে করে, যাহা সুলভ তাহা খাঁটি নহে, যাহা উপরে আছে তাহা আবরণমাত্র, যাহা লুকা-ইয়া আছে তাহাই আসল। এইজন্যই গোপনের পরিচয় পাইলে সে আর-কিছু বিচার না করিয়া প্রকৃতের পরিচয় পাইলাম বলিয়া হঠাৎ খুসি হইয়া উঠে। এ কথা সে মনে করে না যে উপরের সত্যের চেয়ে নীচের সত্য যে বেশি সত্য তাহা নহে;—এ কথা তাহাকে বোঝানো শক্ত যে, সত্য যদি বাহিরে থাকে তবুও তাহা সত্য, এবং ভিতরে যেটা আছে সেটা যদি সত্য না হয়, তবে তাহা অসত্য। এই মোহবশতই কাব্যের সরল সৌন্দর্য্য অপেক্ষা তাহার গভীর তত্ত্বকে পাঠক অধিক সত্য বলিয়া মনে করিতে ভালবাসে এবং বিজ্ঞ লোকেরা নিশাচর পাপকে আলোকচর সাধুতার অপেক্ষা বেশি বাস্তব বলিয়া তাহার গুরুত্ব অনুভব

আছে। এইজন্য মানুষের নিন্দা শুনিলেই মনে হয় তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গেল। পৃথিবীতে অতি অল্প লোকের সঙ্গেই আমাকে ঘরকন্না করিতে হয়, অথচ এত-শত লোকের প্রকৃত পরিচয় লইয়া আমার লাভটা কি? কিন্তু প্রকৃত পরিচয়ের জন্য ব্যগ্রতা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম—সেটা মনুষ্যত্বের প্রধান অঙ্গ—অতএব তাহার সঙ্গে বিবাদ করা চলে না;—কেবল যখন দুঃখ করিবার দীর্ঘ অবকাশ পাওয়া যায়, তখন এই ভাবি যে, যাহা সুন্দর, যাহা সম্পূর্ণ, যাহা ফুলের মত বাহিরে বিকশিত হইয়া দেখা দেয়, তাহা বাহিরে আসে বলিয়াই বুদ্ধিমান্ মানুষ ঠকিবার ভয়ে তাহাকে বিশ্বাস করিয়া তাহাতে সম্পূর্ণ আনন্দ ভোগ করিতে সাহস করে না। ঠকাই কি সংসারের চবম ঠকা! না ঠকাই কি চরম লাভ!

কিন্তু এ সকল বিষয়েব ভার আমার উপরে নাই,—মনুষ্যচরিত্র আমি জন্মিবার বহুপূর্ব্বেই তৈরি হইয়া গেছে। কেবল এই কথাটা আমি বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টায় ছিলাম যে, সাধারণত মানুষ নিন্দা করিয়া যে সুখ পায়, তাহা বিদ্বেসেব সুখ নহে। বিদ্বেষ কখনই সাধারণভাবে সুখকর হইতে পারে না এবং বিদ্বেষ সমস্ত সমাজের স্তরে স্তরে পরিব্যাপ্ত হইলে সে বিষ হজম করা সমাজের অসাধ্য। আমরা বিস্তর ভাললোক, নিরীহলোককেও নিন্দা করিতে শুনিয়াছি, তাহার কারণ এমন নহে যে, সংসারে ভাললোক, নিরীহলোক নাই; তাহার কারণ এই যে, সাধারণত নিন্দার মূল প্রস্রবণটা মন্দভাব নয়।

কিন্তু বিদ্বেষমূলক নিন্দা সংসারে একেবারে নাই, এ কথা লিখিতে গেলে সত্যযুগের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। তবে সে নিন্দা সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার নাই। কেবল প্রার্থনা এই যে, এরূপ নিন্দা যাহার স্বভাবসিদ্ধ, সেই দুর্ভাগাকে যেন দয়া করিতে পারি!

১৩০৯।

বসন্তযাপন।

এই মাঠের পারে শালবনের নূতন কচিপাতার মধ্য দিয়া বসন্তের হাওয়া দিয়াছে।

অভিব্যক্তির ইতিহাসে মানুষের একটা অংশ ত গাছপালার সঙ্গে জড়ানো আছে। কোন এক সময়ে আমরা যে শাখামৃগ ছিলাম, আমাদের প্রকৃতিতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারও অনেক আগে কোনো এক আদিযুগে আমরা নিশ্চয়ই শাখী ছিলাম, তাহা কি ভুলিতে পারিয়াছি? সেই আদিকালের জনহীন মধ্যাহ্নে আমাদের ডালপালার মধ্যে বসন্তের বাতাস কাহাকেও কোন খবর না দিয়া যখন হঠাৎ হুহু করিয়া আসিয়া পড়িত, তখন কি আমরা প্রবন্ধ লিখিয়াছি, না, দেশের উপকার করিতে বাহির হইয়াছি? তখন আমরা সমস্ত দিন খাড়া দাঁড়াইয়া মূকের মত মূঢ়ের মত কাঁপিয়াছি—আমাদের সর্ব্বাঙ্গ ঝর্‌ঝর্‌ মর্‌মর্‌ করিয়া পাগলের মত গান গাহিয়াছে—আমাদের শিকড় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশাখাগুলির কচি-ডগা পর্য্যন্ত রসপ্রবাহে ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সেই আদিকালের ফাল্গুন-চৈত্র এম্‌নিতর রসে ভরা আলস্যে এবং অর্থহীন প্রলাপেই কাটিয়া যাইত। সেজন্য কাহারো কাছে কোন জবাবদিহি ছিল না।

যদি বল, অনুতাপের দিন তাহার পরে আসিত—বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের খরা চুপ করিয়া মাথা পাতিয়া লইতে হইত—সে কথা মানি। যেদিনকার যাহা, সেদিনকার তাহা এম্‌নি করিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। রসের দিনে ভোগ, দাহের দিনে ধৈর্য্য যদি সহজে আশ্রয় করা যায়, তবে সান্ত্বনার বর্ষাধারা যখন দশদিক্ পূর্ণ করিয়া নামিতে আরম্ভ করে, তখন তাহা মজ্জায় মজ্জায় পূরাপুরি গ্রহণ করিবার সামর্থ্য থাকে।

কিন্তু এ সব কথা বলিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। লোকে

সন্দেহ করিতে পারে, রূপক আশ্রয় করিয়া আমি উপদেশ দিতে বসিয়াছি। সন্দেহ একেবারেই অমূলক বলা যায় না। অভ্যাস খারাপ হইয়া গেছে।

আমি এই বলিতেছিলাম যে, অভিব্যক্তির শেষ কোঠায় আসিয়া পড়াতে মানুষের মধ্যে অনেক ভাগ ঘটিয়াছে। জড়ভাগ, উদ্ভিদ্‌ভাগ, পশুভাগ, বর্ব্বরভাগ, সভ্যভাগ, দেবভাগ ইত্যাদি। এই ভিন্ন ভিন্ন ভাগের একএকটা বিশেষ জন্মঋতু আছে। কোন্ ঋতুতে কোন্ ভাগ পড়ে, তাহা নির্ণয় করিবার ভার আমি লইব না। একটা সিদ্ধান্তকে শেষ পর্য্যন্ত মিলাইয়া দিব পণ করিলে বিস্তর মিথ্যা বলিতে হয়। বলিতে রাজি আছি; কিন্তু এত পরিশ্রম আজ পারিব না।

আজ, পড়িয়া-পড়িয়া, সমুখে চাহিয়া-চাহিয়া যেটুকু সহজে মনে আসিতেছে, সেইটুকুই লিখিতে বসিয়াছি।

দীর্ঘ শীতের পর আজ মধ্যাহ্নে প্রান্তরের মধ্যে নববসন্ত নিশ্বসিত হইয়া উঠিতেই নিজের মধ্যে মনুষ্যজীবনের ভারি একটা অসামঞ্জস্য অনুভব করিতেছি। বিপুলের সহিত, সমগ্রের সহিত তাহার সুর মিলিতেছে না। শীতকালে আমার উপরে পৃথিবীর যে সমস্ত তাগিদ্ ছিল, আজও ঠিক সেই সব তাগিদ্‌ই চলিতেছে। ঋতু বিচিত্র, কিন্তু কাজ সেই একই। মনটাকে ঋতুপরিবর্ত্তনের উপরে জয়ী করিয়া তাহাকে অসাড় করিয়া যেন মস্ত একটা কি বাহাদুরী আছে! মন মস্ত লোক—সে কি না পারে! সে দক্ষিণে হাওয়াকেও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া হন্‌হন্ করিয়া বড়বাজারে ছুটিয়া চলিয়া যাইতে পারে! পারে স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাই বলিয়াই কি সেটা তাহাকে করিতেই হইবে! তাহাতে দক্ষিণে বাতাস বাসায় গিয়া [illegible] কিন্তু ক্ষতিটা কাহার হইবে?

এই ত অল্পদিন হইল, আমাদের [illegible] ও শালের ডাল

হইতে খস্‌খস্‌ করিয়া কেবলি পাতা খসিয়া পড়িতেছিল—ফাল্গুন দূরাগত পথিকের মত যেম্‌নি দ্বারের কাছে আসিয়া একটা হাঁফ ছাড়িয়া বসিয়াছে মাত্র, অম্‌নি আমাদের বনশ্রেণী পাতাখসানর কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া একেবারে রাতারাতিই কিসলয় গজাইতে সুরু করিয়া দিয়াছে।

আমরা মানুষ, আমাদের সেটি হইবার জো নাই। বাহিরে চারিদিকেই যখন হাওয়া বদল, পাতা বদল, রং বদল, আমরা তখনও গরুর গাড়ির বাহনটার মত পশ্চাতে পুরাতনের ভারাক্রান্ত জের সমানভাবে টানিয়া লইয়া একটানা রাস্তায় ধূলা উড়াইয়া চলিয়াছি। বাহক তখনো যে লড়ি লইয়া পাঁজরে ঠেলিতেছিল, এখনো সেই লড়ি!

হাতের কাছে পঞ্জিকা নাই—অনুমানে বোধ হইতেছে, আজ ফাল্গুনের প্রায় ১৫ই কি ১৬ই হইবে—বসন্তলক্ষ্মী আজ ষোড়শী কিশোরী। কিন্তু তবু আজও হপ্তায় হপ্তায় খবরের কাগজ বাহির হইতেছে—পড়িয়া দেখি, আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের হিতের জন্য আইন তৈরি করিতে সমানই ব্যস্ত এবং অপর পক্ষ তাহারই তন্নতন্ন বিচারে প্রবৃত্ত। বিশ্বজগতে এইগুলাই যে সর্ব্বোচ্চ ব্যাপার নয়—বড়লাট-ছোটলাট, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের উৎকট ব্যস্ততাকে কিছুমাত্র গণ্য না করিয়া দক্ষিণসমুদ্রের তরঙ্গোৎসবসভা হইতে প্রতিবৎসরের সেই চিরন্তন বার্ত্তাবহ নবজীবনের আনন্দসমাচার লইয়া ধরাতলে অক্ষয় প্রাণের আশ্বাস নূতন করিয়া প্রচার করিতে বাহির হয়, এটা মানুষের পক্ষে কম কথা নয়, কিন্তু এ সব কথা ভাবিবার জন্য আমাদের ছুটি নাই।

সেকালে আমাদের মেঘ ডাকিলে অনধ্যায় ছিল,—বর্ষার সময় প্রবাসীরা বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন। বাদ্‌লার দিনে যে পড়া যায় না, বা বর্ষার সময় বিদেশে কাজ করা অসম্ভব, এ কথা বলিতে পারি না—মানুষ স্বাধীন স্বতন্ত্র, মানুষ জ[illegible] নয়। কিন্তু জোর আছে বলিয়াই বিপুল প্রকৃতির [illegible] করিয়াই চলিতে হইবে,

এমন কি কথা আছে! বিশ্বের সহিত মানুষ নিজের কুটুম্বিতা স্বীকার করিলে, আকাশে নবনীলাঞ্জন মেঘোদয়ের খাতিরে পড়া বন্ধ ও কাজবন্ধ করিলে, দক্ষিণে হাওয়ার প্রতি একটুখানি শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া আইনের সমালোচনা বন্ধ রাখিলে মানুষ জগৎচরাচরের মধ্যে একটা বেসুরের মত বাজিতে থাকে না। পাঁজিতে তিথিবিশেষে বেগুন, শিম, কুষ্মাণ্ড নিষিদ্ধ আছে—আরো কতকগুলি নিষেধ থাকা দরকার,—কোন্ ঋতুতে খবরের কাগজ পড়া অবৈধ, কোন্ ঋতুতে আপিস্ কামাই না করা মহাপাতক, অরসিকের নিজবুদ্ধির উপর তাহা নির্ণয় করিবার ভার না দিয়া শাস্ত্রকারদের তাহা একেবারে বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

বসন্তের দিনে যে বিরহিণীর প্রাণ হাহা করে, এ কথা আমরা প্রাচীন কাব্যেই পড়িয়াছি—এখন এ কথা লিখিতে আমাদের সঙ্কোচ বোধ হয়, পাছে লোকে হাসে। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের মনের সম্পর্ক আমরা এম্‌নি করিয়াই ছেদন করিয়াছি। বসন্তে সমস্ত বনে-উপবনে ফুল ফুটিবার সময় উপস্থিত হয়—তখন তাহাদের প্রাণের অজস্রতা, বিকাশের উৎসব। তখন আত্মদানের উচ্ছ্বাসে তরুলতা পাগল হইয়া উঠে—তখন তাহাদের হিসাবের বোধমাত্র থাকে না; যেখানে দুটা ফল ধরিবে, সেখানে পঁচিশটা মুকুল ধরাইয়া বসে। মানুষই কি কেবল এই অজস্রতার স্রোত রোধ করিবে? সে আপনাকে ফুটাইবে না, ফলাইবে না, দান করিতে চাহিবে না, কেবলি কি ঘর নিকাইবে, বাসন মাজিবে—ও যাহাদের সে বালাই নাই, তাহারা বেলা চারটে পর্য্যন্ত পশমের গলাবন্ধ বুনিবে? আমরা কি এতই একান্ত মানুষ? আমরা কি বসন্তের নিগূঢ় রসসঞ্চার-বিকশিত তরুলতাপুষ্পপল্লবের কেহই নই? তাহারা যে আমাদের ঘরের আঙিনাকে ছায়ায় ঢাকিয়া, গন্ধে ভরিয়া, বাহু দিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহারা কি আমাদের এতই পর যে, তাহারা যখন ফুলে ফুটিয়া উঠিবে, আমরা তখন চাপকান পরিয়া আপিসে যাইব—

কোন অনির্ব্বচনীয় বেদনায় আমাদের হৃৎপিণ্ড তরুপল্লবের মত কাঁপিয়া উঠিবে না?

আমি ত আজ গাছপালার সঙ্গে বহু প্রাচীনকালের আত্মীয়তা স্বীকার করিব। ব্যস্ত হইয়া কাজ করিয়া বেড়ানই যে জীবনের অদ্বিতীয় সার্থকতা, এ কথা আজ আমি কিছুতেই মানিব না। আজ আমাদের সেই যুগান্তরের বড়দিদি বনলক্ষ্মীর ঘরে ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ। সেখানে আজ তরুলতার সঙ্গে নিতান্ত ঘরের লোকের মত মিশিতে হইবে—আজ ছায়ায় পড়িয়া সমস্তদিন কাটিবে—মাটিকে আজ দুই হাত ছড়াইয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে—বসন্তের হাওয়া যখন বহিবে, তখন তাহার আনন্দকে যেন আমার বুকের পাঁজরগুলার মধ্য দিয়া অনায়াসে হুহু করিয়া বহিয়া যাইতে দিই—সেখানে সে যেন এমনতর কোন ধ্বনি না জাগাইয়া তোলে, গাছপালারা যে ভাষা না বোঝে। এম্নি করিয়া চৈত্রের শেষপর্য্যন্ত মাটি, বাতাস ও আকাশের মধ্যে জীবনটাকে কাঁচা করিয়া সবুজ করিয়া ছড়াইয়া দিব—আলোতে-ছায়াতে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিব।

কিন্তু, হায়, কোন কাজই বন্ধ হয় নাই—হিসাবের খাতা সমানই খোলা রহিয়াছে। নিয়মের কলের মধ্যে কর্ম্মের ফাঁদের মধ্যে পড়িয়া গেছি—এখন বসন্ত আসিলেই কি, আর গেলেই কি!

মনুষ্যসমাজের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, এ অবস্থাটা ঠিক নহে। ইহার সংশোধন দরকার। বিশ্বের সহিত স্বতন্ত্র বলিয়াই যে মানুষের গৌরব, তাহা নহে। মানুষের মধ্যে বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই আছে বলিয়া মানুষ বড়। মানুষ জড়ের সহিত জড়, তরুলতার সঙ্গে তরু-লতা, মৃগপক্ষীর সঙ্গে মৃগপক্ষী। প্রকৃতি-রাজবাড়ীর নানা মহলের নানা দরজাই তাহার রহিয়াছে খোলা। কিন্তু খোলা থাকিলে কি হইবে? এক এক ঋতুতে এক এক মহল হইতে যখন উৎসবের নিমন্ত্রণ আসে, তখন

মানুষ যদি গ্রাহ্য না করিয়া আপন আড়তের গদিতে পড়িয়া থাকে, তবে এমন বৃহৎ অধিকার সে কেন পাইল? পুরা মানুষ হইতে হইলে তাহাকে সবই হইতে হইবে, এ কথা না মনে করিয়া মানুষ মনুষ্যত্বকে বিশ্ব-বিদ্রোহের একটা সঙ্কীর্ণধ্বজাস্বরূপ খাড়া করিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে কেন? কেন সে দম্ভ করিয়া বারবার এ কথা বলিতেছে, আমি জড় নহি, উদ্ভিদ্ নহি, পশু নহি, আমি মানুষ—আমি কেবল কাজ করি ও সমালোচনা করি, শাসন করি ও বিদ্রোহ করি! কেন সে এ কথা বলে না, আমি সমস্তই, সকলের সঙ্গেই আমার অবারিত যোগ আছে—স্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা আমার নহে!

হায়রে সমাজদাঁড়ের পাখি! আকাশের নীল আজ বিরহিণীর চোখ-দুটির মত স্বপ্নাবিষ্ট, পাতার সবুজ আজ তরুণীর কপোলের মত নবীন, বসন্তের বাতাস আজ মিলনের আগ্রহের মত চঞ্চল—তবু তোর পাখা-দুটা আজ বন্ধ, তবু তোর পায়ে আজ কর্ম্মের শিকল ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজিতেছে—এই কি মানবজন্ম!

১৩০৯।

অসম্ভব কথা।

এক যে ছিল রাজা।

তখন ইহার বেশী কিছু জানিবার আবশ্যক ছিল না। কোথাকার রাজা, রাজার নাম কি, এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গল্পের প্রবাহ রোধ করিতাম না। রাজার নাম শিলাদিত্য কি শালিবাহন, কাশী কাঞ্চি কনোজ কোশল অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের মধ্যে ঠিক কোন্‌খানটিতে তাঁহার

রাজত্ব, এ সকল ইতিহাস ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ছিল ;—আসল যে কথাটি শুনিলে অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিত এবং সমস্ত হৃদয় এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে চুম্বকের মত আকৃষ্ট হইত, সেটি হইতেছে—এক যে ছিল রাজা।

এখনকার পাঠক যেন একেবারে কোমর বাঁধিয়া বসে। গোড়াতেই ধরিয়া লয় লেখক মিথ্যা কথা বলিতেছে। সেইজন্য অত্যন্ত সেয়ানার মত মুখ করিয়া জিজ্ঞাসা করে—"লেখক মহাশয়, তুমি যে বলিতেছ এক যে ছিল রাজা, আচ্ছা বল দেখি, কে ছিল সেই রাজা!"

লেখকেরাও সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা প্রকাণ্ড প্রত্নতত্ত্ব-পণ্ডিতের মত মুখমণ্ডল চতুর্গুণ মণ্ডলাকার করিয়া বলে, "এক যে ছিল রাজা, তাহার নাম ছিল অজাতশত্রু।"

পাঠক চোক টিপিয়া জিজ্ঞাসা করে, "অজাতশত্রু? ভাল, কোন্ অজাতশত্রু বল দেখি?"

লেখক অবিচলিত মুখভাব ধারণ করিয়া বলিয়া যায়, "অজাতশত্রু ছিল তিন জন। একজন খৃষ্টজন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া দুই বৎসর আটমাস বয়ঃক্রম কালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবনের বিস্তারিত বিবরণ কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না।" অবশেষে দ্বিতীয় অজাতশত্রু সম্বন্ধে দশজন ঐতিহাসিকের দশ বিভিন্ন মত সমালোচনা শেষ করিয়া যখন গ্রন্থের নায়ক তৃতীয় অজাতশত্রু পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছায়, তখন পাঠক বলিয়া উঠে, "ওরে বাস্‌রে, কি পাণ্ডিত্য! এক গল্প শুনিতে আসিয়া কত শিক্ষাই হইল! এ লোকটাকে আর অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না! আচ্ছা লেখক মহাশয়, তার পরে কি হইল!"

হায়রে হায়, মানুষ ঠকিতেই চায়, ঠকিতেই ভালবাসে, অথচ পাছে কেহ নির্ব্বোধ মনে করে এ ভয়টুকুও ষোলআনা আছে; এইজন্য প্রাণপণে

সেয়ানা হইবার চেষ্টা করে। তাহার ফল হয় এই যে, সেই শেষকাণ্টা ঠকে কিন্তু বিস্তর আড়ম্বর করিয়া ঠকে।

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, "প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না, তাহা হইলে মিথ্যা জবাব শুনিতে হইবে না।" বালক সেইটি বোঝে, সে কোন প্রশ্ন করে না। এইজন্য রূপকথার সুন্দর মিথ্যাটুকু শিশুর মত উলঙ্গ, সত্যের মত সরল, সদ্য উৎসারিত উৎসের মত স্বচ্ছ—আর এখনকার দিনের সুচতুর মুখস্পরা মিথ্যা। কোথাও যদি তিলমাত্র ছিদ্র থাকে অম্নি ভিতর হইতে সমস্ত ফাঁকি ধরা পড়ে, পাঠক বিমুখ হয়, লেখক পালাইবার পথ পায় না।

শিশুকালে আমরা যথার্থ রসজ্ঞ ছিলাম, এইজন্য যখন গল্প শুনিতে বসিয়াছি তখন জ্ঞানলাভ করিবার জন্য আমাদের তিলমাত্র আগ্রহ উপস্থিত হইত না, এবং অশিক্ষিত সরল হৃদয়টি ঠিক বুঝিত আসল কথাটি কোন্‌টুকু। আর এখনকার দিনে এত বাহুল্য কথাও বকিতে হয়, এত অনাবশ্যক কথারও আবশ্যক হইয়া পড়ে! কিন্তু অবশেষে সেই আসল কথাটিতে গিয়া দাঁড়ায়—এক যে ছিল রাজা।

বেশ মনে আছে সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। কলিকাতা সহর একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। গলির মধ্যে একহাঁটু জল। মনে একান্ত আশা ছিল, আজ আর মাষ্টার আসিবে না। কিন্তু তবু তাঁহার আসার নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত ভীতচিত্তে পথের দিকে চাহিয়া বারান্দায় চৌকি লইয়া বসিয়া আছি। যদি বৃষ্টি একটু ধরিয়া আসিবার উপক্রম হয়, তবে একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করি, হে দেবতা আর একটুখানি! কোনমতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পার করিয়া দাও! তখন মনে হইত পৃথিবীতে বৃষ্টির আর কোন আবশ্যক নাই কেবল একটিমাত্র সন্ধ্যায় নগরপ্রান্তের একটিমাত্র ব্যাকুল বালককে মাষ্টারের করাল হস্ত হইতে রক্ষা করা ছাড়া। পুরাকালে কোন একটি নির্ব্বাসিত যক্ষও ত মনে

করিয়াছিল, আষাঢ়ে মেঘের বড় একটা কোন কাজ নাই, অতএব রামগিরিশিখরের একটিমাত্র বিরহীর দুঃখকথা বিশ্বপার হইয়া অলকার সৌধবাতায়নে কোন একটি বিরহিণীর কাছে লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কিছুমাত্র গুরুতর নহে; বিশেষতঃ পথটি যখন এমন সুরম্য এবং তাহার হৃদয়বেদনা এমন দুঃসহ।

বালকের প্রার্থনামতে না হৌক, ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতের বিশেষ কোন নিয়মানুসারে বৃষ্টি ছাড়িল না। কিন্তু হায় মাষ্টারও ছাড়িল না। গলির মোড়ে ঠিক সময়ে একটি পরিচিত ছাতা দেখা দিল—সমস্ত আশা-বাষ্প এক মুহূর্ত্তে ফাটিয়া বাহির হইয়া আমার বুকটি যেমন পাঁজরের মধ্যে মিলাইয়া গেল। পরপীড়ন পাপের যদি যথোপযুক্ত শাস্তি থাকে তবে নিশ্চয় পরজন্মে আমি মাষ্টার হইয়া এবং আমার মাষ্টার মহাশয় ছাত্র হইয়া জন্মিবেন। তাহার বিরুদ্ধে একটি আপত্তি এই যে, আমাকে মাষ্টার মহাশয়ের মাষ্টার হইতে গেলে অতিশয় অকালে ইহসংসার হইতে বিদায় লইতে হয়—অতএব আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত মার্জ্জনা করিলাম।

ছাতাটি দেখিবামাত্র ছুটিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। মা তখন দিদিমার সহিত মুখামুখী বসিয়া প্রদীপালোকে বিন্তি খেলিতেছিলেন। ঝুপ করিয়া একপাশে শুইয়া পড়িলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?" আমি মুখ হাঁড়ির মত করিয়া কহিলাম, "আমার অসুখ করিয়াছে, আজ আর আমি মাষ্টারের কাছে পড়িতে যাইব না।"

আশা করি, অপ্রাপ্তবয়স্ক কেহ আমার এ লেখা পড়িবে না, এবং স্কুলের কোন সিলেক্‌শন বহিতে আমার এ লেখা উদ্ধৃত হইবে না। কারণ, আমি যে কাজ করিয়াছিলাম তাহা নীতিবিরুদ্ধ এবং সেজন্য কোন শাস্তিও পাই নাই। বরঞ্চ আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল।

মা চাকরকে বলিয়া দিলেন—"আজ তবে থাক্, মাষ্টারকে যেতে বলে' দে।"

কিন্তু তিনি যেরূপ নিরুদ্বিগ্নচিত্তে বিস্তি খেলিতে লাগিলেন, তাহাতে বেশ বুঝা গেল যে, মা তাঁহার পুত্রের অসুখের উৎকট লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন; আমিও মনের সুখে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া খুব হাসিলাম—আমাদের উভয়ের মন উভয়ের কাছে অগোচর রহিল না।

কিন্তু সকলেই জানেন, এ প্রকারের অসুখ অধিকক্ষণ স্থায়ী করিয়া রাখা রোগীর পক্ষে বড়ই দুষ্কর। মিনিটখানেক না যাইতে যাইতে দিদিমাকে ধরিয়া পড়িলাম—দিদিমা, একটা গল্প বল। দুই চারিবার কোন উত্তর পাওয়া গেল না। মা বলিলেন; "রোস্ বাছা, খেলাটা আগে শেষ করি!"

আমি কহিলাম, "না, মা, খেলা তুমি কাল শেষ কোরো আজ দিদিমাকে গল্প বল্‌তে বল না!"

মা কাগজ ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "যাও খুড়ি! উহার সঙ্গে এখন কে পারিবে!" মনে মনে হয় ত ভাবিলেন—আমার ত কাল মাষ্টার আসিবে না, আমি কালও খেলিতে পারিব।

আমি দিদিমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া একেবারে মশারির মধ্যে বিছানার উপরে গিয়া উঠিলাম। প্রথমে খানিকটা পাশ-বালিশ জড়াইয়া, পা ছুঁড়িয়া নড়িয়াচড়িয়া মনের আনন্দ সম্বরণ করিতে গেল—তার পরে বলিলাম—গল্প বল।

তখনো ঝুপ্‌ঝুপ্ করিয়া বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছিল—দিদিমা মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন—এক যে ছিল রাজা।

তাহার এক রাণী। আঃ, বাঁচা গেল। সুয়ো এবং দুয়ো রাণী শুনিলেই বুকটা কাঁপিয়া উঠে—বুঝিতে পারি দুয়ো হতভাগিনীর বিপদের আর বড় বিলম্ব নাই। পূর্ব্ব হইতে মনে বিষম একটা উৎকণ্ঠা চাপিয়া থাকে।

যখন শোনা গেল আর কোন চিন্তার বিষয় নাই, কেবল রাজার পুত্র সন্তান হয় নাই বলিয়া রাজা ব্যাকুল হইয়া আছে এবং দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়া কঠিন তপস্যা করিবার জন্য বনগমনে উদ্যত হইয়াছে, তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। পুত্রসন্তান না হইলে যে, দুঃখের কোন কারণ আছে তাহা আমি বুঝিতাম না; আমি জানিতাম যদি কিছুর জন্যে বনে যাইবার কখনো আবশ্যক হয় সে কেবল মাষ্টারের কাছ হইতে পালাইবার অভিপ্রায়ে।

রাণী এবং একটি বালিকা-কন্যা ঘরে ফেলিয়া রাজা তপস্যা করিতে চলিয়া গেল। এক বৎসর দুই বৎসর করিয়া ক্রমে বারো বৎসর হইয়া যায় তবু রাজার আর দেখা নাই।

এ দিকে রাজকন্যা ষোড়শী হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু রাজা ফিরিল না।

মেয়ের মুখের দিকে চায়, আর রাণীর মুখে অন্নজল রুচে না। আহা, আমার এমন সোনার মেয়ে কি চিরকাল আইবড় থাকিবে? ওগো আমি কি কপাল করিয়াছিলাম?

অবশেষে রাণী রাজাকে অনেক অনুনয় করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, আমি আর কিছু চাহি না, তুমি একদিন কেবল আমার ঘরে আসিয়া খাইয়া যাও।

রাজা বলিলেন, আচ্ছা।

রাণী ত সেদিন বহুযত্নে চৌষট্টি ব্যঞ্জন স্বহস্তে রাঁধিলেন এবং সমস্ত সোনার থালে ও রূপার বাটিতে সাজাইয়া চন্দন কাষ্ঠের পিঁড়ি পাতিয়া দিলেন। রাজকন্যা চামর হাতে করিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা আজ বারো বৎসর পরে অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বসিলেন। রাজকন্যা রূপে আলো করিয়া দাঁড়াইয়া চামর করিতে লাগিলেন।

মেয়ের মুখের দিকে চায় আর খাওয়া হয় না। শেষে রাণীর দিকে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ গো রাণী এমন সোনার প্রতিমা লক্ষ্মী ঠাকুরুণটির মত এ মেয়েটি কে গা? এ কাহাদের মেয়ে?

রাণী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, হা আমার পোড়া কপাল! উহাকে চিনিতে পারিলে না? ও যে তোমারি মেয়ে।

রাজা বড় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—আমার সেই সেদিনকার এতটুকু মেয়ে আজ এত বড়টি হইয়াছে?

রাণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—তা' আর হইবে না? বল কি, আজ বারো বৎসর হইয়া গেল!

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—মেয়ের বিবাহ দাও নাই?

রাণী কহিলেন—তুমি ঘরে নাই উহার বিবাহ কে দেয়? আমি কি নিজে পাত্র খুঁজিতে বাহির হইব?

রাজা শুনিয়া হঠাৎ ভারি শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন—রোস, আমি কাল সকালে উঠিয়া রাজদ্বারে যাহার মুখ দেখিব তাহারই সহিত উহার বিবাহ দিয়া দিব।

রাজকন্যা চামর করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাতের বালাতে চূড়িতে ঠুংঠাং শব্দ হইতে লাগিল। রাজার আহার হইয়া গেল।

পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া রাজা দেখিলেন একটি ব্রাহ্মণের ছেলে রাজবাড়ির বাহিরে জঙ্গল হইতে শুক্না কাঠ সংগ্রহ করিতেছে! তাহার বয়স বছর সাত আট হইবে!

রাজা বলিলেন, ইহারই সহিত আমার মেয়ের বিবাহ দিব। রাজার হুকুম কে লঙ্ঘন করিতে পারে! তখনি ছেলেটিকে ধরিয়া তাহার সহিত রাজকন্যার মালা বদল করিয়া দেওয়া হইল।

আমি এই জায়গাটাতে দিদিমার খুব কাছে ঘেঁষিয়া গিয়া নিরতিশয়

ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম-তার পরে? নিজেকে সেই সাত আট বৎসরের সৌভাগ্যবান্ কাঠকুড়ানে ব্রাহ্মণের ছেলের স্থলাভিষিক্ত করিতে কি একটুখানি ইচ্ছা যায় নাই? যখন সেই রাত্রে ঝুপ্‌ঝুপ্ বৃষ্টি পড়িতে-ছিল, মিট্‌মিট্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছিল এবং গুন্‌গুন্ স্বরে দিদিমা মশারির মধ্যে গল্প বলিতেছিলেন, তখন কি বালকহৃদয়ের বিশ্বাসপরায়ণ রহস্যময় অনাবিষ্কৃত এক ক্ষুদ্র প্রান্তে এমন একটি সম্ভবপর ছবি জাগিয়া উঠে নাই যে, সেও একদিন সকাল বেলায় কোথায় এক রাজার দেশে রাজার দরজায় কাঠ কুড়াইতেছে, হঠাৎ একটি সোণার প্রতিমা লক্ষ্মীঠাকরুণটির মত রাজকন্যার সহিত তাহার মালা বদল হইয়া গেল; মাথায় তাহার সিঁথি, কাণে তাহার দুল, গলায় তাহার কণ্ঠী, হাতে তাহার কাঁকণ, কটিতে তাহার চন্দ্রহার এবং আল্‌তাপরা দুটি পায় নূপুর ঝুম্ ঝুম্ করিয়া বাজিতেছে!

কিন্তু আমার সেই দিদিমা যদি লেখকজন্ম ধারণ করিয়া আজ-কালকার সেয়ানা পাঠকদের কাছে এই গল্প বলিতেন তবে ইতিমধ্যে তাঁহাকে কত হিসাব দিতে হইত? প্রথমতঃ রাজা যে বার বৎসর বনে বসিয়া থাকে এবং ততদিন রাজকন্যার বিবাহ হয় না, একবাক্যে সকলেই বলিত ইহা অসম্ভব। সেটুকুও যদি কোন গতিকে গোলমালে পার পাইয়া যাইত কিন্তু কন্যার বিবাহের জায়গায় বিষম একটা কলরব উঠিত। এক ত, এমন কখন হয় না, দ্বিতীয়তঃ, সকলেই আশঙ্কা করিত ব্রাহ্মণের ছেলের সহিত ক্ষত্রিয় কন্যার বিবাহ ঘটাইয়া লেখক নিশ্চয়ই ফাঁকি দিয়া সমাজবিরুদ্ধ মত প্রচার করিতেছেন। কিন্তু পাঠকরা তেমন ছেলেই নয়, তাহারা তাঁহার নাতি নয় যে, সকল কথা চুপ করিয়া শুনিয়া যাইবে। তাহারা কাগজে সমালোচনা করিবে। অতএব একান্তমনে প্রার্থনা করি, দিদিমা যেন পুনর্ব্বার দিদিমা হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, হতভাগ্য নাতিটার মত তাঁহাকে গ্রহদোষে যেন লেখক হইতে না হয়।

আমি একেবারে পুলকিত কম্পান্বিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, তার পরে?

দিদিমা বলিতে লাগিলেন—তার পরে রাজকন্যা মনের দুঃখে তাহার সেই ছোট স্বামীটিকে লইয়া চলিয়া গেল।

অনেক দূরদেশে গিয়া একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণের ছেলেটিকে আপনার সেই অতি ক্ষুদ্র স্বামীটিকে, বড় যত্নে মানুষ করিতে লাগিল!

—আমি একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া, পাশবালিশ আর একটু সবলে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম, তার পরে?

দিদিমা কহিলেন, তার পরে ছেলেটি পুঁথি হাতে প্রতিদিন পাঠশালে যায়।

এম্নি করিয়া গুরুমহাশয়ের কাছে নানা বিদ্যা শিখিয়া ছেলেটি ক্রমে যত বড় হইয়া উঠিতে লাগিল ততই তাহার সহপাঠীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ঐ যে সাতমহল বাড়িতে তোমাকে লইয়া থাকে সেই মেয়েটি তোমার কে হয়?

ব্রাহ্মণের ছেলে ত ভাবিয়া অস্থির—কিছুতেই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না মেয়েটি তাহার কে হয়! একটু একটু মনে পড়ে একদিন সকালে রাজবাড়ির দ্বারের সম্মুখে শুক্না কাঠ কুড়াইতে গিয়াছিল—কিন্তু সেদিন কি একটা মস্ত গোলমালে কাঠকুড়ানো হইল না। সে অনেক দিনের কথা, সে কি কিছু মনে আছে? এমন করিয়া চারি পাঁচ বৎসর যায়। ছেলেটিকে রোজই তাহার সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করে আচ্ছা ঐ যে সাতমহলা বাড়িতে পরমারূপসী মেয়েটি থাকে ও তোমার কে হয়?

ব্রাহ্মণ একদিন পাঠশালা হইতে মুখ বড় বিমর্ষ করিয়া আসিয়া রাজকন্যাকে কহিল, আমাকে আমার পাঠশালার পোড়োরা প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করে—ঐ যে সাতমহলা বাড়িতে যে পরমা সুন্দরী মেয়েটি থাকে

সে তোমার কে হয়? আমি তাহার কোন উত্তর দিতে পারি না। তুমি আমার কে হও, বল!

রাজকন্যা বলিল, আজিকার দিন থাক্ সে কথা আর এক দিন বলিব।

ব্রাহ্মণের ছেলে প্রতিদিন পাঠশালা হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, তুমি আমার কে হও?

রাজকন্যা প্রতিদিন উত্তর করে, সে কথা আজ থাক্ আর এক দিন বলিব। এম্‌নি করিয়া আরো চার পাঁচ বৎসর কাটিয়া যায়। শেষে ব্রাহ্মণ একদিন আসিয়া বড় রাগ করিয়া বলিল—আজ যদি তুমি না বল তুমি আমার কে হও তবে আমি তোমার এই সাতমহলা বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।

তখন রাজকন্যা কহিলেন—আচ্ছা কাল নিশ্চয়ই বলিব।

পরদিন ব্রাহ্মণ-তনয় পাঠশালা হইতে ঘরে আসিয়াই রাজকন্যাকে বলিল—আজ বলিবে বলিয়াছিলে, তবে বল?

রাজকন্যা বলিলেন, আজ রাত্রে আহার করিয়া যখন তুমি শয়ন করিবে তখন বলিব।

ব্রাহ্মণ বলিল—আচ্ছা। বলিয়া সূর্য্যাস্তের অপেক্ষায় প্রহর গণিতে লাগিল। এদিকে রাজকন্যা সোনার পালঙ্কে একটি ধব্‌ধবে ফুলের বিছানা পাতিলেন,—ঘরে সোনার প্রদীপে সুগন্ধ তেল দিয়া বাতি জ্বালাইলেন, এবং চুলটি বাঁধিয়া নীলাম্বরী কাপড়টি পরিয়া সাজিয়া বসিয়া প্রহর গণিতে লাগিলেন, কখন রাত্রি আসে।

রাত্রে তাঁহার স্বামী কোন মতে আহার শেষ করিয়া শয়নগৃহে সোনার পালঙ্কে ফুলের বিছানায় গিয়া শয়ন করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, আজ শুনিতে পাইব এই সাতমহলা বাড়িতে যে সুন্দরীটি থাকে সে আমার কে হয়।

রাজকন্যা তাঁহার স্বামীর পাত্রে প্রসাদ খাইয়া ধীরে ধীরে শয়নগৃহে

প্রবেশ করিলেন। আজ বহুদিন পরে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে এই সাতমহলা অট্টালিকার একমাত্র অধীশ্বরী আমি তোমার কে হই।

বলিতে গিয়া বিছানায় প্রবেশ করিয়া—কি দেখিলেন! ফুলের মধ্যে সাপ ছিল, তাঁহার স্বামীকে কখন্ দংশন করিয়াছে। স্বামীর মৃত দেহখানি মলিন হইয়া সোণার পালঙ্কে পুষ্পশয্যায় পড়িয়া আছে।

—আমার যেন বক্ষঃস্পন্দন হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। আমি রুদ্ধস্বরে বিবর্ণমুখে জিজ্ঞাসা করিলাম—তার পরে কি হইল!

দিদিমা বলিতে লাগিলেন—তার পরে—কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি? সে যে আরো অসম্ভব! গল্পের প্রধান নায়ক সর্পাঘাতে মারা গেল, তবুও তার পরে? বালক তখন জানিত না, মৃত্যুর পরেও একটা তার পরে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সে তার-পরের উত্তর কোন দিদিমার দিদিমাও দিতে পারে না। বিশ্বাসের বলে সাবিত্রী মৃত্যুরও অনুগমন করিয়াছিলেন। শিশুরও প্রবল বিশ্বাস, এই জন্য সে মৃত্যুর অঞ্চল ধরিয়া ফিরাইতে চায়, কিছুতেই মনে করিতে পারে না যে, তাহার মাষ্টারবিহীন একসন্ধ্যাবেলাকার এত সাধের গল্পটি হঠাৎ একটি সর্পাঘাতেই মারা গেল! কাজেই দিদিমাকে সেই মহাপরিণামের চিরনিরুদ্ধ গৃহ হইতে গল্পটিকে আবার ফিরাইয়া আনিতে হয়। কিন্তু এত সহজে সেটি সাধন করেন, এমন অনায়াসে;—কেবল হয় ত একটা কলার ভেলায় ভাসাইয়া দিয়া গুটি দুই মন্ত্র পড়িয়া মাত্র—যাহাতে সেই ঝুপ্‌ঝুপ্ বৃষ্টির রাত্রে স্তিমিত প্রদীপে বালকের মনে মৃত্যুর মূর্ত্তি অত্যন্ত অকঠোর হইয়া আসে, তাহাকে এক রাত্রের সুখনিদ্রার চেয়ে বেশী মনে হয় না। গল্প যখন ফুরাইয়া যায়, আরামে শ্রান্ত দুটি চক্ষু আপনি মুদিয়া আসে, তখনো ত শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণটিকে একটি স্নিগ্ধ নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ স্রোতের মধ্যে সুষুপ্তির ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তার পরে ভোরের বেলায় কে দুটি মায়ামন্ত্র পড়িয়া তাহাকে এই জগতের মধ্যে জাগ্রৎ করিয়া তোলে!

কিন্তু যাহার বিশ্বাস নাই, যে ভীরু এ সৌন্দর্য্যরসাস্বাদনের জন্যও এক ইঞ্চি পরিমাণ অসম্ভবকে লঙ্ঘন করিতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহার কাছে কোন কিছুর আর তার-পরে নাই, সমস্তই হঠাৎ অসময়ে এক অসমাপ্তিতে সমাপ্ত হইয়া গেছে। ছেলেবেলায় সাতসমুদ্র পার হইয়া মৃত্যুকেও লঙ্ঘন করিয়া গল্পের যেখানে যথার্থ বিরাম, সেখানে স্নেহময় সুমিষ্টস্বরে শুনিতাম—

আমার কথাটি ফুরোলো,
নটে গাছটি মুড়োলো।

এখন বয়স হইয়াছে, এখন গল্পের ঠিক মাঝখানটাতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া একটা নিষ্ঠুর কঠিন কণ্ঠে শুনিতে পাই—

আমার কথাটি ফুরোলো না,
নটে গাছটি মুড়োলো না।
কেন্‌রে নটে মুড়োলি নে কেন,
তোর গরুতে—

দূর হোক গে, ঐ নিরীহ প্রাণীটির নাম করিয়া কাজ নাই, আবার কে কোন্‌ দিক হইতে গায়ে পাতিয়া লইবে।

১৩০০।

রুদ্ধ গৃহ।

বৃহৎ বাড়ির মধ্যে কেবল একটি ঘর বন্ধ। তাহার তালাতে মরিচা ধরিয়াছে—তাহার চাবি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সন্ধ্যাবেলা সে ঘরে আলো জলে না, দিনের বেলা সে ঘরে লোক থাকে না—এমন কতদিন হইতে কে জানে!

সে ঘর খুলিতে ভয় হয়, অন্ধকারে তাহার সমুখ দিয়া চলিতে গা ছম্‌ছম্‌ করে। যেখানে মানুষ হাসিয়া মানুষের সঙ্গে কথা কয় না,

সেইখানেই আমাদের যত ভয়। যেখানে মানুষে মানুষে দেখাশুনো হয়, সেই পবিত্রস্থানে ভয় আর আসিতে পারে না।

দুই খানি দরজা ঝাঁপিয়া ঘর মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে। দরজার উপর কান দিয়া থাকিলে ঘরের ভিতর হইতে যেন হু হু শব্দ শুনা যায়। এ ঘর বিধবা। একজন কে ছিল সে গেছে, সেই হইতে এ গৃহের দ্বার রুদ্ধ। সেই অবধি এখানে আর কেহ আসেও না, এখান হইতে আর কেহ যায়ও না। সেই অবধি এখানে যেন মৃত্যুরও মৃত্যু হইয়াছে।

এ জগতে অবিশ্রাম জীবনের প্রবাহ মৃত্যুকে হু হু করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়, মৃত কোথাও টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। এই ভয়ে সমাধি-ভবন কৃপণের মত মৃতকে চোরের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাষাণ প্রাচীরের মধ্যে লুকাইয়া রাখে, ভয় তাহার উপরে দিবারাত্রি পাহারা দিতে থাকে। মৃত্যুকেই লোকে চোর বলিয়া নিন্দা করে, কিন্তু জীবনও যে চকিতের মধ্যে মৃত্যুকে চুরি করিয়া আপনার বহুবিস্তৃত পরিবারের মধ্যে বাঁটিয়া দেয় সে কথার কেহ উল্লেখ করে না।

পৃথিবী মৃত্যুকেও কোলে করিয়া লয় জীবনকেও কোলে করিয়া রাখে—পৃথিবীর কোলে উভয়েই ভাই বোনের মত খেলা করে। এই জীবনমৃত্যুর প্রবাহ দেখিলে, তরঙ্গভঙ্গের উপর ছায়া-আলোর খেলা দেখিলে আমাদের কোন ভয় থাকে না, কিন্তু বদ্ধ মৃত্যু রুদ্ধ ছায়া দেখিলেই আমাদের ভয় হয়। মৃত্যুর গতি যেখানে আছে, জীবনের হাত ধরিয়া মৃত্যু যেখানে একতালে নৃত্য করে, সেখানে মৃত্যুরও জীবন আছে, সেখানে মৃত্যু ভয়ানক নহে; কিন্তু চিহ্নের মধ্যে আবদ্ধ গতিহীন মৃত্যুই প্রকৃত মৃত্যু, তাহাই ভয়ানক। এই জন্য সমাধিভূমি ভয়ের আবাসস্থল।

পৃথিবীতে যাহা আসে তাহাই যায়। এই প্রবাহেই জগতের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। কণামাত্রের যাতায়াত বন্ধ হইলে জগতের সামঞ্জস্য

ভঙ্গ হয়। জীবন যেমন আসে, জীবন তেমনি যায়; মৃত্যুও যেমন আসে মৃত্যুও তেমনি যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা কর কেন? হৃদয়টাকে পাষাণ করিয়া সেই পাষাণের মধ্যে তাহাকে সমাহিত করিয়া রাখ কেন? তাহা কেবল অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া উঠে। ছাড়িয়া দাও তাহাকে যাইতে দাও—জীবনমৃত্যুর প্রবাহ রোধ করিও না। হৃদয়ের দুই দ্বারই সমান খুলিয়া রাখ। প্রবেশের দ্বার দিয়া সকলে প্রবেশ করুক, প্রস্থানের দ্বার দিয়া সকলে প্রস্থান করিবে।

গৃহ দুই দ্বারই রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যে দিন দ্বার প্রথম রুদ্ধ হইল সেই দিনকার পুরাতন অন্ধকার আজও গৃহের মধ্যে একলা জাগিয়া আছে। গৃহের বাহিরে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি আসিতেছে, গৃহের মধ্যে কেবল সেই একটি দিনই বসিয়া আছে। সময় সেখানে চারিটি ভিত্তির মধ্যেই রুদ্ধ। পুরাতন কোথাও থাকে না, এই ঘরের মধ্যে আছে।

এই গৃহের অন্তরে বাহিরে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হইয়াছে। বাহিরের বার্তা অন্তরে পৌঁছায় না, অন্তরের নিঃশ্বাস বাহিরে আসিতে পায় না। জগতের প্রবাহ এই ঘরের দুই পাশ দিয়া বহিয়া যায়। এই গৃহ যেন বিশ্বের সহিত নাড়ির বন্ধন ছেদন করিয়াছে।

দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহ পথের দিকে চাহিয়া আছে। যখন পূর্ণিমার চাঁদের আলো তাহার দ্বারের কাছে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকে, তখন তাহার দ্বার খুলিব-খুলিব করে কি না কে বলিতে পারে! পাশের ঘরে যখন উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে তখন কি তাহার অন্ধকার ছুটিয়া যাইতে চায় না? এ ঘর কি-ভাবে চাহে, কি ভাবে শোনে আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না।

ছেলেরা যে-একদিন এই ঘরের মধ্যে খেলা করিত, সেই কোলাহলময় দিন এই গৃহের নিশীথিনীর মধ্যে পড়িয়া আজ কাঁদিতেছে। এই গৃহের

সেইখানেই আমাদের যত ভয়। যেখানে মানুষে মানুষে দেখাশুনো হয়, সেই পবিত্রস্থানে ভয় আর আসিতে পারে না।

দুই খানি দরজা ঝাঁপিয়া ঘর মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে। দরজার উপর কান দিয়া থাকিলে ঘরের ভিতর হইতে যেন হু হু শব্দ শুনা যায়।

এ ঘর বিধবা। একজন কে ছিল সে গেছে, সেই হইতে এ গৃহের দ্বার রুদ্ধ। সেই অবধি এখানে আর কেহ আসেও না, এখান হইতে আর কেহ যায়ও না। সেই অবধি এখানে যেন মৃত্যুরও মৃত্যু হইয়াছে।

এ জগতে অবিশ্রাম জীবনের প্রবাহ মৃত্যুকে হু হু করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়, মৃত কোথাও টিঁকিয়া থাকিতে পারে না। এই ভয়ে সমাধি-ভবন কৃপণের মত মৃতকে চোরের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাষাণ প্রাচীরের মধ্যে লুকাইয়া রাখে, ভয় তাহার উপরে দিবারাত্রি পাহারা দিতে থাকে। মৃত্যুকেই লোকে চোর বলিয়া নিন্দা করে, কিন্তু জীবনও যে চকিতের মধ্যে মৃত্যুকে চুরি করিয়া আপনার বহুবিস্তৃত পরিবারের মধ্যে বাঁটিয়া দেয় সে কথার কেহ উল্লেখ করে না।

পৃথিবী মৃত্যুকেও কোলে করিয়া লয় জীবনকেও কোলে করিয়া রাখে—পৃথিবীর কোলে উভয়েই ভাই বোনের মত খেলা করে। এই জীবনমৃত্যুর প্রবাহ দেখিলে, তরঙ্গভঙ্গের উপর ছায়া-আলোর খেলা দেখিলে আমাদের কোন ভয় থাকে না, কিন্তু বদ্ধ মৃত্যু রুদ্ধ ছায়া দেখিলেই আমাদের ভয় হয়। মৃত্যুর গতি যেখানে আছে, জীবনের হাত ধরিয়া মৃত্যু যেখানে একতালে নৃত্য করে, সেখানে মৃত্যুরও জীবন আছে, সেখানে মৃত্যু ভয়ানক নহে; কিন্তু চিহ্নের মধ্যে আবদ্ধ গতিহীন মৃত্যুই প্রকৃত মৃত্যু, তাহাই ভয়ানক। এই জন্য সমাধিভূমি ভয়ের আবাসস্থল।

পৃথিবীতে যাহা আসে তাহাই যায়। এই প্রবাহেই জগতের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। কণামাত্রের যাতায়াত বন্ধ হইলে জগতের সামঞ্জস্য

ভঙ্গ হয়। জীবন যেমন আসে, জীবন তেমনি যায়; মৃত্যুও যেমন আসে মৃত্যুও তেমনি যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা কর কেন? হৃদয়টাকে পাষাণ করিয়া সেই পাষাণের মধ্যে তাহাকে সমাহিত করিয়া রাখ কেন? তাহা কেবল অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া উঠে। ছাড়িয়া দাও তাহাকে যাইতে দাও—জীবনমৃত্যুর প্রবাহ রোধ করিও না। হৃদয়ের দুই দ্বারই সমান খুলিয়া রাখ। প্রবেশের দ্বার দিয়া সকলে প্রবেশ করুক, প্রস্থানের দ্বার দিয়া সকলে প্রস্থান করিবে।

গৃহ দুই দ্বারই রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যে দিন দ্বার প্রথম রুদ্ধ হইল সেই দিনকার পুরাতন অন্ধকার আজও গৃহের মধ্যে একলা জাগিয়া আছে। গৃহের বাহিরে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি আসিতেছে, গৃহের মধ্যে কেবল সেই একটি দিনই বসিয়া আছে। সময় সেখানে চারিটি ভিত্তির মধ্যেই রুদ্ধ। পুরাতন কোথাও থাকে না, এই ঘরের মধ্যে আছে।

এই গৃহের অন্তরে বাহিরে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হইয়াছে। বাহিরের বার্তা অন্তরে পৌঁছায় না, অন্তরের নিঃশ্বাস বাহিরে আসিতে পায় না। জগতের প্রবাহ এই ঘরের দুই পাশ দিয়া বহিয়া যায়। এই গৃহ যেন বিশ্বের সহিত নাড়ির বন্ধন ছেদন করিয়াছে।

দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহ পথের দিকে চাহিয়া আছে। যখন পূর্ণিমার চাঁদের আলো তাহার দ্বারের কাছে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকে, তখন তাহার দ্বার খুলিব-খুলিব করে কি না কে বলিতে পারে! পাশের ঘরে যখন উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে তখন কি তাহার অন্ধকার ছুটিয়া যাইতে চায় না? এ ঘর কি ভাবে চাহে, কি ভাবে শোনে আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না।

ছেলেরা যে-একদিন এই ঘরের মধ্যে খেলা করিত, সেই কোলাহলময় দিন এই গৃহের নিশীথিনীর মধ্যে পড়িয়া আজ কাঁদিতেছে। এই গৃহের

মধ্যে যে সকল স্নেহ-প্রেমের লীলা হইয়া গিয়াছে, সেই স্নেহ-প্রেমের উপর সহসা কপাট পড়িয়া গেছে,—এই নিস্তব্ধ গৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া আমি তাহাদের ক্রন্দন শুনিতেছি। স্নেহ প্রেম বদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য হয় নাই। মানুষের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাহাকে গোর দিয়া রাখিবার জন্য হয় নাই। তাহাকে জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে সংসারক্ষেত্রের জন্য সে কাঁদে।

তবে এ গৃহ রুদ্ধ রাখিও না—দ্বার খুলিয়া দাও। সূর্য্যের আলো দেখিয়া মানুষের সাড়া পাইয়া চকিত হইয়া ভয় প্রস্থান করিবে। সুখ এবং দুঃখ, শোক এবং উৎসব, জন্ম এবং মৃত্যু পবিত্র সমীরণের মত ইহার বাতায়নের মধ্যে দিয়া চিরদিন যাতায়াত করিতে থাকিবে। সমস্ত জগতের সহিত ইহার যোগ হইয়া যাইবে।

১২৯২।

রাজপথ।

আমি রাজপথ। আমার এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম নাই। এতটুকু বিশ্রাম নাই যে, আমার এই কঠিন শুষ্ক শয্যার উপরে একটি মাত্র কচি ঘাস উঠাইতে পারি; এতটুকু সময় নাই যে আমার শিয়রের কাছে অতি ক্ষুদ্র একটি নীলবর্ণের বনফুল ফুটাইতে পারি! কথা কহিতে পারি না, অথচ অন্ধভাবে সকলি অনুভব করিতেছি। রাত্রিদিন পদশব্দ; কেবলি পদশব্দ।

পৃথিবীর কোন কাহিনী আমি সম্পূর্ণ শুনিতে পাই না। আজ শতশত বৎসর ধরিয়া আমি কত লক্ষ লোকের কত হাসি কত গান কত

কথা শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু কেবল খানিকটা মাত্র শুনিতে পাই। বাকিটুকু শুনিবার জন্ত যখন কাণ পাতিয়া থাকি, তখন দেখি সে লোক আর নাই।

সমাপ্তি ও স্থায়িত্ব হয়ত কোথাও আছে, কিন্তু আমিত দেখিতে পাই না। একটি চরণচিহ্নও ত আমি বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারি না। অবিশ্রাম চিহ্ন পড়িতেছে, আবার নূতন পদ আসিয়া অন্য পদের চিহ্ন মুছিয়া যাইতেছে।

আমি কাহারও লক্ষ্য নহি, আমি সকলের উপায় মাত্র। আমি কাহারও গৃহ নহি, আমি সকলকে গৃহে লইয়া যাই। যাহাদের গৃহ সুদূরে অবস্থিত, তাহারা আমাকেই অভিশাপ দেয়; আমি যে পরম ধৈর্য্যে তাহাদিগকে গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিই তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা কই পাই। গৃহে গিয়া বিরাম, গৃহে গিয়া আনন্দ, গৃহে গিয়া সুখসম্মিলন, আর আমার উপরে কেবল শ্রান্তির ভার, কেবল অনিচ্ছাকৃত শ্রম, কেবল বিচ্ছেদ।

ছোট ছোট কোমল পা-গুলি যখন আমার উপর দিয়া চলিয়া যায়, তখন আপনাকে বড় কঠিন বলিয়া মনে হয়; মনে হয় উহাদের পায়ে বাজিতেছে! কুসুমের দলের ন্যায় কোমল হইতে সাধ যায়। রাধিকা বলিয়াছেন—

"যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চলি যাতা,
তাঁহা তাঁহা ধরণী হই এ মঝু গাতা!"

অরুণ চরণগুলি এমন কঠিন ধরণীর উপরে চলে কেন! কিন্তু তা' যদি না চলিত, তবে কোথাও শ্যামল তৃণ জন্মিত না।

বহু দিন হইল, এমনি একজন কে তাহার কোমল চরণ দুখানি লইয়া প্রতিদিন অপরাহ্নে বহুদূর হইতে আসিত—ছোট দুটি নূপুর রুণুঝুনু করিয়া তাহার পায়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিত। যেখানে ঐ

বাঁধান বটগাছের বামদিকে আমার একটি শাখা লোকালয়ের দিকে চলিয়া গেছে, সেখানে সে শ্রান্তদেহে গাছের তলায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয় থাকিত। আর-একজন কে দিনের কাজ সমাপন করিয়া অন্য মনে সেই সময়ে লোকালয়ের দিকে চলিয়া যাইত। সে চলিয়া গেলে বালিকা শ্রান্তপদে আবার যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিয় যাইত। বালিকা যখন ফিরিত তখন জানিতাম অন্ধকার হইয় আসিয়াছে। তখন গোধূলির কাকের ডাক একেবারে থামিয়া যাইত; পথিকেরা আর বড় কেহ চলিত না। সন্ধ্যার বাতাসে থাকিয় থাকিয়া বাঁশবন ঝর্‌ঝর্ ঝর্‌ঝর্ শব্দ করিয়া উঠিত। এমন কতদিন এমন প্রতিদিন, সে ধীরে ধীরে আসিত ধীরে ধীরে যাইত। একদিন ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি অপরাহ্ণে যখন বিস্তর আম্রমুকুলের কেশর বাতাসে ঝরিয়া পড়িতেছে—তখন আর-একজন যে আসে সে আর আসিল না। সে দিন অনেক রাত্রে বালিকা বাড়িতে ফিরিয়া গেল যেমন মাঝে মাঝে গাছ হইতে শুষ্ক পাতা ঝরিয়া পড়িতেছিল, তেমনি মাঝে মাঝে দুই এক ফোঁটা অশ্রুজল আমার নীরস তপ্ত ধূলির উপরে পড়িয় মিলাইতেছিল। আবার তাহার পরদিন অপরাহ্ণে বালিকা সেইখানে সেই তরুতলে আসিয়া দাঁড়াইল কিন্তু সেদিনও আর-একজন আসিল না। আবার রাত্রে সে ধীরে ধীরে বাড়িমুখে ফিরিল। কিছু দূরে গিয়া আর সে চলিতে পারিল না। আমার উপরে ধূলির উপরে লুটাইয়া পড়িল। দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া বুক ফাটিয়া কাঁদিতে লাগিল। কে গো মা, আজি এই বিজন রাত্রে আমার বক্ষেও কি কেহ আশ্রয় লইতে আসে!

এমন কত পদশব্দ নীরব হইয়া গেছে, আমি কি এত মনে করিয়া রাখিতে পারি! আমার কি আর একদণ্ড শোক করিবার অবসর আছে!

কি প্রখর রৌদ্র! উহু-হুহু! এক একবার নিশ্বাস ফেলিতেছি আর তপ্তধূলা সুনীল আকাশ ধূসর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ধনী দরিদ্র, সুখী দুঃখী, জরা যৌবন, হাসি কান্না, জন্ম মৃত্যু সমস্তই আমার উপর দিয়া একই নিশ্বাসে ধূলির স্রোতের মত উড়িয়া চলিয়াছে। পথের হাসিও নাই কান্নাও নাই। গৃহই অতীতের জন্য শোক করে, বর্ত্তমানের জন্য ভাবে, ভবিষ্যতের আশাপথ চাহিয়া থাকে। পথ প্রতি বর্ত্তমান নিমেষের শত সহস্র নূতন অভ্যাগতকে লইয়াই ব্যস্ত। এমন স্থানে নিজের পদগৌরবের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অত্যন্ত সদর্পে পদক্ষেপ করিয়া কে নিজের চির-চরণ-চিহ্ন রাখিয়া যাইতে প্রয়াস পাইতেছে! আমি কিছুই পড়িয়া থাকিতে দিই না, হাসিও না, কান্নাও না। আমিই কেবল পড়িয়া আছি।

১২৯১।

মন্দির।

উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের মন্দির যখন প্রথম দেখিলাম, তখন মনে হইল, একটা যেন কি নূতন গ্রন্থ পাঠ করিলাম। বেশ বুঝিলাম, এই পাথরগুলির মধ্যে কথা আছে; সে কথা বহুশতাব্দী হইতে স্তম্ভিত বলিয়া, মূক বলিয়া, হৃদয়ে আরো যেন বেশি করিয়া আঘাত করে।

ঋক্-রচয়িতা ঋষি ছন্দে মন্ত্ররচনা করিয়া গিয়াছেন, এই মন্দিরও পাথরের মন্ত্র; হৃদয়ের কথা দৃষ্টিগোচর হইয়া আকাশ জুড়িয়া দাঁড়াইয়াছে।

মানুষের হৃদয় এখানে কি কথা গাঁথিয়াছে? ভক্তি কি রহস্য প্রকাশ

করিয়াছে? মানুষ অনন্তের মধ্য হইতে আপন অন্তঃকরণে এমন কি বাণী পাইয়াছিল, যাহার প্রকাশের প্রকাণ্ড চেষ্টায় এই শৈলপদমূলে বিস্তীর্ণ প্রান্তর আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে?

এই যে শতাধিক দেবালয়—যাহার অনেকগুলিতেই আজ আর সন্ধ্যারতির দীপ জ্বলে না, শঙ্খঘণ্টা নীরব, যাহার খোদিত প্রস্তরখণ্ডগুলি ধূলিলুণ্ঠিত—ইহারা কোনো একজন ব্যক্তিবিশেষের কল্পনাকে আকার দিবার চেষ্টা করে নাই। ইহারা তখনকার সেই অজ্ঞাত যুগের ভাষাভারে আক্রান্ত।

এই দেবালয়শ্রেণী তাহার নিগূঢ় নিস্তব্ধ চিত্তশক্তির দ্বারা দর্শকের অন্তঃকরণকে সহসা যে ভাবান্দোলনে উদ্বোধিত করিয়া তুলিল, তাহার আকস্মিকতা, তাহার সমগ্রতা, প্রকাশ করা কঠিন—বিশ্লেষণ করিয়া, খণ্ড-খণ্ড করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। মানুষের ভাষা এইখানে পাথরের কাছে হার মানে—পাথরকে পরে-পরে বাক্য গাঁথিতে হয় না, সে স্পষ্ট কিছু বলে না, কিন্তু যাহা-কিছু বলে, সমস্ত একসঙ্গে বলে—এক পলকেই সে সমস্ত মনকে অধিকার করে—সুতরাং মন যে কি বুঝিল, কি শুনিল, কি পাইল, তাহা ভাবে বুঝিলেও ভাষায় বুঝিতে সময় পায় না, অবশেষে স্থির হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাকে নিজের কথায় বুঝিয়া লইতে হয়।

দেখিলাম, মন্দিরভিত্তির সর্ব্বাঙ্গে ছবি খোদা! কোথাও অবকাশমাত্র নাই। যেখানে চোখ পড়ে এবং যেখানে চোখ পড়ে না, সর্ব্বত্রই শিল্পীর নিরলস চেষ্টা কাজ করিয়াছে।

ছবিগুলি বিশেষভাবে পৌরাণিক ছবি নয়; দশ অবতারের লীলা বা স্বর্গলোকের দেবকাহিনীই যে দেবালয়ের গায়ে লিখিত হইয়াছে, তাহাত বলিতে পারি না। মানুষের ছোটবড় ভালমন্দ প্রতিদিনের ঘটনা—তাহার খেলা ও কাজ, যুদ্ধ ও শান্তি, ঘর ও বাহির, বিচিত্র

আলেখ্যের দ্বারা মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া আছে। এই ছবিগুলির মধ্যে আর কোন উদ্দেশ্য দেখি না, কেবল এই সংসার যেমন ভাবে চলিতেছে, তাহাই আঁকিবার চেষ্টা। সুতরাং চিত্রশ্রেণীর ভিতরে এমন অনেক জিনিষ চোখে পড়ে, যাহা দেবালয়ে অঙ্কনযোগ্য বলিয়া হঠাৎ মনে হয় না। ইহার মধ্যে বাছাবাছি কিছুই নাই—তুচ্ছ এবং মহৎ, গোপনীয় এবং ঘোষণীয়, সমস্তই আছে।

কোনো গির্জ্জার মধ্যে গিয়া যদি দেখিতাম, সেখানে দেয়ালে ইংরেজ-সমাজের প্রতিদিনের ছবি ঝুলিতেছে:—কেহ খানা খাইতেছে, কেহ ডগ্‌কার্ট হাঁকাইতেছে, কেহ হুইষ্ট্ খেলিতেছে, কেহ পিয়ানো বাজাইতেছে, কেহ সঙ্গিনীকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া পল্কা নাচিতেছে, তবে হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতাম, বুঝি-বা স্বপ্ন দেখিতেছি—কারণ, গির্জ্জা সংসারকে সর্ব্বতোভাবে মুছিয়া-ফেলিয়া আপন স্বর্গীয়তা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। মানুষ সেখানে লোকালয়ের বাহিরে আসে—তাহা যেন যথাসম্ভব মর্ত্ত্যসংস্পর্শবিহীন দেবলোকের আদর্শ।

তাই, ভুবনেশ্বর-মন্দিরের চিত্রাবলীতে প্রথমে মনে বিস্ময়ের আঘাত লাগে। স্বভাবত হয় ত লাগিত না, কিন্তু আশৈশব শিক্ষায় আমরা স্বর্গমর্ত্ত্যকে মনে মনে ভাগ করিয়া রাখিয়াছি। সর্ব্বদাই সন্তর্পণে ছিলাম, পাছে দেব-আদর্শে মানবভাবের কোন আঁচ লাগে; পাছে দেবমানবের মধ্যে যে পরমপবিত্র সুদূর ব্যবধান, ক্ষুদ্র মানব তাহা লেশমাত্র লঙ্ঘন করে।

এখানে মানুষ দেবতার একেবারে যেন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে—তাও যে ধূলা ঝাড়িয়া আসিয়াছে, তাও নয়। গতিশীল, কর্ম্মরত, ধূলিলিপ্ত সংসারের প্রতিকৃতি নিঃসঙ্কোচে সমুচ্চ হইয়া উঠিয়া দেবতার প্রতিমূর্ত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।

মন্দিরের ভিতরে গেলাম—সেখানে একটিও চিত্র নাই, আলোক

নাই, অনলঙ্কৃত নিভৃত অস্ফুটতার মধ্যে দেবমূর্ত্তি নিস্তব্ধ বিরাজ করিতেছে।

ইহার একটি বৃহৎ অর্থ মনে উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না। মানুষ এই প্রস্তরের ভাষায় যাহা বলিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহা সেই বহু দূরকাল হইতে আমার মনের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সে কথা এই—দেবতা দূরে নাই, গির্জ্জায় নাই, তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন। তিনি জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখ, পাপপুণ্য, মিলনবিচ্ছেদের মাঝখানে স্তব্ধভাবে বিরাজমান। এই সংসারই তাঁহার চিরন্তন মন্দির। এই সজীব-সচেতন বিপুল দেবালয় অহরহ বিচিত্র হইয়া রচিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা কোনকালে নূতন নহে; কোনকালে পুরাতন হয় না। ইহার কিছুই স্থির নহে, সমস্তই নিয়ত পরিবর্ত্তমান—অথচ ইহার মহৎ ঐক্য, ইহার সত্যতা, ইহার নিত্যতা নষ্ট হয় না, কারণ এই চঞ্চল বিচিত্রের মধ্যে এক নিত্যসত্য প্রকাশ পাইতেছেন।

ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড় করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতেই তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন।

এমনি করিয়া শ্রদ্ধার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা মানুষের অন্তরের জ্ঞান, শক্তি ও উদ্যমকে তিনি মহীয়ান্ করিয়া তুলিলেন। মানুষ যে দীন দৈবাধীন হীনপদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।

এমন সময় হিন্দুর চিত্ত জাগ্রত হইয়া কহিল—সে কথা যথার্থ—মানুষ দীন নহে; হীন নহে; কারণ, মানুষের যে শক্তি—যে শক্তি মানুষের মুখে ভাষা দিয়াছে, মনে ধী দিয়াছে, বাহুতে নৈপুণ্য দিয়াছে,

যাহা সমাজকে গঠিত করিতেছে, সংসারকে চালনা করিতেছে, তাহাই দৈবী শক্তি।

বুদ্ধদেব যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করিলেন, নবপ্রবুদ্ধ হিন্দু তাহারই মধ্যে তাঁহার দেবতাকে লাভ করিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়া গেল। মানবের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতিমুহূর্ত্তের সুখদুঃখের মধ্যে দেবতার সঞ্চার, ইহাই নবহিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মকথা হইয়া উঠিল। শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের প্রেম ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল—মানুষের ক্ষুদ্র কাজেকর্ম্মে শক্তির প্রত্যক্ষ হাত, মানুষের স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধের মধ্যে দিব্যপ্রেমের প্রত্যক্ষ লীলা অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখা দিল। এই দেবতার আবির্ভাবে ছোট-বড়র ভেদ ঘুচিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমাজে যাহারা ঘৃণিত ছিল, তাহারাও দৈবশক্তির অধিকারী বলিয়া অভিমান করিল—প্রাকৃত পুরাণগুলিতে তাহার ইতিহাস রহিয়াছে।

উপনিষদে একটি মন্ত্র আছে—

"বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ"—

যিনি এক, তিনি আকাশে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন। ভুবনেশ্বরের মন্দির সেই মন্ত্রকেই আর একটু বিশেষভাবে এই বলিয়া উচ্চারণ করিতেছে—যিনি এক, তিনি এই মানবসংসারের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া আছেন। জন্মমৃত্যুর যাতায়াত আমাদের চোখের উপর দিয়া কেবলি আবর্ত্তিত হইতেছে, সুখদুঃখ উঠিতেছে-পড়িতেছে, পাপ-পুণ্য আলোকে-ছায়ায় সংসারভিত্তি খচিত করিয়া দিতেছে, সমস্ত বিচিত্র—সমস্ত চঞ্চল, —ইহারই অন্তরে নিরলঙ্কার নিভৃত, সেখানে যিনি এক, তিনিই বর্ত্তমান। এই অস্থির-সমদয়, যিনি স্থির তাঁহারই শান্তিনিকেতন,—এই পরিবর্ত্তনপরম্পরা [illegible] তাহারই চিরপ্রকাশ। দেবমানব, স্বর্গ-মর্ত্ত্য, বন্ধন ও [illegible] সামঞ্জস্য—ইহাই প্রস্তরের ভাষায় ধ্বনিত।

উপনিষদ্ এইরূপ কথাই একটি উপমায় প্রকাশ করিয়াছেন—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"

দুই সুন্দর পক্ষী একত্র সংযুক্ত হইয়া একবৃক্ষে বাস করিতেছে। তাহার মধ্যে একটি স্বাদু পিপ্পল আহার করিতেছে, অপরটি অনশনে থাকিয়া তাহা দেখিতেছে।

জীবাত্মা-পরমাত্মার এরূপ সাযুজ্য, এরূপ সারূপ্য, এরূপ সালোক্য, এত অনায়াসে, এত সহজ উপমায়, এমন সরল সাহসের সহিত আর কোথায় বলা হইয়াছে! জীবের সহিত ভগবানের সুন্দর সাম্য যেন কেহ প্রত্যক্ষ চোখের উপর দেখিয়া কথা কহিয়া উঠিয়াছে—সেইজন্য তাহাকে উপমার জন্য আকাশ-পাতাল হাতড়াইতে হয় নাই।—অরণ্যচারী কবি বনের দুটি সুন্দর ডানাওয়ালা পাখীর মত করিয়া সসীমকে ও অসীমকে গায়ে-গায়ে মিলাইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, তাহা কোনো প্রকাণ্ড উপমার ঘটা করিয়া এই নিগূঢ় তত্ত্বকে বৃহৎ করিয়া তুলিবার চেষ্টামাত্র করেন নাই। দুটি ছোট পাখী যেমন স্পষ্টরূপে গোচর, যেমন সুন্দরভাবে দৃশ্যমান, তাহার মধ্যে নিত্যপরিচয়ের সরলতা যেমন একান্ত, কোনো বৃহৎ উপমায় এমনটি থাকিত না। উপমাটি ক্ষুদ্র হইয়াই সত্যটিকে বৃহৎ করিয়া প্রকাশ করিয়াছে—বৃহৎ সত্য দ্রষ্টার যে নিশ্চিন্ত সাহস, তাহা ক্ষুদ্র সরল উপমাতেই যথার্থভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

ইহারা দুটিই পাখী, ডানায়-ডানায় সংযুক্ত হইয়া আছে—ইহারা সখা, ইহারা একবৃক্ষেই পরিষক্ত—ইহার মধ্যে একজন ভোক্তা, আর একজন সাক্ষী, একজন চঞ্চল, আর একজন স্তব্ধ।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরও যেন এই মন্ত্র [illegible] তাহা দেবালয় হইতে মানবত্বকে মুছিয়া ফেলে নাই—[illegible] একত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

কিন্তু ভুবনেশ্বরের মন্দিরে আরো যেন একটু বিশেষত্ব আছে। ঋষি-কবির উপমার মধ্যে নিভৃত অরণ্যের একান্ত নির্জ্জনতার ভাবটুকু রহিয়া গেছে। এই উপমার দৃষ্টিতে প্রত্যেক জীবাত্মা যেন একাকিরূপেই পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত। ইহাতে যে ধ্যানচ্ছবি মনে আনে, তাহাতে দেখিতে পাই যে, যে-আমি ভোগ করিতেছি, ভ্রমণ করিতেছি সেই-আমির মধ্যে শান্তং শিবমদ্বৈতম্ স্তব্ধভাবে আবির্ভূত।

কিন্তু এই একের-সহিত-একের সংযোগ ভুবনেশ্বর-মন্দিরে লিখিত নহে। সেখানে সমস্ত মানুষ তাহার সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত ভোগ লইয়া, তাহার তুচ্ছবৃহৎ সমস্ত ইতিহাস বহন করিয়া, সমগ্রভাবে এক হইয়া আপনার মাঝখানে অন্তরতররূপে, সাক্ষিরূপে, ভগবান্‌কে প্রকাশ করিতেছে। নির্জ্জনে নহে—যোগে নহে—সজনে, কর্ম্মের মধ্যে। তাহা সংসারকে, লোকালয়কে দেবালয় করিয়া ব্যক্ত করিয়াছে—তাহা সমষ্টিরূপে মানবকে দেবত্বে অভিষিক্ত করিয়াছে। তাহা প্রথমত ছোটবড় সমস্ত মানবকে আপনার প্রস্তরপটে এক করিয়া সাজাইয়াছে তাহার পর দেখাইয়াছে, পরম ঐক্যটি কোন্‌খানে, তিনি কে। এই ভূমা ঐক্যের অন্তরতর আবির্ভাবে প্রত্যেক মানব সমগ্র মানবের সহিত মিলিত হইয়া মহীয়ান্। পিতার সহিত পুত্র, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা, পুরুষের সহিত স্ত্রী, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশী, একজাতির সহিত অন্য জাতি, এককালের সহিত অন্য কাল, এক ইতিহাসের সহিত অন্য ইতিহাস দেবতাত্মাদ্বারা একাত্ম হইয়া উঠিয়াছে।

ছোটনাগপুর।

রাত্রে হাবড়ায় রেলগাড়িতে চড়িলাম। গাড়ির ঝাঁকানিতে নাড়া খাইয়া ঘুমটা যেন ঘোলাইয়া যায়। চেতনায় ঘুমে, স্বপ্নে জাগরণে, খিচুড়ি পাকাইয়া যায়। মাঝে মাঝে আলোর শ্রেণী, ঘণ্টাধ্বনি, কোলাহল, বিচিত্র আওয়াজে ষ্টেষণের নাম হাঁকা, আবার ঠং ঠং ঠং তিনটে ঘণ্টার শব্দে মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত অন্তর্হিত, সমস্ত 'অন্ধকার, সমস্ত নিস্তব্ধ, কেবল স্তিমিততারা নিশীথিনীর মধ্যে গাড়ির চাকার অবিশ্রাম শব্দ। সেই শব্দের তালে তালে মাথার ভিতরে সৃষ্টিছাড়া স্বপ্নের দল সমস্ত রাত্রি ধরিয়া নৃত্য করিতে থাকে। রাত চারটের সময় মধুপুর ষ্টেষণে গাড়ি বদল করিতে হইল। অন্ধকার মিলাইয়া আসিলে পর প্রভাতের আলোকে গাড়ির জানলায় বসিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম।

গাড়ি অবিশ্রাম অগ্রসর হইতে লাগিল। ভাঙা মাঠের এক-এক জায়গায় শুষ্ক নদীর বালুকা-রেখা দেখা যায়; সেই নদীর পথে বড় বড় কালো কালো পাথর পৃথিবীর কঙ্কালের মত বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে এককেটা মুণ্ডের মত পাহাড় দেখা যাইতেছে। দূরের পাহাড়গুলি ঘন নীল, যেন আকাশের নীল মেঘ খেলা করিতে আসিয়া পৃথিবীতে ধরা পড়িয়াছে; আকাশে উড়িবার জন্য যেন পাখা তুলিয়াছে কিন্তু বাঁধা আছে বলিয়া উড়িতে পারিতেছে না; আকাশ হইতে তাহার স্বজাতীয় মেঘেরা আসিয়া তাহার সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া যাইতেছে। ঐ দেখ, পাথরের মত কালো, ঝাঁকড়া চুলের ঝুঁটি বাঁধা মানুষ হাতে একগাছা লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়া। দুটো মহিষের ঘাড়ে একটা লাঙল যোড়া, এখনো চাষ আরম্ভ হয়নি, তাহারা স্থির হইয়া রেলগাড়ির দিকে তাকাইয়া আছে। মাঝে মাঝে এক একটা জায়গা ঘৃতকুমারীর

বেড়া দিয়া ঘেরা, পরিষ্কার, তকৃতক করিতেছে, মাঝখানে একটি বাঁধান ইঁদারা। চারিদিক বড় শুষ্ক দেখাইতেছে। পাতলা লম্বা শুকনো শাদা ঘাসগুলো কেমন যেন পাকাচুলের মত দেখাইতেছে। বেঁটে বেঁটে পত্রহীন গুল্মগুলি শুকাইয়া বাঁকিয়া কালো হইয়া গেছে। দূরে দূরে এক একটা তালগাছ ছোট্ট মাথা ও একখানি দীর্ঘ পা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাঝে মাঝে একেকটা অশথ গাছ আমগাছও দেখা যায়। শুষ্কক্ষেত্রের মধ্যে একটিমাত্র পুরাতন কুটীরের চালশূন্য ভাঙা ভিত্তি নিজের ছায়ার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাছে এক্‌টা মস্ত গাছের দগ্ধ গুঁড়ির খানিকটা।

সকালে ছয়টার সময় গিরিধিষ্টেষণে গিয়া পৌঁছিলাম। আর রেল-গাড়ি নাই। এখান হইতে ডাকগাড়িতে যাইতে হইবে। ডাকগাড়ি মানুষে টানিয়া লইয়া যায়। এ'কে কি আর গাড়ি বলে? চারটে চাকার উপর একটা ছোট খাঁচা মাত্র।

সর্ব্বপ্রথমে গিরিধি ডাকবাংলায় গিয়া স্নানাহার করিয়া লওয়া গেল। ডাকবাংলার যতদূরে চাই, ঘাসের চিহ্ন নাই। মাঝে মাঝে গোটাকত গাছ আছে। চারিদিকে যেন রাঙামাটীর ঢেউ উঠিয়াছে। একটা রোগা টাটু ঘোড়া গাছের তলায় বাঁধা, চারিদিকে চাহিয়া কি যে খাইবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছে না, কোন কাজ না থাকাতে গাছের গুঁড়িতে গা ঘষিয়া গা চুল্‌কাইতেছে। আরেকটা গাছে একটা ছাগল লম্বা দড়িতে বাঁধা, সে বিস্তর গবেষণায় শাকের মত একটু একটু সবুজ উদ্ভিদ-পদার্থ পট্‌ পট্‌ করিয়া ছিঁড়িতেছে। এখান হইতে যাত্রা করা গেল। পাহাড়ে রাস্তা। সম্মুখে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। শুষ্ক শূন্য সুবিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া ছায়াহীন সুদীর্ঘ পথ রৌদ্রে শুইয়া আছে। একবার কষ্টেশ্রেষ্টে টানিয়া ঠেলিয়া গাড়ি চড়াওরাস্তায়

উপর তুলিতেছে, একবার গাড়ি গড়্‌গড়্‌ করিয়া দ্রুতবেগে ঢালুরাস্তায় নামিয়া যাইতেছে। ক্রমে চলিতে চলিতে আশেপাশে পাহাড় দেখা দিতে লাগিল। লম্বা লম্বা সরু সরু শালগাছ। উইয়ের ঢিবি। কাটা গাছের গুঁড়ি। স্থানে স্থানে একেকটা পাহাড় আগাগোড়া কেবল দীর্ঘ সরু পত্রলেশশূন্য গাছে আচ্ছন্ন। উপবাসী গাছগুলো তাহাদের শুষ্ক শীর্ণ অস্থিময় দীর্ঘ আঙুল আকাশের দিকে তুলিয়া আছে; এই পাহাড় গুলাকে দেখিলে মনে হয় যেন ইহারা সহস্র তীরে বিদ্ধ হইয়াছে, যেন ভীষ্মের শরশয্যা হইয়াছে। আকাশে মেঘ করিয়া আসিয়া অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। কুলিরা গাড়ি টানিতে টানিতে মাঝে মাঝে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে পথের নুড়িতে হুঁচট্ খাইয়া গাড়িটা অত্যন্ত চমকিয়া উঠিতেছে। মাঝের এক জায়গায় পথ অবসান হইয়া বিস্তৃত বালুকাশয্যায় একটি ক্ষীণ নদীর রেখা দেখা দিল। নদীর নাম জিজ্ঞাসা করাতে কুলিরা কহিল "বড়াকর নদী।" টানাটানি করিয়া গাড়ি এই নদীর উপর দিয়া পার করিয়া আবার রাস্তায় তুলিল। রাস্তার দুই পাশে ডোবাতে জল দাঁড়াইয়াছে; তাহাতে চার পাঁচটা মহিষ পরস্পরের গায়ে মাথা রাখিয়া অর্দ্ধেক শরীর ডুবাইয়া আছে, পরম আলস্যভরে আমাদের দিকে এক একবার কটাক্ষপাত করিতেছে মাত্র।

যখন সন্ধ্যা আসিল, আমরা গাড়ি হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। অদূরে দুইটি পাহাড় দেখা যাইতেছে তাহার মধ্যদিয়া উঠিয়া নামিয়া পথ গিয়াছে। যেখানেই চাহি, চারিদিকে লোক নাই, লোকালয় নাই, শস্য নাই, চষা মাঠ নাই; চারিদিকে উঁচুনীচু পৃথিবী নিস্তব্ধ নিঃশব্দ কঠিন সমুদ্রের মত ধূধূ করিতেছে। দিক্ দিগন্তরের উপরে গোধূলির চিক্‌চিকে সোনালি আঁধারের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। কোথাও জনমানব জীবজন্তু নাই বটে, তবু মনে হয় এই সুবিস্তীর্ণ ভূমিশয্যায় যেন কোন্ এক বিরাট পুরুষের জন্য নিদ্রার আয়োজন হইতেছে। কে

যেন প্রহরীর ন্যায় মুখে আঙুল দিয়া দাঁড়াইয়া, তাই সকলে ভয়ে নিঃশ্বাস রোধ করিয়া আছে। দূর হইতে উপছায়ার মত একটি পথিক ঘোড়ার পিঠে বোঝা দিয়া আমাদের পাশ দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

রাত্রিটা কোনমতে জাগিয়া ঘুমাইয়া পাশ ফিরিয়া কাটিয়া গেল। জাগিয়া উঠিয়া দেখি বামে ঘনপত্রময় বন। গাছে গাছে লতা, ভূমি নানাবিধ গুল্মে আচ্ছন্ন। বনের মাথার উপর দিয়া দূর পাহাড়ের নীল-শিখর দেখা যাইতেছে। মস্ত মস্ত পাথর। পাথরের ফাটলে এক একটা গাছ; তাহাদের ক্ষুধিত শিকড়গুলো দীর্ঘ হইয়া চারিদিক হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, পাথরখানাকে বিদীর্ণ করিয়া তাহারা কঠিন মুঠি দিয়া খাদ্য আঁকড়িয়া ধরিতে চায়। সহসা বামে জঙ্গল কোথায় গেল! সুদূর বিস্তৃত মাঠ। দূরে গরু চরিতেছে, তাহাদিগকে ছাগলের মত ছোট ছোট দেখাইতেছে। মহিষ কিম্বা গরুর কাঁধে লাঙল দিয়া পশুর লাঙ্গুল মলিয়া চাষারা চাষ করিতেছে। চষা মাঠ বামে পাহাড়ের উপর সোপানে সোপানে থাকে থাকে উঠিয়াছে।

বেলা তিনটার সময় হাজারিবাগের ডাক বাংলায় আসিয়া পৌঁছিলাম। প্রশস্ত প্রান্তরের মধ্যে হাজারিবাগ সহরটি অতি পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। সাহরিক ভাব বড় নাই। গলি ঘুঁজি, আবর্জ্জনা, নর্দ্দামা, ঘেঁসাঘেঁসি, গোলমাল, গাড়ি ঘোড়া, ধূলো কাদা, মাছি মশা, এ সকলের প্রাদুর্ভাব বড় নাই। মাঠ পাহাড় গাছপালার মধ্যে সহরটি তক্‌তক্‌ করিতেছে।

একদিন কাটিয়া গেল। এখন দুপুর বেলা। ডাকবাংলার বারান্দার সম্মুখে কেদারায় একলা চুপ করিয়া বসিয়া আছি। আকাশ সুনীল। দুই খণ্ড শীর্ণ মেঘ শাদা পাল তুলিয়া চলিয়াছে। অল্প অল্প বাতাস আসিতেছে। একরকম মেঠো মেঠো ঘেসো ঘেসো গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। বারান্দার চালের উপর একটা কাঠবিড়ালি। দুই শালিখ বারান্দায় আসিয়া চকিতভাবে পুচ্ছ নাচাইয়া লাফাইতেছে। পাশের

রাস্তা দিয়া গরু লইয়া যাইতেছে তাহাদের গলার ঘণ্টার ঠুং [illegible] রাস্ত প্রহ শুনিতেছি। লোকজনেরা কেউ ছাতা মাথায় দিয়া কেউ কাঁধে মোট লইয়া কেউ দুয়েকটা গরু তাড়াইয়া, কেউ একটা ছোট টাট্টুর উপর চড়িয়া রাস্তা দিয়া অতি ধীরেসুস্থে চলিতেছে; কোলাহল নাই, ব্যস্ততা নাই, মুখে ভাবনার চিহ্ন নাই। দেখিলে মনে হয় এখানকার মানবজীবন দ্রুত এঞ্জিনের মত হাঁসফাঁস করিয়া অথবা গুরুভারাক্রান্ত গরুর গাড়ির চাকার মত অর্ত্তনাদ করিতে করিতে চলিতেছে না। গাছের তলা দিয়া দিয়া একটুখানি শীতল নির্ঝর যেমন ছায়ায় ছায়ায় কুল্‌কুল্‌ করিয়া যায়, জীবন তেম্‌নি করিয়া যাইতেছে। সমুখে ঐ আদালত। কিন্তু এখানকার আদালতও তেমন কঠোরমূর্ত্তি নয়। ভিতরে যখন উকিলে উকিলে শামলায় শামলায় লড়াই বাধিয়াছে তখন বাহিরের অশথগাছ হইতে দুই পাপিয়ার অবিশ্রাম উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতেছে। বিচারপ্রার্থী লোকেরা আমগাছের ছায়ায় বসিয়া জটলা করিয়া হাহা করিয়া হাসিতেছে, এখান হইতে শুনিতে পাইতেছি। মাঝে মাঝে আদালত হইতে মধ্যাহ্নের ঘণ্টা বাজিতেছে। চারিদিকে যখন জীবনের মৃদুমন্দ গতি, তখন এই ঘণ্টার শব্দ শুনিলে টের পাওয়া যায় যে শৈথিল্যের স্রোতে সময় ভাসিয়া যায় নাই, সময় মাঝখানে দাঁড়াইয়া প্রতিঘণ্টায় লৌহকণ্ঠে বলিতেছে "আর কেহ জাগুক্‌ না জাগুক্‌ আমি জাগিয়া আছি!" কিন্তু লেখকের অবস্থা ঠিক সেরূপ নয়। আমার চোখে তন্দ্রা আসিতেছে।

১২৯২।

সরোজিনী প্রয়াণ।

(অসমাপ্ত বিবরণ)

১১ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার। ইংরাজি ২৩শে মে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। আজ শুভলগ্নে "সরোজিনী" বাষ্পীয় পোত তাহার দুই সহচরী লৌহতরী দুই পার্শ্বে লইয়া বরিশালে তাহার কর্ম্মস্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিবে। যাত্রীর দল বাড়িল। কথা ছিল আমরা তিন জনে যাইব—তিনটী বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ মানুষ। সকালে উঠিয়া জিনিষ পত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া আছি, পরম-পরিহসনীয়া শ্রীমতী ভ্রাতৃজায়া ঠাকুরাণীর নিকটে ম্লানমুখে বিদায় লইবার জন্য সমস্ত উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় শুনা গেল তিনি সসন্তানে আমাদের অনুবর্ত্তিনী হইবেন। তিনি কার মুখে শুনিয়াছেন যে আমরা যে পথে যাইতেছি, সে পথ দিয়া বরিশালে যাইব বলিয়া অনেকে বরিশালে যায় নাই এমন শুনা গিয়াছে; আমরাও পাছে সেইরূপ ফাঁকি দিই এই সংশয়ে তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজের ডান হাতের পাঁচটা ছোট ছোট সরু সরু আঙুলের নখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিস্তর বিবেচনা করিতে লাগিলেন, অবশেষে ঠিক আটটার সময় নখাগ্র হইতে যতগুলো বিবেচনা ও যুক্তি সংগ্রহ সম্ভব সমস্ত নিঃশেষে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আমাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন।

সকাল বেলায় কলিকাতার রাস্তা যে বিশেষ সুদৃশ্য তাহা নহে, বিশেষতঃ চিৎপুর রোড। সকাল বেলাকার প্রথম সূর্য্যকিরণ পড়িয়াছে,

শ্যাক্‌রা গাড়ির আস্তাবলের মাথায়,—আর এক সার বেলোয়ারি ঝাড়-ওয়ালা মুসলমানদের দোকানের উপর। গ্যাস-ল্যাম্পগুলোর গায়ে সূর্য্যের আলো এমনি চিক্‌মিক্‌ করিতেছে সেদিকে চাহিবার জো নাই। সমস্ত রাত্রি নক্ষত্রের অভিনয় করিয়া তাহাদের সাধ মেটে নাই, তাই সকাল বেলায় লক্ষ যোজন দূর হইতে সূর্য্যকে মুখ ভেঙাইয়া অতিশয় চক্‌চোকে মহত্ত্বলাভের চেষ্টায় আছে। ট্রামগাড়ি শিষ্‌ দিতে দিতে চলিয়াছে, কিন্তু এখনো যাত্রী বেশী জোটে নাই। ম্যুনিসিপালিটির শকট কলিকাতার আবর্জ্জনা বহন করিয়া, অত্যন্ত মন্থর হইয়া চলিয়া যাইতেছে। ফুটপাথের পার্শ্বে সারি সারি শ্যাকরা গাড়ি আরোহীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া; সেই অবসরে অশ্বচর্ম্মাবৃত চতুষ্পদ কঙ্কালগুলা ঘাড় হেঁট করিয়া অত্যন্ত শুকনো ঘাসের আঁটি অন্যমনস্কভাবে চিবাইতেছে; তাহাদের সেই পার-মার্থিক ভাব দেখিলে মনে হয় যে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহারা তাহাদের সম্মুখস্থ ঘাসের আঁটির সঙ্গে সমস্ত জগৎসংসারের তুলনা করিয়া সারবত্তা ও সরসতা সম্বন্ধে কোন প্রভেদ দেখিতে পায় নাই। দক্ষিণে মুসলমানের দোকানের হৃতচর্ম্ম খাসীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কতক দড়িতে ঝুলিতেছে, কতক খণ্ড খণ্ড আকারে শলাকা আশ্রয় করিয়া অগ্নিশিখার উপরে ঘুর খাইতেছে এবং বৃহৎকায় রক্তবর্ণ কেশবিহীন শ্মশ্রুলগণ বড় বড় হাতে মস্ত মস্ত রুটী সেঁকিয়া তুলিতেছে। কাবাবের দোকানের পাশে ফুঁকো ফানুষ নির্ম্মাণের জায়গা, অনেক ভোর হইতেই তাহাদের চুলায় আগুণ জালান হইয়াছে। ঝাঁপ খুলিয়া কেহ বা হাত মুখ ধুইতেছে, কেহ বা দোকানের সম্মুখে ঝাঁট দিতেছে, দৈবাৎ কেহ বা লাল কলপ্‌দেওয়া দাড়ি লইয়া চোখে চসমা আঁটিয়া একখানা পার্সী কেতাব পড়িতেছে। সম্মুখে মস্‌জিদ্‌; একজন অন্ধ ভিক্ষুক মস্‌জিদের সিঁড়ির উপরে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

গঙ্গার ধারে কয়লাঘাটে গিয়া পৌছান গেল। সমুখ হইতে ছাউনি-ওয়ালা বাঁধা নৌকাগুলা দৈত্যদের পায়ের মাপে বড় বড় চটিজুতার মত

দেখাইতেছে। মনে হইতেছে, তাহারা যেন হঠাৎ প্রাণ পাইয়া অনুপস্থিত চরণগুলি স্মরণ করিয়া চট্‌চট্‌ করিয়া চলিবার প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া পড়িয়াছে। একবার চলিতে পাইলে হয়, এইরূপ তাহাদের ভাব। একবার উঠিতেছে, যেন উঁচু হইয়া ডাঙার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে কেহ আসিতেছে কি না,—আবার নামিয়া পড়িতেছে। একবার আগ্রহে অধীর হইয়া জলের দিকে চলিয়া যাইতেছে, আবার কি মনে করিয়া আত্মসম্বরণ পূর্ব্বক তীরের দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। গাড়ি হইতে মাটিতে পা দিতে না দিতে ঝাঁকে ঝাঁকে মাঝি আমাদের উপরে আসিয়া পড়িল। এ বলে আমার নৌকায়, ও বলে আমার নৌকায়, এইরূপে মাঝির তরঙ্গে আমাদের তন্নুর তরী একবার দক্ষিণে, একবার বামে, একবার মাঝখানে আবর্ত্তের মধ্যে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। অবশেষে অবস্থার তোড়ে, পূর্ব্ব জন্মের বিশেষ একটা কি কর্ম্মফলে বিশেষ একটা নৌকার মধ্যে গিয়া পড়িলাম। পাল তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। গঙ্গায় আজ কিছু বেশী ঢেউ দিয়াছে, বাতাসও উঠিয়াছে। এখন জোয়ার। ছোট ছোট নৌকাগুলি আজ পাল ঝুলাইয়া ভারি তেজে চলিয়াছে; আপনার দেমাকে আপনি কাৎ হইয়া পড়ে বা! একটা মস্ত ষ্টীমার দুই পাশে দুই লৌহতরী লইয়া আশপাশের ছোট খাট নৌকাগুলির প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞাভরে লোহার নাকটা আকাশে তুলিয়া গাঁ গাঁ শব্দ করিতে করিতে সধূম নিশ্বাসে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। মনোযোগ দিয়া দেখি আমাদেরই জাহাজ—রাখ্ রাখ্ থাম্ থাম্! মাঝি কহিল—"মহাশয় ভয় করিবেন না, এমন ঢেরবার জাহাজ ধরিয়াছি।" বলা বাহুল্য এবারও ধরিল। জাহাজের উপর হইতে একটা সিঁড়ি নামাইয়া দিল। ছেলেদের প্রথমে উঠান গেল, তাহার পর আমার ভাজ ঠাকুরাণী যখন বহু কষ্টে তাঁহার স্থল-পদ্ম-পা-দুখানি জাহাজের উপর তুলিলেন তখন আমরাও মধুকরের মত তাঁহারি পশ্চাতে উপরে উঠিয়া পড়িলাম।

(২)

যদিও স্রোত এবং বাতাস প্রতিকূলে ছিল, তথাপি আমাদের এই গজবর ঊর্দ্ধশুণ্ডে বৃংহিতধ্বনি করিতে করিতে গজেন্দ্রগমনের মনোহারিতা উপেক্ষা করিয়া চত্বারিংশ তুরঙ্গ-বেগে ছুটিতে লাগিল। আমরা ছয় জন এবং জাহাজের বৃদ্ধ কর্ত্তা বাবু এই সাত জনে মিলিয়া জাহাজের কামরার সম্মুখে খানিকটা খোলা জায়গায় কেদারা লইয়া বসিলাম। আমাদের মাথার উপরে কেবল একটা ছাত আছে। সম্মুখ হইতে হুহু করিয়া বাতাস আসিয়া কানের কাছে সোঁ সোঁ করিতে লাগিল, জামার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অকস্মাৎ ফুলাইয়া তুলিয়া ফর্ ফর আওয়াজ করিতে থাকিল এবং আমার ভ্রাতৃ-জায়ার সুদীর্ঘ সুসংযত চুলগুলিকে বার বার অবাধ্যতাচরণে উৎসাহিত করিয়া তুলিল। তাহারা না কি জাত-সাপিনীর বংশ, এই নিমিত্ত বিদ্রোহী হইয়া বেণী বন্ধন এড়াইয়া পূজনীয়া ঠাকুরাণীর নাসাবিবর ও মুখরন্ধ্রের মধ্যে পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল; আবার আর কতকগুলি ঊর্দ্ধমুখ হইয়া আস্ফালন করিতে করিতে মাথার উপর রীতিমত নাগলোকের উৎসব বাধাইয়া দিল; কেবল বেণী নামক অজগর সাপটা শত বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, শত শেলে বিদ্ধ হইয়া, শত পাক পাকাইয়া নির্জ্জীব ভাবে খোঁপা আকারে ঘাড়ের কাছে কুণ্ডলী পাকাইয়া রহিল। অবশেষে কখন এক সময়ে দাদা কাঁধের দিকে মাথা নোয়াইয়া ঘুমাইতে লাগিলেন, বৌঠাকুরাণীও চুলের দৌরাত্ম্য বিস্মৃত হইয়া চৌকির উপরে চক্ষু মুদিলেন।

জাহাজ অবিশ্রাম চলিতেছে। ঢেউগুলি চারিদিকে লাফাইয়া উঠিতেছে—তাহাদের মধ্যে এক একটা সকলকে ছাড়াইয়া শুভ্র ফনা ধরিয়া হঠাৎ জাহাজের ডেকের উপর যেন ছোবল মারিতে আসিতেছে—গর্জ্জন করিতেছে, পশ্চাতের সঙ্গীদের মাথা তুলিয়া ডাকিতেছে—স্পর্দ্ধা করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া চলিতেছে—মাথার উপরে সূর্য্যকিরণ দীপ্তিমান চোখের মত জ্বলিতেছে—নৌকাগুলাকে কাৎ করিয়া ধরিয়া তাহার মধ্যে কি

আছে দেখিবার জন্য উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেছে, মুহূর্ত্তের মধ্যে কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিয়া নৌকাটাকে ঝাঁকানী দিয়া আবার কোথায় তাহারা চলিয়া যাইতেছে। আপিসের ছিপ্‌ছিপে পান্সীগুলি পালটুকু ফুলাইয়া আপনার মধুর গতির আনন্দ আপনি যেন উপভোগ করিতে করিতে চলিতেছে; তাহারা মহৎ মাস্তুল-কিরীটী জাহাজের গাম্ভীর্য্য উপেক্ষা করে, ষ্টিমারের পিনাক ধ্বনিও মান্য করে না, বরঞ্চ বড় বড় জাহাজের মুখের উপর পাল ফুলাইয়া হাসিয়া রঙ্গ করিয়া চলিয়া যায়; জাহাজও তাহাতে বড় অপমান জ্ঞান করে না। কিন্তু গাধাবোটের ব্যবহার স্বতন্ত্র, তাহাদের নড়িতে তিন ঘণ্টা, তাহাদের চেহারাটা নিতান্ত স্থূলবুদ্ধির মত—তাহারা নিজে নড়িতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে জাহাজকে সরিতে বলে—তাহারা গায়ের কাছে আসিয়া পড়িলে সেই স্পর্দ্ধা অসহ্য বোধ হয়।

এক সময় শুনা গেল আমাদের জাহাজের কাপ্তেন নাই। জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্ব রাত্রেই সে গা-ঢাকা দিয়াছে। শুনিয়া আমার ভাজঠাকুরাণীর ঘুমের ঘোর একেবারে ছাড়িয়া গেল—তাঁহার সহসা মনে হইল যে, কাপ্তেন যখন নাই তখন নোঙরের অচল-শরণ অবলম্বন করাই শ্রেয়। দাদা বলিলেন তাহার আবশ্যক নাই, কাপ্তেনের নীচেকার লোকেরা কাপ্তেনের চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নহে। কর্ত্তাবাবুরও সেইরূপ মত। বাকী সকলে চুপ করিয়া রহিল কিন্তু তাহাদের মনের ভিতরটা আর কিছুতেই প্রসন্ন হইল না। তবে, দেখিলাম নাকি জাহাজটা সত্য সত্যই চলিতেছে, আর, হাঁক-ডাকেও কাপ্তেনের অভাব সম্পূর্ণ ঢাকা পড়িয়াছে, তাই চুপ মারিয়া রহিলাম। হঠাৎ জাহাজের হৃদয়ের ধুক-ধুক শব্দ বন্ধ হইয়া গেল—কল চলিতেছে না—নোঙর ফেল, নোঙর ফেল বলিয়া শব্দ উঠিল—নোঙর ফেলা হইল। কলের এক জায়গায় কোথায় একটা জোড় খুলিয়া গেছে—সেটা মেরামত করিলে তবে জাহাজ চলিবে।

মেরামত আরম্ভ হইল। এখন বেলা সাড়েদশটা, দেড়টার পূর্ব্বে মেরামত সমাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

বসিয়া বসিয়া গঙ্গাতীরের শোভা দেখিতে লাগিলাম। শান্তিপুরের ক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা এমন আর কোথায় ছে! গাছপালা ছায়া কুটীর—নয়নের আনন্দ অবিরল সারি সারি দুইধারে বরাবর চলিয়াছে—কোথাও বিরাম নাই। কোথাও বা তটভূমি সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন হইয়া গঙ্গার কোলে আসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা একেবারে নদীর জল পর্য্যন্ত ঘন গাছপালা লতাজালে জড়িত হইয়া ঝুঁকিয়া আসিয়াছে—জলের উপর তাহাদের ছায়া অবিশ্রাম দুলিতেছে; কতকগুলি সূর্য্যকিরণ সেই ছায়ার মাঝে মাঝে ঝিকমিক করিতেছে, আর বাকী কতকগুলি, গাছ পালার কম্পমান কচি মসৃণ সবুজ পাতার উপরে চিক্‌চিক্ করিয়া উঠিতেছে। একটা-বা নৌকা তাহার কাছাকাছি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে, সে সেই ছায়ার নীচে, অবিশ্রাম জলের কুলকুল শব্দে, মৃদু মৃদু দোল খাইয়া বড় আরামের ঘুম ঘুমাইতেছে। তাহার আর এক পাশে বড় বড় গাছের অতি ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া ভাঙা ভাঙা বাঁকা একটা পদচিহ্নের পথ জল পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। সেই পথ দিয়া গ্রামের মেয়েরা কলসী কাঁখে করিয়া জল লইতে নামিতেছে, ছেলেরা কাদার উপরে পড়িয়া জল ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া সাঁতার কাটিয়া ভারি মাতামাতি করিতেছে। প্রাচীন ভাঙা ঘাটগুলির কি শোভা! মানুষেরা যে এ ঘাট বাঁধিয়াছে তাহা এক রকম ভুলিয়া যাইতে হয়; এও যেন গাছপালার মত গঙ্গাতীরের নিজস্ব। ইহার বড় বড় ফাটলের মধ্য দিয়া অশথগাছ উঠিয়াছে, ধাপগুলির ইঁটের ফাঁক দিয়া ঘাস গজাইতেছে—বহু বৎসরের বর্ষার জলধারায় গায়ের উপরে শেয়ালা পড়িয়াছে—এবং তাহার রং চারিদিকের শ্যামল গাছপালার রঙের সহিত কেমন সহজে মিশিয়া গেছে। মানুষের কাজ ফুরাইলে প্রকৃতি নিজের

হাতে সেটা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তুলি ধরিয়া এখানে ওখানে নিজের রং লাগাইয়া দিয়াছেন। অত্যন্ত কঠিন সগর্ব্ব ধবধবে পারিপাট্য নষ্ট করিয়া, ভাঙ্গাচোরা বিশৃঙ্খল মাধুর্য্য স্থাপন করিয়াছেন। গ্রামের যে সকল ছেলে মেয়েরা নাহিতে বা জল লইতে আসে তাহাদের সকলেরই সঙ্গে ইহার যেন একটা কিছু সম্পর্ক পাতান আছে—কেহ ইহার নাতনী, কেহ ইহার মা মাসী। তাহাদের দাদামহাশয় ও দিদিমারা যখন এতটুকু ছিল তখন ইহারই ধাপে বসিয়া খেলা করিয়াছে, বর্ষার দিনে পিছল খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর সেই যে যাত্রাওয়ালা বিখ্যাত গায়ক অন্ধ শ্রীনিবাস সন্ধ্যাবেলায় ইহার পৈঠার উপর বসিয়া বেহালা বাজাইয়া গৌরী রাগিণীতে "গেল গেল দিন" গাহিত ও গাঁয়ের দুই চারিজন লোক আশে পাশে জমা হইত, তাহার কথা আজ আর কাহারও মনে নাই। গঙ্গা-তীরের ভগ্ন দেবালয়গুলিরও যেন বিশেষ কি মাহাত্ম্য আছে। তাহার মধ্যে আর দেবপ্রতিমা নাই। কিন্তু সে নিজেই জটাজুটবিলম্বিত অতি পুরাতন ঋষির মত অতিশয় ভক্তিভাজন ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। এক এক জায়গায় লোকালয়—সেখানে জেলেদের নৌকা সারি সারি বাঁধা রহিয়াছে। কতকগুলি জলে, কতকগুলি ডাঙায় তোলা, কতকগুলি তীরে উপুড় করিয়া মেরামত করা হইতেছে; তাহাদের পাঁজ্‌রা দেখা যাইতেছে। কুঁড়ে ঘরগুলি কিছু ঘন ঘন কাছাকাছি—কোন কোনটা বাঁকাচোরা বেড়া দেওয়া—দুই চারিটি গরু চরিতেছে, গ্রামের দুই একটা শীর্ণ কুকুর নিষ্কর্ম্মার মত গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; একটা উলঙ্গ ছেলে মুখের মধ্যে আঙুল পূরিয়া বেগুনের ক্ষেতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া আমাদের জাহাজের দিকে চাহিয়া আছে। হাঁড়ি ভাসাইয়া লাঠি-বাঁধা ছোট ছোট জাল লইয়া জেলের ছেলেরা ধারে ধারে চিংড়িমাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে। সমুখে তীরে বটগাছের জালবদ্ধ শিকড়ের নীচে হইতে নদীস্রোতে মাটি ক্ষয় করিয়া লইয়া গিয়াছে—ও সেই শিকড়গুলির

মধ্যে একটী নিভৃত আশ্রয় নির্ম্মিত হইয়াছে। একটী বুড়ি তাহার দুই চারিটি হাঁড়িকুড়ি ও একটী চট লইয়া তাহারই মধ্যে বাস করে। আবার আর এক দিকে চড়ার উপরে বহুদূর ধরিয়া কাশ বন—শরৎকালে যখন ফুল ফুটিয়া উঠে তখন বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোলে হাসির সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতে থাকে। যে কারণেই হউক গঙ্গার ধারের ইটের পাঁজাগুলিও আমার দেখিতে বেশ ভাল লাগে;—তাহাদের আশেপাশে গাছপালা থাকে না—চারিদিকে পোড়ো জায়গা এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো—ইতস্ততঃ কতকগুলা ইঁট খসিয়া পড়িয়াছে—অনেকগুলি ঝামা ছড়ান—স্থানে স্থানে মাটি কাটা—এই অনুর্ব্বরতা বন্ধুরতার মধ্যে পাঁজাগুলো কেমন হতভাগ্যের মত দাঁড়াইয়া থাকে। গাছের শ্রেণীর মধ্য হইতে শিবের দ্বাদশ মন্দির দেখা যাইতেছে; সমুখে ঘাট, নহবৎখানা হইতে নহবৎ বাজিতেছে। তাহার ঠিক পাশেই খেয়াঘাট। কাঁচা ঘাট, ধাপে ধাপে তাল গাছের গুঁড়ি দিয়া বাঁধান। আরো দক্ষিণে কুমারদের বাড়ী, চাল হইতে কুমড়া ঝুলিতেছে। একটী প্রৌঢ়া কুটীরের দেয়ালে গোবর দিতেছে—প্রাঙ্গণ পরিষ্কার, তক্‌তক্‌ করিতেছে—কেবল এক প্রান্তে মাচার উপরে লাউ লতাইয়া উঠিয়াছে, আর এক দিকে তুলসীতলা। সূর্য্যাস্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারের শোভা যে দেখে নাই সে বাংলার সৌন্দর্য্য দেখে নাই বলিলেও হয়। এই পবিত্র শান্তিপূর্ণ অনুপম সৌন্দর্য্যচ্ছবির বর্ণনা সম্ভবে না। এই স্বর্ণচ্ছায় ম্লান সন্ধ্যালোকে দীর্ঘ নারিকেলের গাছগুলি, মন্দিরের চূড়া, আকাশের পটে আঁকা নিস্তব্ধ গাছের মাথাগুলি, স্থির জলের উপরে লাবণ্যের মত সন্ধ্যার আভা—সুমধুর বিরাম, নির্ব্বাপিত কলরব, অগাধ শান্তি—সে সমস্ত মিলিয়া নন্দনের একখানি মরীচিকার মত ছায়াপথের পরপারবর্ত্তী সুদূর শান্তি-নিকেতনের একখানি ছবির মত পশ্চিম দিগন্তের ধার-টুকুতে আঁকা দেখা যায়। ক্রমে সন্ধ্যার আলো মিলাইয়া যায়, বনের মধ্যে এদিকে ওদিকে এক একটী করিয়া প্রদীপ

জ্বলিয়া উঠে, সহসা দক্ষিণের দিক হইতে একটা বাতাস উঠিতে থাকে—পাতা ঝর্‌ঝর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠে, অন্ধকারে বেগবতী নদী বহিয়া যায়, কূলের উপরে অবিশ্রাম তরঙ্গ আঘাতে ছল্‌ছল্ করিয়া শব্দ হইতে থাকে—আর কিছু ভাল দেখা যায় না, শোনা যায় না—কেবল ঝিঁঝি পোকার শব্দ উঠে—আর জোনাকিগুলি অন্ধকারে জ্বলিতে নিভিতে থাকে। আরো রাত্রি হয়। ক্রমে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ ঘোর অন্ধকার অশথ গাছের মাথার উপর দিয়া ধীরে ধীরে আকাশে উঠিতে থাকে। নিম্নে বনের শ্রেণীবদ্ধ অন্ধকার, আর উপরে ম্লান চন্দ্রের আভা। খানিকটা আলো অন্ধকার-ঢালা গঙ্গার মাঝখানে একটা জায়গায় পড়িয়া তরঙ্গে তরঙ্গে ভাঙিয়া ভাঙিয়া যায়। ও-পারের অস্পষ্ট বনরেখার উপর আর-খানিকটা আলো পড়ে—সেই টুকু আলোতে ভাল করিয়া কিছুই দেখা যায় না; কেবল ও-পারের সুদূরতা ও অস্ফুটতাকে মধুর রহস্যময় করিয়া তোলে। এ-পারে নিদ্রার রাজ্য আর ও-পারে স্বপ্নের দেশ বলিয়া মনে হইতে থাকে।

এই যে সব গঙ্গার ছবি আমার মনে উঠিতেছে, এ কি সমস্তই এইবার-কার ষ্টীমার-যাত্রার ফল? তাহা নহে। এ সব কত দিনকার কত ছবি, মনের মধ্যে আঁকা রহিয়াছে। ইহারা বড় সুখের ছবি, আজ ইহাদের চারিদিকে অশ্রুজলের স্ফটিক দিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছি। এমনতর শোভা আর এ জন্মে দেখিতে পাইব না।

মেরামৎ শেষ হইয়া গেছে—যাত্রীদের স্নানাহার হইয়াছে, বিস্তর কোলাহল করিয়া নোঙর তোলা হইতেছে। জাহাজ ছাড়া হইল। বামে মুচিখোলার নবাবের প্রকাণ্ড খাঁচা। ডান দিকে শিবপুর বটানিকেল গার্ডেন। যত দক্ষিণে যাইতে লাগিলাম, গঙ্গা ততই চওড়া হইতে লাগিল। বেলা দুটো তিনটের সময় ফলমূল সেবন করিয়া সন্ধ্যা বেলায় কোথায় গিয়া থামা যাইবে তাহারি আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল। আমাদের দক্ষিণে বামে নিশান উড়াইয়া অনেক জাহাজ গেল

আসিল—তাহাদের সগর্ব্ব গতি দেখিয়া আমাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়া উঠিল। বাতাস যদিও উল্টা বহিতেছে, কিন্তু স্রোত আমাদের অনুকূল। আমাদের উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের বেগও অনেক বাড়িয়াছে। জাহাজ বেশ দুলিতে লাগিল। দূর হইতে দেখিতেছি এক একটা মস্ত ঢেউ ঘাড় তুলিয়া আসিতেছে, আমরা সকলে আনন্দের সঙ্গে তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি—তাহারা জাহাজের পাশে নিষ্ফল রোষে ফেনাইয়া উঠিয়া গর্জ্জন করিয়া জাহাজের লোহার পাঁজরায় সবলে মাথা ঠুকিতেছে, হতাশ্বাস হইয়া দুই পা পিছাইয়া পুনশ্চ আসিয়া আঘাত করিতেছে, আমরা সকলে মিলিয়া তাহাই দেখিতেছি। হঠাৎ দেখি কর্ত্তা বাবু মুখ বিবর্ণ করিয়া কর্ণধারের কাছে ছুটিয়া যাইতেছেন। হঠাৎ রব উঠিল, এই এই—রাখ্ রাখ্, থাম্ থাম্। গঙ্গার তরঙ্গ অপেক্ষা প্রচণ্ডতর বেগে আমাদের সকলেরই হৃদয় তোলপাড় করিতে লাগিল। চাহিয়া দেখি সম্মুখে আমাদের জাহাজের উপর সবেগে একটা লোহার বয়া ছুটিয়া আসিতেছে, অর্থাৎ আমরা বয়ার উপরে ছুটিয়া চলিতেছি। কিছুতেই সামলাইতে পারিতেছি না। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মত বয়াটার দিকে চাহিয়া আছি। সে জিনিষটা মহিষের মত ঢুঁ উদ্যত করিয়া আসিতেছে। অবশেষে ঘা মারিল।

(৩)

কোথায় সেই অবিশ্রাম জলকল্লোল, শত লক্ষ তরঙ্গের অহোরাত্র উৎসব, কোথায় সেই অবিরল বনশ্রেণী, আকাশের সেই অবারিত নীলিমা, ধরণীর নবযৌবনে পরিপূর্ণ হৃদয়োচ্ছ্বাসের ন্যায় সেই অনন্তের দিকে চির-উচ্ছ্বসিত বিচিত্র তরুতরঙ্গ, কোথায় সেই প্রকৃতির শ্যামল স্নেহের মধ্যে প্রচ্ছন্ন শিশু লোকালয়গুলি—ঊর্দ্ধে সেই চিরস্থির আকাশের নিম্নে সেই চিরচঞ্চলা স্রোতস্বিনী!—চিরস্তব্ধের সহিত চিরকোলাহলময়ের, সর্ব্বত্রসমানের সহিত চিরবিচিত্রের, নির্ব্বিকারের

সহিত চিরপরিবর্ত্তনশীলের অবিচ্ছেদ্য প্রেমের মিলন কোথায়! এখানে সুর্‌কিতে ইঁটেতে, ধূলিতে নাসারন্ধ্রে, গাড়িতে ঘোড়াতে হঠ-যোগ চলিতেছে। এখানে চারিদিকে দেয়ালের সহিত দেয়ালের, দরজার সহিত হুড়কার, কড়ির সহিত বরগার চাপকানের সহিত বোতামের আঁটাআঁটি মিলন।

পাঠকেরা বোধ করি বুঝিতে পারিয়াছেন, এতদিন সরেজমিনে লেখা চলিতেছিল—সরে-জমিনে না হউক্ সরে-জলে বটে—এখন আমরা ডাঙার ধন ডাঙার ফিরিয়া আসিয়াছি। এখন সেথানকার কথা এখানে, পূর্ব্বেকার কথা পরে লিখিতে হইতেছে—সুতরাং এখন যাহা লিখিব তাহার ভুলচুকের জন্য দায়ী হইতে পারিব না।

এখন মধ্যাহ্ন। আমার সমুখে একটা ডেস্ক, পাপোষে একটা কালো মোটা কুকুর ঘুমাইতেছে—বারান্দায় শিকলি-বাঁধা একটা বাঁদর লেজের উকুন বাছিতেছে, তিনটে কাক আলিসার উপরে বসিয়া অকারণ চেঁচাইতেছে এবং একএক-বার খপ্ করিয়া বাঁদরের ভুক্তাবশিষ্ট ভাত এক-চঞ্চু লইয়া ছাতের উপরে উড়িয়া বসিতেছে। ঘরের কোণে একটা প্রাচীন হর্ম্মোনিয়ম বাক্সের মধ্যে গোটাকতক ইঁদুর খট্ খট্ করিতেছে। কলিকাতা সহরের ইমারতের একটী শুষ্ক কঠিন কামরা, ইহারি মধ্যে আমি গঙ্গার আবাহন করিতেছি—তপঃক্ষীণ জহ্নুমুনির শুষ্ক পাকস্থলীর অপেক্ষা এখানে ঢের বেশী স্থান আছে। আর, স্থান-সঙ্কীর্ণতা বলিয়া কোনো পদার্থ প্রকৃতির মধ্যে নাই। সে আমাদের মনে। দেখ—বীজের মধ্যে অরণ্য, একটী জীবের মধ্যে তাহার অনন্ত বংশ পরম্পরা। আমি যে ঐ ষ্টীফেন সাহেবের এক বোতল ব্লুব্লাক্ কালী কিনিয়া আনিয়াছি, উহারি প্রত্যেক ফোঁটার মধ্যে কত পাঠকের সুষুপ্তি মাদার-টিংচার আকারে বিরাজ করিতেছে। এই কালীর বোতল দৈবক্রমে যদি সুযোগ্য হাতে পড়িত তবে ওটাকে দেখিলে ভাবিতাম, সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী অন্ধকারের

মধ্যে এই বিচিত্র আলোকময় অমর জগৎ যেমন প্রচ্ছন্ন ছিল, তেমনি ঐ এক বোতল অন্ধকারের মধ্যে কত আলোকময় নূতন সৃষ্টি প্রচ্ছন্ন আছে। একটা বোতল দেখিয়াই এত কথা মনে উঠে, যেখানে ষ্টীফেন সাহেবের কালীর কারখানা সেখানে দাঁড়াইয়া একবার ভাবিলে বোধ করি মাথা ঠিক রাখিতে পারি না। কত পুঁথি, কত চটি, কত যশ, কত কলঙ্ক, কত জ্ঞান, কত পাগলামী, কত ফাঁসির হুকুম, যুদ্ধের ঘোষণা, প্রেমের লিপি কালো কালো হইয়া স্রোত বাহিয়া বাহির হইতেছে! ঐ স্রোত যখন সমস্ত জগতের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে—তখন—দূর হউক্ কালী যে ক্রমেই গড়াইতে চলিল, ষ্টীফেন সাহেবের সমস্ত কারখানাটাই দৈবাৎ যেন উল্টাইয়া পড়িয়াছে;—এবারে ব্লটিং কাগজের কথা মনে পড়িতেছে।—স্রোত ফিরানো যাক্। এস এবার গঙ্গার স্রোতে এস।

সত্য ঘটনায় ও উপন্যাসে প্রভেদ আছে, তাহার সাক্ষ্য দেখ, আমাদের জাহাজ বয়ায় ঠেকিল তবু ডুবিল না—পরম বীরত্ব সহকারে কাহাকেও উদ্ধার করিতে হইল না—প্রথম পরিচ্ছেদে জলে ডুবিয়া মরিয়া ষড়বিংশ পরিচ্ছেদে কেহ ডাঙায় বাঁচিয়া উঠিল না। না ডুবিয়া সুখী হইয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু লিখিয়া সুখ হইতেছে না। পাঠকেরা নিশ্চয়ই অত্যন্ত নিরাশ হইবেন, কিন্তু আমি যে ডুবি নাই সে আমার দোষ নয়, নিতান্তই অদৃষ্টের কারখানা। অতএব আমার প্রতি কেহ না রুষ্ট হন এই আমার প্রার্থনা।

মরিলাম না বটে কিন্তু যমরাজের মহিষের কাছ হইতে একটা রীতিমত ঢুঁ খাইয়া ফিরিলাম। সুতরাং সেই ঝাঁকানীর কথাটা স্মরণফলকে খোদিত হইয়া রহিল। খানিকক্ষণ অবাক্ ভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করা গেল—সকলেরই মুখে একভাব, সকলেই বাক্যব্যয় করা নিতান্ত বাহুল্য জ্ঞান করিলেন। বৌঠাকরুণ বৃহৎ একটা চৌকির মধ্যে কেমন একরকম হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার দুইটী ক্ষুদ্র আনুষঙ্গিক

আমার দুই পার্শ্ব জড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দাদা কিয়ৎক্ষণ ঘন ঘন গোঁফে তা' দিয়া কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না। কর্ত্তাবাবু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "সমস্তই মাঝির দোষ," মাঝি কহিল, তাহার অধীনে যে ব্যক্তি হাল ধরিয়াছিল তাহার দোষ। সে কহিল—হালের দোষ। হাল কিছু না বলিয়া অধোবদনে সটান জলে ডুবিয়া রহিল—গঙ্গা দ্বিধা হইয়া তাহার লজ্জা রক্ষা করিলেন।

এই খানেই নোঙর ফেলা হইল। যাত্রীদের উৎসাহ দেখিতে দেখিতে হ্রাস হইয়া গেল—সকাল বেলায় যেমনতর মুখের ভাব, কল্পনার এঞ্জিন-গঞ্জন গতি ও আওয়াজের উৎকর্ষ দেখা গিয়াছিল, বিকালে ঠিক তেমনটি দেখা গেল না। আমাদের উৎসাহ নোঙরের সঙ্গে সঙ্গে সাত হাত জলের নীচে নামিয়া পড়িল। একমাত্র আনন্দের বিষয় এই ছিল যে, আমাদিগকেও অতদূর নামিতে হয় নাই। কিন্তু সহসা তাহারই সম্ভাবনা সম্বন্ধে চৈতন্য জন্মিল। এ সম্বন্ধে আমরা যতই তলাইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ততই আমাদের তলাইবার নিদারুণ সম্ভাবনা মনে মনে উদয় হইতে লাগিল। এই সময় দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। বরিশালে যাইবার পথ অপেক্ষা বরিশালে না যাইবার পথ অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত এ বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে দাদা জাহাজের ছাতের উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন। একটা মোটা কাছির কুণ্ডলীর উপর বসিয়া এই ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে হাস্যকৌতুকের আলো জ্বালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম—কিন্তু বর্ষাকালের দেশলাই কাঠির মত সে গুলা ভাল করিয়া জ্বলিল না। অনেক ঘর্ষণে থাকিয়া থাকিয়া অমনি একটু একটু চমক মারিতে লাগিল। যখন সরোজিনী জাহাজ তাঁহার যাত্রীসমেত গঙ্গা-গর্ভের পঙ্কিল বিশ্রাম-শয্যায় চতুর্ব্বর্গ লাভ করিয়াছেন, তখন খবরের কাগজের Sad accident এর কোটায় একটী মাত্র প্যারাগ্রাফে চারিটী মাত্র লাইনের মধ্যে কেমন সংক্ষেপে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিব সে বিষয়ে

নানা কথা অনুমান করিতে লাগিলাম। এই সম্বাদটী এক চামচ গরম চায়ের সহিত অতি ক্ষুদ্র একটী বটিকার মত কেমন অবাধে পাঠকদের গলা দিয়া নামিয়া যাইবে, তাহা কল্পনা করা গেল। বন্ধুরা বর্ত্তমান লেখকের সম্বন্ধে বলিবেন—"আহা কত বড় মহদাশয় লোকটাই গেছেন গো,—এমন আর হইবে না!" এবং লেখকের পূজনীয়া ভ্রাতৃজায়া সম্বন্ধে বলিবেন—"আহা, দোষে গুণে জড়িত মানুষটা ছিল—যেমন তেমন হোক্ তবুত ঘরটা জুড়ে ছিল!" ইত্যাদি ইত্যাদি। জাঁতার মধ্য হইতে যেমন বিমল শুভ্র ময়দা পিষিয়া বাহির হইতে থাকে, তেমনি বৌঠাকুরাণীর চাপা ঠোঁট জোড়ার মধ্য হইতে হাসিরাশি ভাঙিয়া বাহির হইতে লাগিল।

আকাশে তারা উঠিল—দক্ষিণে বাতাস বহিতে লাগিল। খালাসীদের নমাজ পড়া শেষ হইয়া গিয়াছে। একজন ক্ষ্যাপা খালাসী তাহার তারের যন্ত্র বাজাইয়া, এক মাথা কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল নাড়াইয়া, পরম উৎসাহে গান গাহিতেছে। ছাতের উপরে বিছানায় যে-যেখানে পাইলাম শুইয়া পড়িলাম—মাঝে মাঝে এক একটী অপরিস্ফুট হাই ও সুপরিস্ফুট নাসাধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। বাক্যালাপ বন্ধ। মনে হইল যেন একটা বৃহৎ দুঃস্বপ্ন পক্ষী আমাদের উপরে নিস্তব্ধভাবে চাপিয়া আমাদের কয়জনকে কয়টা ডিমের মত তা' দিতেছে। অমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমার মনে হইতে লাগিল মধুরেণ সমাপয়েৎ। যদি এমনই হয়—কোন সুযোগে যদি একেবারে কুষ্ঠির শেষ কোঠায় আসিয়া পড়িয়া থাকি, যদি জাহাজ ঠিক বৈতরণীর পর পারের ঘাটে গিয়াই থামে—তবে বাজনা বাজাইয়া দাও—চিত্রগুপ্তের মজ্‌লিষে হাঁড়ি মুখ লইয়া যেন বেরসিকের মত দেখিতে না হই। আর, যদি সে জায়গাটা অন্ধকারই হয় তবে এখান হইতে অন্ধকার সঙ্গে-করিয়া রাণীগঞ্জে কয়লা বহিয়া লইয়া যাইবার বিড়ম্বনা কেন? তবে বাজাও! আমার ভ্রাতুষ্পুত্রটী সেতারে ঝঙ্কার দিল। ঝিনি ঝিনি ঝিন্ ঝিন্ ইমন্ কল্যাণ বাজিতে লাগিল।

তাহার পর দিন অনুসন্ধান করিয়া অবগত হওয়া গেল, জাহাজের এটা ওটা সেটা অনেক জিনিষেরই অভাব। সে গুলি না থাকিলেও জাহাজ চলে বটে কিন্তু যাত্রীদের আবশ্যক বুঝিয়া চলে না, নিজের খেয়ালেই চলে। কলিকাতা হইতে জাহাজের সরঞ্জাম আনিবার জন্য লোক পাঠাইতে হইল। এখন কিছু দিন এই খানেই স্থিতি।

গঙ্গার মাঝে মাঝে এক-এক বার না দাঁড়াইলে গঙ্গার মাধুরী তেমন উপভোগ করা যায় না। কারণ, নদীর একটী প্রধান সৌন্দর্য্য গতির সৌন্দর্য্য। চারিদিকে মধুর চঞ্চলতা, জোয়ার ভাঁটার আনাগোনা, তরঙ্গের উত্থান পতন, জলের উপর ছায়ালোকের উৎসব—গঙ্গার মাঝখানে একবার স্থির হইয়া না দাঁড়াইলে এ সব ভাল করিয়া দেখা যায় না। আর, জাহাজের হাঁস-ফাঁসানি, আগুনের তাপ, খালাসীদের গোলমাল, মায়াবদ্ধ দানবের মত দীপ্তনেত্র এঞ্জিনের গোঁ-ভরে সনিশ্বাস খাটুনি, দুই পাশে অবিশ্রাম আবর্ত্তিত দুই সহস্রবাহু চাকার সরোষ ফেন উদ্গার - এ সকল, গঙ্গার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার বলিয়া বোধ হয়। তাহা ছাড়া গঙ্গার সৌন্দর্য্য উপেক্ষা করিয়া ছুটিয়া চলা কার্য্যতৎপর অতিসভ্য ঊনবিংশ শতাব্দীকেই শোভা পায় কিন্তু রসজ্ঞের ইহা সহ্য হয় না। এ যেন আপিসে যাইবার সময় নাকে মুখে ভাত গোঁজা। অন্নের অপমান। যেন গঙ্গাযাত্রার একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ গড়িয়া তোলা। এ যেন মহাভারতের সূচিপত্র গলাধঃকরণ করা।

আমাদের জাহাজ লৌহশৃঙ্খল গলায় বাঁধিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া রহিল। স্রোতস্বিনী খর-প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে। কখন তরঙ্গসঙ্কুল, কখন শান্ত, কোথাও সঙ্কীর্ণ, কোথাও প্রশস্ত, কোথাও ভাঙন ধরিয়াছে, কোথাও চড়া পড়িয়াছে। এক এক জায়গায় কূল কিনারা দেখা যায় না। আমাদের সম্মুখে পরপার মেঘের রেখার মত দেখা যাইতেছে। চারিদিকে জেলেডিঙি ও পালতোলা নৌকা। বড় বড় জাহাজ প্রাচীন পৃথিবীর

বৃহদাকার সরীসৃপ জলজন্তুর মত ভাসিয়া চলিয়াছে। এখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। মেয়েরা গঙ্গার জলে গা ধুইতে আসিয়াছে রোদ্ পড়িয়া আসিতেছে। বাঁশবন, খেজুর বন, আম বাগান ও ঝোপঝাপের ভিতরে ভিতরে এক একটী গ্রাম দেখা যাইতেছে। ডাঙায় একটা বাছুর আড়ি করিয়া গ্রীবা ও লাঙ্গুল নানা ভঙ্গীতে আস্ফালন পূর্ব্বক একটী বড় ষ্টীমারের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে। গুটিকতক মানব-সন্তান ডাঙায় দাঁড়াইয়া হাততালি দিতেছেন; যে চর্ম্মখানি পরিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার বেশী পোষাক পরা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল। তীরের কুটীরে আলো জ্বলিল। সমস্ত দিনের জাগ্রত আলস্য সমাপ্ত করিয়া রাত্রের নিদ্রায় শরীর মন সমর্পণ করিলাম।

১২৯১

য়ুরোপ-যাত্রী।

তখন সূর্য্য অস্তপ্রায়। জাহাজের ছাদের উপর হালের কাছে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের তীরের দিকে চেয়ে রইলুম। সমুদ্রের জল সবুজ, তীরের রেখা নীলাভ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। সন্ধ্যা রাত্রির দিকে এবং জাহাজ সমুদ্রের মধ্যে ক্রমশই অগ্রসর হচ্চে। বামে বোম্বাই বন্দরের এক দীর্ঘরেখা এখনো দেখা যাচ্চে; দেখে' মনে হ'ল আমাদের পিতৃপিতামহের পুরাতন জননী সমুদ্রের বহুদূর পর্য্যন্ত ব্যাকুলবাহু বিক্ষেপ করে' ডাক্‌চেন, বল্‌চেন আসন্নরাত্রিকালে অকূল সমুদ্রে অনিশ্চিতের উদ্দেশে যাস্‌নে! এখনো ফিরে আয়!

ক্রমে বন্দর ছাড়িয়ে গেলুম। সন্ধ্যার মেঘাবৃত অন্ধকারটি সমুদ্রের অনন্ত শয্যায় দেহ বিস্তার করলে। আকাশে তারা নেই। কেবল দূরে

লাইট-হাউসের আলো জলে' উঠ্‌ল ; সমুদ্রের শিয়রের কাছে সেই কম্পিত দীপশিখা যেন ভাসমান সন্তানদের জন্যে ভূমিমাতার আশঙ্কাকুল জাগ্রত দৃষ্টি।

তখন আমার হৃদয়ের মধ্যে ঐ গানটা ধ্বনিত হতে লাগল "সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে" !

জাহাজ বোম্বাই বন্দর পার হয়ে গেল।

ভাস্‌ল তরী সন্ধেবেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা,
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।—

কিন্তু সী-সিক্‌নেসের কথা কে মনে করেছিল !

যখন সবুজ জল ক্রমে নীল হয়ে এল এবং তরঙ্গে তরীতে মিলে' গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত করে' দিলে, তখন দেখ্‌লুম সমুদ্রের পক্ষে জলখেলা বটে কিন্তু আমার পক্ষে নয়।

ভাব্‌লুম এই বেলা মানে মানে কুঠরির মধ্যে ঢুকে কম্বলটা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়িগে। যথাসম্ভব ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশ করে' কাঁধ হতে কম্বলটি একটি বিছানার উপর ফেলে' দরজা বন্ধ করে' দিলুম। ঘর অন্ধকার। বুঝ্‌লুম, আলো নিবিয়ে দিয়ে দাদা তাঁর বিছানায় শুয়েছেন। শারীরিক দুঃখ নিবেদন করে' একটুখানি স্নেহ উদ্রেক কর্‌বার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম "দাদা, ঘুমিয়েচেন কি ?" হঠাৎ নিতান্ত বিজাতীয় মোটা গলায় কে একজন হুহুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল "হূজ ছাট্ !" আমি বল্লুম "বাস্‌রে ! এ ত দাদা নয় !" তৎক্ষণাৎ বিনীত অনুতপ্তস্বরে জ্ঞাপন কর্‌লুম "ক্ষমা করবেন দৈবক্রমে ভুল কুঠরিতে প্রবেশ করেচি।" অপরিচিত কণ্ঠ বল্লে "অল্ রাইট্ !" কম্বলটি পুনশ্চ তুলে নিয়ে কাতর শরীরে সঙ্কুচিত চিত্তে বেরোতে গিয়ে দেখি দরজা খুঁজে পাইনে। বাক্স তোরঙ্গ লাঠি বিছানা প্রভৃতি বিচিত্র জিনিষের মধ্যে খট্ খট্ শব্দে হাত্‌ড়ে বেড়াতে লাগ্‌লুম। ইঁদুর কলে পড়্‌লে তার মানসিক ভাব কিরকম হয় এই

অবসরে কতকটা বুঝ্‌তে পারা যেত, কিন্তু তার সঙ্গে সমুদ্রপীড়ার সংযোগ হওয়াতে ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত জটিল হয়ে পড়েছিল।

এদিকে লোকটা কি মনে করচে! অন্ধকারে পরের ক্যাবিনে ঢুকে বেরোবার নাম নেই—খট্ খট্ শব্দে দশ মিনিট কাল জিনিষপত্র হাৎড়ে বেড়ান—এ কি কোন সদ্বংশীয় সাধুলোকের কাজ! মন যতই ব্যাকুল শরীর ততই গলদ্‌ঘর্ম্ম এবং কণ্ঠাগত অন্তরিন্দ্রিয়ের আক্ষেপ উত্তরোত্তর অবাধ্য হয়ে উঠ্‌চে। অনেক অনুসন্ধানের পর যখন হঠাৎ দ্বার উদ্‌ঘাটনের গোলকটি, সেই মসৃণ চিক্কণ শ্বেতকাচনির্ম্মিত দ্বারকর্ণটি হাতে ঠেক্‌ল, তখন মনে হল এমন প্রিয়স্পর্শসুখ বহুকাল অনুভব করা হয় নি। দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে' নিঃসংশয়চিত্তে তার পরবর্ত্তী ক্যাবিনের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত। গিয়েই দেখি, আলো জ্বলচে; কিন্তু মেজের উপর পরিত্যক্ত গাউন্ পেটিকোট্ প্রভৃতি স্ত্রীলোকের গাত্রাবরণ বিক্ষিপ্ত। আর অধিক কিছু দৃষ্টিপথে পড়বার পূর্ব্বেই পলায়ন করলুম। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে বার বার তিনবার ভ্রম করবার অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু তৃতীয়বার পরীক্ষা করতে আমার আর সাহস হল না, এবং সেরূপ শক্তিও ছিল না। অবিলম্বে জাহাজের ছাতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সেখানে বিহ্বলচিত্তে জাহাজের কাঠরার পরে ঝুঁকে পড়ে' আভ্যন্তরিক উদ্বেগ এক দফা লাঘব করা গেল। তার পরে বহুলাঞ্ছিত অপরাধীর মত আস্তে আস্তে কম্বলটি গুটিয়ে তার উপর লজ্জিত নতমস্তক স্থাপন করে' একটি কাঠের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়লুম।

কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! এ কার কম্বল! এ ত আমার নয় দেখ্‌ছি! যে সুখসুপ্ত বিশ্বস্ত ভদ্রলোকটির ঘরের মধ্যে রাত্রে প্রবেশ করে' দশমিনিটকাল অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলুম নিশ্চয় এ তারই। একবার ভাবলুম ফিরে গিয়ে চুপিচুপি তার কম্বল স্বস্থানে রেখে আমারটি নিয়ে আসি;

কিন্তু যদি তার ঘুম ভেঙে যায়! পুনর্ব্বার যদি তার ক্ষমা প্রার্থনা করবার আবশ্যক হয় তবে সে কি আর আমাকে বিশ্বাস করবে! যদি বা করে, তবু এক রাত্রের মধ্যে দু'বার ক্ষমা প্রার্থনা করলে নিদ্রাকাতর বিদেশীর খৃষ্টীয় সহিষ্ণুতার প্রতি অতিমাত্র উপদ্রব করা হবে না কি!—আরো একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হল। দৈববশতঃ দ্বিতীয়বার যে ক্যাবিনের দ্বারে দিয়ে পড়েছিলুম তৃতীয়বারও যদি ভ্রমক্রমে সেইখানে গিয়েই উপস্থিত হই এবং প্রথম ক্যাবিনের ভদ্রলোকটির কম্বলটি সেখানে রেখে সেখানকার একটি গাত্রাচ্ছাদন তুলে নিয়ে আসি তাহলে কিরকমের একটা রোমহর্ষণ প্রমাদ-প্রহেলিকা উপস্থিত হয়! আর কিছু নয়, পরদিন প্রাতে আমি কার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে যাব এবং কে আমাকে ক্ষমা করবে! প্রথম ক্যাবিনচারী হতবুদ্ধি ভদ্রলোকটিকেই বা কি বল্‌ব এবং দ্বিতীয় ক্যাবিনবাসিনী বজ্রাহতা ভদ্ররমণীকেই বা কি বোঝাব! ইত্যাকার বহুবিধ দুশ্চিন্তায় তীব্রতাম্রকূটবাসিত পরের কম্বলের উপর কাষ্ঠাসনে রাত্রি যাপন করলুম।

২৩ আগষ্ট। আমার স্বদেশীয় সঙ্গী বন্ধুটি সমস্ত রাত্রির সুখনিদ্রা-বসানে প্রাতঃকালে অত্যন্ত প্রফুল্ল পরিপুষ্ট সুস্থ মুখে ডেকের উপর দর্শন দিলেন। আমি তাঁর দুই হস্ত চেপে ধরে' বল্লুম, ভাই, আমার ত এই অবস্থা!—শুনে তিনি আমার বুদ্ধিবৃত্তির উপর কলঙ্ক আরোপণ করে' হাস্যসহকারে এমন দুটো একটা বিশেষণ প্রয়োগ করলেন যা বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর থেকে আর কখনো শোনা হয় নি। সমস্ত রজনীর দুঃখের পর প্রভাতের এই অপমানটাও নিরুত্তরে সহ্য করলুম। অবশেষে তিনি দয়াপরবশ হয়ে আমার ক্যাবিনের ভৃত্যটিকে ডেকে দিলেন। তাকেও আবার একে একে সমস্ত ঘটনাটি খুলে বল্‌তে হল। প্রথমে সে কিছুই বুঝ্‌তে পারলে না, মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সে বেচারার দোষ দেওয়া যায় না। তার জীবনের অভিজ্ঞতায় নিঃসন্দেহ এরকম

ঘটনা আর কখনো ঘটেনি, সুতরাং শোন্‌বামাত্রই ধারণা হওয়া কিছু কঠিন বটে। অবশেষে বন্ধুতে আমাতে মিলে' যখন অনেকটা পরিষ্কার করে' বোঝান গেল, তখন সে ধীরে ধীরে সমুদ্রের দিকে একবার মুখ ফেরালে এবং ঈষৎ হাস্‌লে ; তার পর চলে' গেল। কম্বলের কাহিনী অনতিবিলম্বেই সমাপ্ত হল।

কিন্তু সী-সিক্‌নেস্ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগ্‌ল। সে ব্যাধিটার যন্ত্রণা অনভিজ্ঞ স্থলচরদের কিছুতে বোঝানো যেতে পাবে না। নাড়িতে ভারত-বর্ষের অন্ন আর তিলমাত্র অবশিষ্ট রইল না। য়ুরোপে প্রবেশ কর্‌বার পূর্ব্বে সমুদ্র এই দেহ হতে ভারতবর্ষটাকে যেন ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে একে-বারে সাফ করে' ফেলবার চেষ্টা করচে। ক্যাবিনে চাব দিন পড়ে' আছি।

২৬ আগষ্ট। শনিবাব থেকে আর আজ এই মঙ্গলবাব পর্য্যন্ত কেটে গেল। জগতে ঘটনা বড় কম হয়নি—সূর্য্য চারবার উঠেছে এবং তিনবার অস্ত গেছে ; বৃহৎ পৃথিবীব অসংখ্য জীব দন্তধাবন থেকে দেশ-উদ্ধার পর্য্যন্ত বিচিত্র কর্ত্তব্যেব মধ্যে দিয়ে তিনটে দিন মহা ব্যস্তভাবে অতিবাহিত করেচে—জীবনসংগ্রাম, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, আত্মরক্ষা, বংশরক্ষা প্রভৃতি জীবরাজ্যের বড় বড় ব্যাপাব সবেগে চল্‌ছিল—কেবল আমি শয্যাগত জীবন্মৃত হ'য়ে পড়ে' ছিলুম। আধুনিক কবিবা কখনও মুহূর্ত্তকে অনন্ত কখনও অনন্তকে মুহূর্ত্ত আখ্যা দিয়ে প্রচলিত ভাষাকে নানাপ্রকাব বিপরীত ব্যায়াম-বিপাকে প্রবৃত্ত করান্। আমি আমার এই চারটে দিনকে বড় রকমের একটা মুহূর্ত্ত বল্‌ব, না এর প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে একটা যুগ বল্‌ব স্থিব করতে পারচিনে।

যাই হোক্ কষ্টের সীমা নেই। মানুষের মত এত বড় একটা উন্নত জীব যে সহসা এতটা উৎকট দুঃখ ভোগ করে তার একটা মহৎ নৈতিক কিম্বা আধ্যাত্মিক কারণ থাকাই উচিত ছিল; কিন্তু জলের উপরে কেবল খানিকটা ঢেউ ওঠার দরুণ জীবাত্মার এতাধিক পীড়া

নিতান্ত অন্যায় অসঙ্গত এবং অগৌরবজনক বলে' বোধ হয়। কিন্তু জাগতিক নিয়মের প্রতি দোষারোপ করে' কোন সুখ নেই, কারণ, সে নিন্দাবাদে কারো গায়ে কিছু ব্যথা বাজে না এবং জগৎ-রচনার তিলমাত্র সংশোধন হয় না।

যন্ত্রণাশয্যায় অচেতনপ্রায় ভাবে পড়ে' আছি। কখন কখন ডেকের উপর থেকে পিয়ানোর সঙ্গীত মৃদু মৃদু কর্ণে এসে প্রবেশ করে, তখন স্মরণ হয়, আমার এই সঙ্কীর্ণ শয়ন-কারাগারের বাইরে সংসারের নিত্য আনন্দস্রোত সমভাবে প্রবাহিত হচ্চে। বহুদূরে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমায় আমার সেই সঙ্গীতধ্বনিত স্নেহমধুর গৃহ মনে পড়ে। সুখস্বাস্থ্যসৌন্দর্য্যময় জীবজগৎকে অতিদূরবর্ত্তী ছায়ারাজ্যের মত বোধ হয়। মধ্যের এই সুদীর্ঘ মরুপথ অতিক্রম করে' কখন্ সেখানকার জীবন-উৎসবের মধ্যে ফিরে যেতে পারব, এই কথাই কেবল ভাবি। মঙ্গলবার প্রাতে যখন শরীরের মধ্যে প্রাণটা ছাড়া আর ভৌতিক পদার্থ কিছুই অবশিষ্ট ছিল না, তখন আমার বন্ধু অনেক আশ্বাস দিয়ে আমাকে জাহাজের "ডেক্" অর্থাৎ ছাদের উপর নিয়ে গেলেন। সেখানে লম্বা বেতের চৌকিটির উপর পা ছড়িয়ে বসে' পুনর্ব্বার এই মর্ত্ত্য পৃথিবীর স্পর্শ এবং নবজীবনের আস্বাদ লাভ করা গেল।

জাহাজের যাত্রীদের বর্ণনা করতে চাইনে। অতি নিকট হ'তে কোন মসীলিপ্ত লেখনীর সূচ্যগ্রভাগ যে তাদের প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য স্থাপন করতে পারে এ কথা তারা স্বপ্নেও না মনে করে' বেশ বিশ্বস্তচিত্তে ডেকের উপর বিচরণ করচে, টুংটাং শব্দে পিয়ানো বাজাচ্চে, বাজি রেখে হারজিৎ খেল্‌চে, ধূমশালায় বসে' তাস পিটচ্চে; তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তিন বাঙালী তিন লম্বা চৌকিতে জাহাজের একটি প্রান্ত সম্পূর্ণ অধিকার করে' অবশিষ্ট জনগণের প্রতি অত্যন্ত ঔদাস্যদৃষ্টিপাত করে' থাকি।

জাহাজে বন্ধুটির সঙ্গে দীর্ঘ দিন ছুজনে মুখোমুখি চৌকি টেনে বসে' পরস্পরের স্বভাব চরিত্র জীবনবৃত্তান্ত এবং সৃষ্টির যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল সত্তা সম্বন্ধে যার যা-কিছু বক্তব্য ছিল সমস্ত নিঃশেষ করে' ফেলেচি। আমার বন্ধু চুরোটের ধেঁায়া এবং বিবিধ উড্ডীয়মান কল্পনা একত্র মিশিয়ে সমস্তদিন অপূর্ব্ব ধূম্রলোক সৃজন করেচেন। সেগুলোকে যদি মস্ত একটা ফুলো রবারের থলির মধ্যে বেঁধে রাখ্‌বার কোন সুযোগ থাকৃত তা হলে সমস্ত মেদিন'কে বেলুনে চড়িয়ে একেবারে ছায়াপথের দিকে বেড়িয়ে নিয়ে আসা যেতে পারত।

একদিকে বন্ধুর যেমন কাব্যাকাশে উধাও হ'য়ে ওড়বার উদ্যম, অন্যদিকে তেম্‌নি তন্ন তন্ন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এই অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিটা অধিকাংশ সময়েই তাঁর চুরোটের পশ্চাতে ব্যাপৃত থাকে। তাঁর তামাকের থলি, সিগারেটের কাগজ এবং দেশালাইয়ের বাক্স মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হারাচ্চে, অসম্ভব স্থানে তার সন্ধান হচ্চে এবং সম্ভব স্থান থেকে তাকে পাওয়া যাচ্চে। পুরাণে পড়া যায়, ইন্দ্রের একটি প্রধান কাজ হচ্চে, যিনি যজ্ঞ করেন বিঘ্ন ঘটিয়ে তাঁর যজ্ঞনাশ করা, যিনি তপস্যা করেন অপ্সরী পাঠিয়ে তার তপস্যা ভঙ্গ করা। আমার বোধ হয় সেই পরশ্রীকাতর ইন্দ্র আমার বন্ধুর বুদ্ধিবৃত্তিকে সর্ব্বদাই বিক্ষিপ্ত করে' রাখ্‌বার অভিপ্রায়ে তাঁর কোন এক সুচতুরা কিন্নরীকে তামাকের থলিরূপে আমার বন্ধুর পকেটের মধ্যে প্রেরণ করেচেন। ছলনাপ্রিয় ললনার মত তাঁর সিগারেট মুহুর্মুহু কেবলি লুকোচ্চে এবং ধরা দিচ্চে এবং তাঁর চিত্তকে অহর্নিশি উদ্‌ভ্রান্ত করে' তুলচে। আমি তাঁকে বারম্বার সতর্ক করে' দিয়েছি যে, যদি তাঁর মুক্তির কোন ব্যাঘাত থাকে সে তাঁর চুরোট। মহর্ষি ভরত মৃত্যুকালেও হরিণ-শিশুর প্রতি চিত্তনিবেশ করেছিলেন বলে' পরজন্মে হরিণশাবক হ'য়ে জন্মগ্রহণ করলেন। আমার সর্ব্বদাই আশঙ্কা হয়, আমার বন্ধু জন্মান্তরে

ব্রহ্মদেশীয় কোন্ এক কৃষকের কুটীরের সম্মুখে মস্ত একটা তামাকের ক্ষেত হ'য়ে উদ্ভূত হবেন। বিনা প্রমাণে তিনি শাস্ত্রের এ সকল কথা বিশ্বাস করেন না, বরঞ্চ তর্ক করে' আমারও সরল বিশ্বাস নষ্ট করতে চান এবং আমাকে পর্য্যন্ত চুরুট ধরাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হ'তে পারেন নি।

২৭। ২৮ আগষ্ট। দেবাসুরগণ সমুদ্র মন্থন করে' সমুদ্রের মধ্যে যা কিছু ছিল সমস্ত বাহির করেছিলেন। সমুদ্র দেবেরও কিছু করতে পারলেন না, অসুরেরও কিছু করতে পারলেন না, হতভাগ্য দুর্ব্বল মানুষের উপর তার প্রতিশোধ তুল্‌চেন। মন্দর পর্ব্বত কোথায় জানিনে এবং শেষ নাগ তদবধি পাতালে বিশ্রাম করচেন, কিন্তু সেই সনাতন মন্থনের ঘূর্ণী-বেগ যে এখনো সমুদ্রের মধ্যে রয়ে গেছে তা' নরজঠরধারীমাত্রেই অনুভব করেন। যাঁরা করেন না তাঁরা বোধ করি দেবতা অথবা অসুরবংশীয়। আমার বন্ধুটিও শেষোক্ত দলের অর্থাৎ তিনিও করেন না।

আমি মনে মনে তা'তে ক্ষুণ্ণ হয়েছিলুম। আমি যখন বিনম্রভাবে বিছানায় পড়ে' পড়ে' অনবরত পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় বর্ণনার সত্যতা সশরীরে সপ্রমাণ করছিলুম তিনি তখন স্বচ্ছন্দে আহারামোদে নিযুক্ত ছিলেন এটা আমার চক্ষে অত্যন্ত অসাধু বলে' ঠেকেছিল। শুয়ে শুয়ে ভাবতুম এক একটা লোক আছে শাস্ত্রবাক্য ব্রহ্মবাক্যও তাদের উপর খাটে না। প্রাচীন মন্থনের সমসাময়িক কালেও যদি আমার এই বন্ধুটি সমুদ্রের কোথাও বর্ত্তমান থাক্‌তেন তাহলে লক্ষ্মী এবং চন্দ্রটির মত ইনিও দিব্য অনাময় সুস্থ শরীরে উপরে ভেসে উঠতেন, কিন্তু মন্থনকারী উভয় পক্ষের মধ্যে কার ভাগে পড়তেন আমি সে কথা বল্‌তে চাইনে।

রোগশয্যা ছেড়ে এখন "ডেকে" উঠে বসেচি, এবং শরীরের যন্ত্রণা দূর হয়ে গেছে; এখন সমুদ্র এবং আমার সঙ্গীটির সম্বন্ধে সমস্ত শাস্ত্রীয়

মত এবং অশাস্ত্রীয় মনোমালিন্য সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়েছে। এমন কি বর্ত্তমানে আমি তাঁদের কিছু অধিক পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি।

এ ক'টা দিন দিনরাত্রি কেবল ডেকেই পড়ে আছি। তিল মাত্র কাল বন্ধুবিচ্ছেদ হয় নি।

২৯ আগষ্ট। আজ রাত্রে এডেনে পৌঁছব। সেখানে কাল প্রাতে জাহাজ বদল করতে হবে। সমুদ্রের মধ্যে দুটি একটি করে' পাহাড় পর্ব্বতের রেখা দেখা যাচ্চে।

জ্যোৎস্না রাত্রি। এডেন বন্দরে এসে জাহাজ থাম্‌ল। আহারের পর রহস্যালাপে প্রবৃত্ত হবার জন্যে আমরা দুই বন্ধু ছাতের এক প্রান্তে চৌকি দুটি সংলগ্ন করে' আরামে বসে' আছি। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র এবং জ্যোৎস্নাবিমুগ্ধ পর্ব্বতবেষ্টিত তটচিত্র আমাদের আলস্য-বিজড়িত অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে স্বপ্ন-মরীচিকার মত লাগ্‌চে।

এমন সময় শোনা গেল এখনি নূতন জাহাজে চড়তে হবে। সে জাহাজ আজ রাত্রেই ছাড়বে। তাড়াতাড়ি ক্যাবিনের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক স্তূপাকার বিক্ষিপ্ত জিনিষপত্র যেমন তেমন করে' চর্ম্মপেটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তার উপরে তিন চার জনে দাঁড়িয়ে নির্দ্দয় ভাবে নৃত্য করে' বহুকষ্টে চাবি বন্ধ করা গেল। ভৃত্যদের যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়ে ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের বাক্স তোরঙ্গ বিছানাপত্র বহন করে' নৌকা-রোহণপূর্ব্বক নূতন জাহাজ "ম্যাসীলিয়া" অভিমুখে চল্লুম।

অনতিদূরে মাস্তুলকণ্টকিত ম্যাসীলিয়া তার দীপালোকিত ক্যাবিন-গুলির সুদীর্ঘশ্রেণীবদ্ধ বাতায়ন উদ্‌ঘাটিত করে' দিয়ে পৃথিবীর আদিম কালের অতি প্রকাণ্ডকায় সহস্রচক্ষু জলজন্তুর মত স্থির সমুদ্রে জ্যোৎস্নালোকে নিস্তব্ধ ভাবে ভাস্‌চে। সহসা সেখান থেকে ব্যাণ্ড বেজে উঠ্‌ল। সঙ্গীতের ধ্বনিতে এবং নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নানিশীথে মনে হ'তে লাগ্‌ল, অর্দ্ধরাত্রে এই আরবের উপকূলে আরব্য উপন্যাসের মত কি একটা মায়ার কাণ্ড ঘট্‌বে।

ম্যাসীলিয়া অষ্ট্রেলিয়া থেকে যাত্রী নিয়ে আস্‌চে। কুতূহলী নরনারীগণ ডেকের বারান্দা ধরে' সকৌতুকে নবযাত্রীসমাগম দেখ্‌চে। কিন্তু সে রাত্রে নূতনত্ব সম্বন্ধে আমাদেরই তিনজনের সব চেয়ে জিত। বহুকষ্টে জিনিষপত্র উদ্ধার করে' ডেকের উপর যখন উঠ্‌লুম মুহূর্ত্তের মধ্যে এক-জাহাজ দৃষ্টি আমাদের উপর বর্ষিত হ'ল। যদি তার কোন চিহ্ন দেবার ক্ষমতা থাকত তাহলে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ কটা কালো ও নীল ছাপে ভরে' যেত। জাহাজটি প্রকাণ্ড। তার সঙ্গীতশালা এবং ভোজন গৃহের ভিত্তি শ্বেত প্রস্তরে মণ্ডিত। বিদ্যুতের আলো এবং ব্যাণ্ডের বাদ্যে উৎসবময়।

অনেক রাত্রে জাহাজ ছেড়ে দিলে।

৩০ আগষ্ট। আমাদের এ জাহাজে ডেকের উপরে আর একটি দোতলা ডেকের মত আছে। সেটি ছোট এবং অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। সেইখানেই আমরা আশ্রয় গ্রহণ করলুম।

আমার বন্ধুটি নীরব এবং অন্যমনস্ক। আমিও তদ্রূপ। দূর সমুদ্র-তীরের পাহাড়গুলো রৌদ্রে ক্লান্ত এবং ঝাপ্‌সা দেখাচ্চে, একটা মধ্যাহ্ন-তন্দ্রার ছায়া পড়ে' যেন অস্পষ্ট হয়ে এসেচে।

খানিকটা ভাব্‌চি, খানিকটা লিখ্‌চি, খানিকটা ছেলেদের খেলা দেখ্‌চি। এ জাহাজে অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আছে; আজকের দিনে যেটুকু চাঞ্চল্য সে কেবল তাদেরই মধ্যে। জুতো মোজা খুলে' ফেলে' তারা আমাদের ডেকের উপর কমলালেবু গড়িয়ে খেলা করচে—তাদের তিনটি পরিচারিকা বেঞ্চির উপরে বসে' নতমুখে নিস্তব্ধভাবে শেলাই করে' যাচ্চে, এবং মাঝে মাঝে কটাক্ষপাতে যাত্রীদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করচে।

বহুদূরে একআধটা জাহাজ দেখা যাচ্চে। যেতে যেতে মাঝে মাঝে সমুদ্রে এক একটা পাহাড় জেগে উঠ্‌চে, অনুর্ব্বর কঠিন কালো দগ্ধ তপ্ত জনশূন্য। অন্যমনস্ক প্রহরীর মত সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারা

উদাসীনভাবে তাকিয়ে আছে, সাম্‌নে দিয়ে কে আসচে কে যাচ্চে তার প্রতি কিছুমাত্র খেয়াল নেই।

এইরকম করে' ক্রমে সূর্য্যাস্তের সময় হল। "কাস্‌ল্‌ অফ্‌ ইণ্ডোলেন্স্‌" অর্থাৎ আলস্যের আলয়, কুঁড়েমির কেল্লা যদি কাকেও বলা যায় সে হচ্চে জাহাজ। বিশেষতঃ গরম দিনে, প্রশান্ত লোহিতসাগরের উপরে। অস্থির ইংরাজতনয়রাও সমস্ত বেলা ডেকের উপর আরাম-কেদারায় পড়ে' ভ্রূর উপরে টুপি টেনে দিয়ে দিবা-স্বপ্নে তলিয়ে রয়েচে। চল্‌বার মধ্যে কেবল জাহাজ চল্‌চে এবং তার দুই পাশের আহত নীল জল নাড়া পেয়ে অলস আপত্তির ক্ষীণ কলস্বরে পাশ কাটিয়ে কোন মতে একটুখানি মাত্র সরে' যাচ্চে।

সূর্য্য অস্ত গেল। আকাশ এবং জলের উপর চমৎকার রং রেখা দিয়েচে। সমুদ্রের জলে একটি রেখা মাত্র নেই। দিগন্তবিস্তৃত অটুট্‌ জলরাশি যৌবন-পরিপূর্ণ পরিস্ফুট দেহের মত একেবারে নিটোল এবং সুডোল। এই অপার অখণ্ড পরিপূর্ণতা আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত থম্‌থম্‌ করচে। বৃহৎ সমুদ্র হঠাৎ যেন এমন একটা জায়গায় এসে থেমেচে যার ঊর্দ্ধে আর গতি নেই, পরিবর্ত্তন নেই; যা' অনন্তকাল অবিশ্রাম চাঞ্চল্যের পরম পরিণতি, চরম নির্ব্বাণ। সূর্য্যাস্তের সময় চিল আকাশের নীলিমার যে একটি সর্ব্বোচ্চ সীমার কাছে গিয়ে সমস্ত বৃহৎ পাখা সমতলরেখায় বিস্তৃত করে' দিয়ে হঠাৎ গতি বন্ধ করে' দেয়, চিরচঞ্চল সমুদ্র ঠিক যেন সহসা সেইরকম একটা পরম প্রশান্তির শেষ সীমায় এসে ক্ষণেকের জন্যে পশ্চিম অস্তাচলের দিকে মুখ তুলে' একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েচে। জলের যে চমৎকার বর্ণবিকাশ হয়েচে সে আকাশের ছায়া কি সমুদ্রের আলো ঠিক বলা যায় না। যেন একটা মাহেন্দ্রক্ষণে আকাশের নীরব নির্নিমেষ নীল নেত্রের দৃষ্টিপাতে হঠাৎ সমুদ্রের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে থেকে একটা আকস্মিক প্রতিভার দীপ্তি স্ফূর্ত্তি পেয়ে তাকে অপূর্ব্ব মহিমান্বিত করে' তুলেচে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। ঢং ঢং ঢং ঢং ঘণ্টা বেজে গেল। সকলে বেশভূষা পরিবর্ত্তন করে' সান্ধ্যভোজনের জন্যে সুসজ্জিত হতে গেল। আধঘণ্টা পরে আবার ঘণ্টা বাজ্‌ল। নরনারীগণ দলে দলে ভোজনশালায় প্রবেশ করলে। আমরা তিন বাঙালী একটি স্বতন্ত্র ছোট টেবিল অধিকার করে' বস্‌লুম। আমাদের সাম্‌নে আর একটি টেবিলে দুটি মেয়ে একটি উপাসক-সম্প্রদায়ের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে খেতে বসেচেন।

চেয়ে দেখ্‌লুম তাঁদের মধ্যে একটি যুবতী আপনার যৌবনশ্রী বহুল পরিমাণে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে সহাস্য মুখে আহার এবং আলাপে নিযুক্ত আছেন। তাঁর শুভ্র সুগোল সুচিক্কণ গ্রীবাবক্ষবাহুর উপর সমস্ত বিদ্যুৎ-প্রদীপের অনিমেষ আলো এবং পুরুষমণ্ডলীর বিস্মিত সকৌতুক দৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল। একটা অনাবৃত আলোক-শিখা দেখে' দৃষ্টিগুলো যেন কালো কালো পতঙ্গের মত চারিদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে লম্ফ দিয়ে পড়ছে। এমন কি অনেকে মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে তাঁকে নিরীক্ষণ করছে এবং তাই নিয়ে ঘরের সর্ব্বত্র একটা হাস্যকৌতুকের তরঙ্গ উঠেছে। অনেকেই সেই যুবতীর পরিচ্ছদটিকে "ইণ্ডেকোরাস্" বলে' উল্লেখ করচে। কিন্তু আমাদের মত বিদেশী লোকের পক্ষে তার বেআব্রু বেআদবীটা বোঝা একটু শক্ত। কারণ, নৃত্যশালায় এ রকম কিম্বা এর চেয়ে অনাবৃত বেশে গেলে কারো বিস্ময় উদ্রেক করে না।

কিন্তু বিদেশের সমাজনীতি সম্বন্ধে বেশি উৎসাহের সঙ্গে কিছু বলা ভাল নয়। আমাদের দেশে দেখা যায় বাসরঘরে এবং কোন কোন বিশেষ উপলক্ষে মেয়েরা যেমন অবাধে লজ্জাহীনতা প্রকাশ করে অন্য কোন সভায় তেমন করলে সাধারণের কাছে দূষ্য হত সন্দেহ নেই।

৩১ আগষ্ট। আজ রবিবার। প্রাতঃকালে উঠে' উপরের ডেকে চৌকিতে বসে' সমুদ্রের বায়ু সেবন করচি, এমন সময় নীচের ডেকে খৃষ্টানদের উপাসনা আরম্ভ হল। যদিও জানি এদের মধ্যে অনেকেই

শুষ্কভাবে অভ্যস্ত মন্ত্র আউড়ে কলটেপা আর্গিনের মত গান গেয়ে যাচ্ছিল—কিন্তু তবু এই যে দৃশ্য—এই যে গুটিকতক চঞ্চল ছোট ছোট মনুষ্য অপার সমুদ্রের মাঝখানে স্থির বিনম্রভাবে দাঁড়িয়ে গম্ভীর সমবেত কণ্ঠে এক চির-অজ্ঞাত অনন্ত রহস্যের প্রতি ক্ষুদ্র মানবহৃদয়ের ভক্তি উপহার প্রেরণ করচে, এ অতি আশ্চর্য্য।

কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ এক একবার অট্টহাস্য শোনা যাচ্চে। গত-রাত্রের সেই ডিনার-টেবিলের নায়িকাটি উপাসনায় যোগ না দিয়ে উপরের ডেকে বসে' তাঁরি একটি উপাসক যুবকের সঙ্গে কৌতুকালাপে নিমগ্ন আছেন। মাঝে মাঝে উচ্চ হাস্য করে' উঠ্‌চেন, আবার মাঝে মাঝে গুন্‌গুন্ স্বরে ধর্ম্মসঙ্গীতেও যোগ দিচ্চেন। আমার মনে হ'ল সরল ভক্তমণ্ডলীর মাঝখানে সয়তান পেটিকোট পরে' এসে মানবের উপাসনাকে পরিহাস করচে।

১ সেপ্টেম্বর। সন্ধ্যার পর আহারান্তে উপরের ডেকে আমাদের যথাস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল। মৃদু শীতল বায়ুতে আমার বন্ধু ঘুমিয়ে পড়েচেন এবং দাদা অলসভাবে ধূমসেবন করচেন, এমন সময়ে নীচের ডেকে নাচের বাজনা বেজে উঠল। সকলে মিলে' জুড়ি জুড়ি ঘূর্ণনৃত্য আরম্ভ হল।

তখন পূর্ব্বদিকে নব কৃষ্ণপক্ষের পূর্ণপ্রায় চন্দ্র ধীরে ধীরে উদয় হচ্চে। এই তীররেখাশূন্য জলময় মহামরুর পূর্ব্বসীমান্তে চন্দ্রের পাণ্ডুর কিরণ পড়ে' একটা অনাদি অনন্ত বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে' উঠেছে। চাঁদের উদয়পথের ঠিক নীচে থেকে আমাদের জাহাজ পর্য্যন্ত অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে প্রশস্ত দীর্ঘ আলোকপথ ঝিক্‌ঝিক্ করচে। জ্যোৎস্নাময়ী সন্ধ্যা কোন এক অলৌকিক বৃন্তের উপরে অপূর্ব্ব শুভ্র রজনীগন্ধার মত আপন প্রশান্ত সৌন্দর্য্যে নিঃশব্দে চতুর্দ্দিকে প্রস্ফুটিত হয়ে' উঠ্‌ছে। আর মানুষগুলো পরস্পরকে জড়াজড়ি করে' ধরে' পাগলের মত তীব্র আমোদে

ঘুরপাক্ খাচ্চে, হাঁপাচ্চে, উত্তপ্ত হয়ে' উঠ্চে, সর্ব্বাঙ্গের রক্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে' মাথার মধ্যে ঘুরচে, বিশ্বজগৎ আদি সৃষ্টিকালের বাষ্পচক্রের মত চারিদিকে প্রবল বেগে আবর্ত্তিত হচ্চে। লোকলোকান্তরের নক্ষত্র স্থিরভাবে চেয়ে রয়েচে এবং দূরদূরান্তরের তরঙ্গ ম্লান চন্দ্রালোকে গম্ভীর সমস্বরে অনন্তকালের পুরাতন সামগাথা গান করচে।

৩ সেপ্টেম্বর। বেলা দশটার সময় সুয়েজখালের প্রবেশমুখে এসে জাহাজ থাম্‌ল। চারিদিকে চমৎকার রঙের খেলা। পাহাড়ের উপর রৌদ্র, ছায়া এবং নীল বাষ্প। ঘননীল সমুদ্রের প্রান্তে বালুকাতীরের রৌদ্রদুঃসহ গাঢ় পীত রেখা।

খালের মধ্যে দিয়ে জাহাজ সমস্ত দিন অতি ধীরগতিতে চল্‌চে। দু'ধারে তরুহীন বালি। কেবল মাঝে মাঝে এক একটি ছোট ছোট কোটাঘর বহুযত্নবর্দ্ধিত গুটিকতক গাছে- পালায় বেষ্টিত হয়ে বড় আরামজনক দেখাচ্চে।

অনেক রাতে আধখানা চাঁদ উঠ্‌ল। ক্ষীণ চন্দ্রালোকে দুই তীর অস্পষ্ট ধূধ্ করচে।—রাত দুটো তিনটের সময় জাহাজ পোর্টসৈয়েদে নোঙর করলে।

৪ সেপ্টেম্বর। এখন আমরা ভূমধ্যসাগরে, য়ুরোপের অধিকারের মধ্যে। বাতাসও শীতল হয়ে' এসেচে, সমুদ্রও গাঢ়তর নীল। আজ রাত্রে আর ডেকের উপর শোওয়া হল না।

৬ সেপ্টেম্বর। খাবার ঘরে খোলা জান্‌লার কাছে বসে' বাড়ীতে চিঠি লিখ্‌ছি। একবার মুখ তুলে বামে চেয়ে দেখ্‌লুম "আয়োনিয়ান্" দ্বীপ দেখা দিয়েচে। পাহাড়ের কোলের মধ্যে সমুদ্রের ঠিক ধারেই মনুষ্যরচিত ঘনসন্নিবিষ্ট একটি শ্বেত মৌচাকের মত দেখা যাচ্চে। এইটি হচ্চে জান্তিসহর (Zanthe)। দূরথেকে মনে হচ্চে যেন পর্ব্বতটা তার প্রকাণ্ড করপুটে কতকগুলো' শ্বেত পুষ্প নিয়ে সমুদ্রকে অঞ্জলি দেবার উপক্রম করচে।

ডেকের উপর উঠে' দেখি আমরা দুই শৈলশ্রেণীর মাঝখান দিয়ে সঙ্কীর্ণ সমুদ্রপথে চলেছি। আকাশে মেঘ করে' এসেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, ঝড়ের সম্ভাবনা। আমাদের সর্ব্বোচ্চ ডেকের চাঁদোয়া খুলে ফেলে দিলে। পর্ব্বতের উপর অত্যন্ত নিবিড় মেঘ নেমে এসেছে; কেবল দূরে একটিমাত্র পাহাড়ের উপর মেঘছিদ্রমুক্ত সন্ধ্যালোকের একটি দীর্ঘ রক্তবর্ণ ইঙ্গিত-অঙ্গুলি এসে স্পর্শ করেছে, অন্য সবগুলো আসন্ন ঝটিকার ছায়ায় আচ্ছন্ন। কিন্তু ঝড় এল না। একটু প্রবল বাতাস এবং সবেগ বৃষ্টির উপর দিয়েই সমস্ত কেটে গেল। ভূমধ্যসাগরে আকাশের অবস্থা অত্যন্ত অনিশ্চিত। শুন্‌লুম, আমরা যে পথ দিয়ে যাচ্চি এখান দিয়ে জাহাজ সচরাচর যায় না। জায়গাটা নাকি ভারি ঝোড়ো।

রাত্রে ডিনারের পর যাত্রীরা কাপ্তেনের স্বাস্থ্যপান এবং গুণগান করলে। কাল ব্রিন্দিসি পৌঁছব। জিনিষপত্র বাঁধ্‌তে হবে।

৭ সেপ্টেম্বর। আজ সকালে ব্রিন্দিসি পৌঁছন গেল। মেলগাড়ি প্রস্তুত ছিল, আমরা গাড়িতে উঠ্‌লুম।

গাড়ি যখন ছাড়্‌ল তখন টিপ্‌টিপ্‌ করে' বৃষ্টি আরম্ভ হয়েচে। আহার করে' এসে একটি কোণে জান্‌লার কাছে বসা গেল।

প্রথমে, দুইধারে কেবল আঙুরের ক্ষেত। তার পরে জলপাইয়ের বাগান। জলপাইয়ের গাছগুলো নিতান্ত বাঁকাচোরা, গ্রন্থি ও ফাটল-বিশিষ্ট, বলি-অঙ্কিত, বেঁটেখাটো রকমের; পাতাগুলো ঊর্দ্ধমুখ; প্রকৃতির হাতের কাজে যেমন একটি সহজ অনায়াসের ভাব দেখা যায়, এই গাছ-গুলোয় তার বিপরীত। এরা নিতান্ত দরিদ্র লক্ষ্মীছাড়া, বহু কষ্ট বহু চেষ্টায় কায়ক্লেশে অষ্টাবক্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; এক একটা এমন বেঁকে ঝুঁকে পড়েছে যে পাথর উঁচু করে' তাদের ঠেকো দিয়ে রাখ্‌তে হয়েচে।

বামে চষা মাঠ; শাদা শাদা ভাঙা ভাঙা পাথরের টুক্‌রো চষা মাটির মধ্যে মধ্যে উৎক্ষিপ্ত। দক্ষিণে সমুদ্র। সমুদ্রের একেবারে ধারেই এক একটি

ছোট ছোট সহর দেখা দিচ্চে। চর্চ্চচূড়া-মুকুটিত শাদা ধব্‌ধবে নগরীটি একটি পরিপাটি তন্বী নাগরীর মত কোলের কাছে সমুদ্র-দর্পণ রেখে নিজের মুখ দেখে হাস্‌চে। নগর পেরিয়ে আবার মাঠ। ভুট্টার ক্ষেত, আঙুরের ক্ষেত, ফলের ক্ষেত জলপাইয়ের বন; ক্ষেতগুলি খণ্ড প্রস্তরের বেড়া দেওয়া। মাঝে মাঝে এক একটি বাঁধা কূপ। দূরে দূরে ছুটো একটা সঙ্গীহীন ছোট শাদা বাড়ি।

সূর্য্যাস্তের সময় হয়ে এল। আমি কোলের উপর এক থোলো আঙুর নিয়ে বসে' বসে' এক আধটা করে' মুখে দিচ্চি। এমন মিষ্ট টস্‌টসে, সুগন্ধ আঙুর ইতিপূর্ব্বে কখন খাইনি। মাথায় রঙীন্ রুমাল বাঁধা ঐ ইতালীয়া যুবতীকে দেখে আমার মনে হচ্চে, ইতালীয়ানীরা এখানকার আঙুরের গুচ্ছের মত, অম্‌নি একটি বৃন্তভরা অজস্র সুডোল সৌন্দর্য্য, যৌবনরসে অম্‌নি উৎপূর্ণ,—এবং ঐ আঙুরেরই মত তাদের মুখের রং—অতি বেশি শাদা নয়।

এখন একটা উচ্চ সমুদ্রতটের উপর দিয়ে চলেচি। আমাদের ঠিক নীচেই ডানদিকে সমুদ্র। ভাঙাচোরা জমি ঢালু হয়ে জলের মধ্যে প্রবেশ করেচে। গোটা চার পাঁচ পালমোড়া নৌকা ডাঙার উপর তোলা। নীচেকার পথ দিয়ে গাধার উপর চড়ে' লোক চলেচে। সমুদ্রতীরে কতকগুলো গরু চরচে—কি খাচ্চে তারাই জানে;—মাঝে মাঝে কেবল কতকগুলো শুক্‌নো খড়কের মত আছে মাত্র।

৮ সেপ্টেম্বর। কাল আড্রিয়াটিকের সমতল শ্রীহীন তীরভূমি দিয়ে আস্‌ছিলুম আজ শস্যশ্যামলা লম্বার্ডির মধ্যে দিয়ে গাড়ি চল্‌চে। চারিদিকে আঙুর, জলপাই, ভুট্টা ও তুঁতের ক্ষেত। কাল যে আঙুরের লতা দেখা গিয়েছিল সে গুলো ছোটো ছোটো গুল্মের মত। আজ দেখ্‌চি, ক্ষেতময় লম্বা লম্বা কাঠি পোঁতা, তারি উপর ফলগুচ্ছপূর্ণ দ্রাক্ষালতা লতিয়ে উঠেচে।

ক্রমে পাহাড় দেখা দিচ্চে। পাহাড়ের উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত দ্রাক্ষাদণ্ডে কণ্টকিত হয়ে উঠেচে, তারি মাঝখানে এক একটি লোকালয়।

রেলের লাইনের ধারে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র কুটীর; এক হাতে তারি একটি দুয়ার ধরে' এক হাত কোমরে দিয়ে একটি ইতালিয়ান যুবতী সকৌতুক কৃষ্ণনেত্রে আমাদের গাড়ীর গতি নিরীক্ষণ করচে। অনতিদূরে একটি ছোট বালিকা একটা প্রখরশৃঙ্গ প্রকাণ্ড গরুর গলার দড়িটি ধরে' নিশ্চিন্ত মনে চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে। তার থেকে আমাদের বাঙ্গালা দেশের নব দম্পতির চিত্র মনে পড়ল। মস্ত একটা চষমা-পরা দাড়িওয়ালা গ্র্যাজুয়েট্‌পুঙ্গব, এবং তারি দড়িটি ধরে' ছোট একটি বারো-তেরো বৎসরের নোলকপরা নববধূ; জন্তুটি দিব্যি পোষ মেনে চরে বেড়াচ্চে, এবং মাঝে মাঝে বিস্ফারিত নয়নে কর্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করচে।

ট্যুরিন্ ষ্টেশনে আসা গেল। এদেশের সামান্য পুলিষম্যানের সাজ দেখে অবাক্ হতে হয়। মস্ত চূড়াওয়ালা টুপি, বিস্তর জরিজরাও, লম্বা তলোয়ার,—সকল ক'টিকেই সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র বলে' মনে হয়।

দক্ষিণে বামে তুষাররেখাঙ্কিত সুনীল পর্ব্বতশ্রেণী দেখা দিয়েচে। বামে ঘনচ্ছায়া স্নিগ্ধ অরণ্য। যেখানে অরণ্যের একটু বিচ্ছেদ পাওয়া যাচ্চে সেইখানেই শস্যক্ষেত্র তরুশ্রেণীও পর্ব্বত সমেত এক একটা নব নব আশ্চর্য্য দৃশ্য খুলে যাচ্চে। পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর পুরাতন দুর্গশিখর, তল-দেশে এক একটি ছোট ছোট গ্রাম। যত এগোচ্চি অরণ্যপর্ব্বত ক্রমশঃ ঘন হয়ে আস্‌চে। মাঝে মাঝে যে গ্রামগুলি আস্‌চে সেগুলি তেমন উদ্ধত শুভ্র নবীন পরিপাটি নয়; একটু যেন ম্লান দরিদ্র নিভৃত; একটি আধ্‌টি চর্চ্চের চূড়া আছে মাত্র; কিন্তু কল কারখানার ধূমোদ্গারী বৃংহিতধ্বনিত ঊর্দ্ধমুখী ইষ্টকশুণ্ড নেই।

ক্রমে অল্পে অল্পে পাহাড়ের উপরে ওঠা যাচ্চে। পার্ব্বত্যপথ সাপের

মত এঁকে বেঁকে চলেচে; ঢালু পাহাড়ের উপর চষা ক্ষেত সোপানের মত থাকে থাকে উঠেচে। একটি গিরিনদী স্বচ্ছ সফেন জলরাশি নিয়ে সঙ্কীর্ণ উপলপথ দিয়ে ঝরে' পড়চে।

গাড়িতে আলো দিয়ে গেল। এখনি মণ্ট্ সেনিসের বিখ্যাত দীর্ঘ রেলোয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। গহ্বরটি উত্তীর্ণ হতে প্রায় আধঘণ্টা লাগ্‌ল।

এইবার ফ্রান্স। দক্ষিণে এক জলস্রোত ফেনিয়ে ফেনিয়ে চলেচে। ফরাসী জাতির মত দ্রুত চঞ্চল উচ্ছ্বসিত হাস্যপ্রিয় কলভাষী।

ফ্রান্সের প্রবেশদ্বারে একবার একজন কর্ম্মচারী গাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করে' গেল আমাদের মাশুল দেবার যোগ্য জিনিষ কিছু আছে কি না—আমরা বল্লুম, না। আমাদের একজন বৃদ্ধ সহযাত্রী ইংরেজ বল্লেন, I don't parlez-vous francais.

সেই স্রোত এখনো আমাদের ডান দিক দিয়ে চলেচে। তার পূর্ব্ব-তীরে "ফার্" অরণ্য নিয়ে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। চঞ্চলা নির্ঝরিণী বেঁকে চুরে ফেনিয়ে ফুলে নেচে কলরব করে' পাথরগুলোকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ঠেলে রেলগাড়ীর সঙ্গে সমান দৌড়বার চেষ্টা করচে। মাঝে মাঝে এক একটা লোহার সাঁকো মুষ্টি দিয়ে তার ক্ষীণ কটিদেশ পরিমাপ করবার চেষ্টা করচে। এক জায়গায় জলরাশি খুব সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেচে; দুই তীরের শ্রেণীবদ্ধ দীর্ঘ বৃক্ষগুলি শাখায় শাখায় বেষ্টন করে' দুরন্ত স্রোতকে অন্তঃপুরে বন্দী করতে বৃথা চেষ্টা করচে। উপর থেকে ঝরণা এসে সেই প্রবাহের সঙ্গে মিশ্‌চে। বরাবর পূর্ব্বতীর দিয়ে একটি পার্ব্বত্য পথ সমরেখায় স্রোতের সঙ্গে বেঁকে বেঁকে চলে গেছে। এক জায়গায় আমা-দের সহচরীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হল। হঠাৎ সে দক্ষিণ থেকে বামে এসে এক অজ্ঞাত সঙ্কীর্ণ শৈলপথে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে এক একটা পাহাড় তৃণহীন সহস্র

রেখাঙ্কিত পাষাণ-কঙ্কাল প্রকাশ করে' নগ্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে; কেবল তার মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় খানিকটা করে' অরণ্যের খণ্ড আবরণ রয়েচে। প্রচণ্ড সংগ্রামে একটা দৈত্য সহস্র হিংস্র নখের বিদারণরেখা রেখে যেন ওর শ্যামল ত্বক্ অনেকখানি করে' আঁচ্‌ড়ে ছিঁড়ে নিয়েচে।

আবার হঠাৎ ডান দিকে আমাদের সেই পূর্ব্বসঙ্গিনী মুহূর্ত্তের জন্যে দেখা দিয়ে বামে চলে গেল। একবার দক্ষিণে একবার বামে, একবার অন্তরালে। বিচিত্র কৌতুকচাতুরী। আবার হয় ত যেতে যেতে কোন্ এক পর্ব্বতের আড়াল থেকে সহসা কলহাস্যে করতালি দিয়ে আচম্‌কা দেখা দেবে।

সেই জলপাই এবং দ্রাক্ষাকুঞ্জ অনেক কমে' গেছে। বিবিধ শস্যের ক্ষেত্র এবং দীর্ঘ সরল পপ্লার গাছের শ্রেণী। ভুট্টা, তামাক, নানাবিধ শাক শব্‌জি। মনে হয় কেবলি বাগানের পর বাগান আস্‌চে। এই কঠিন পর্ব্বতের মধ্যে মানুষ বহুদিন থেকে বহু যত্নে প্রকৃতিকে বশ করে' তার উচ্ছৃঙ্খলতা হরণ করেচে। প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের উপর মানুষের কত প্রয়াস প্রকাশ পাচ্চে। এদেশের লোকেরা যে আপনার দেশকে ভাল-বাস্‌বে তাতে আর কিছু আশ্চর্য্য নেই। এরা আপনার দেশকে আপনার যত্নে আপনার করে' নিয়েচে। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বহুকাল থেকে একটা বোঝাপড়া হয়ে আস্‌চে, উভয়ের মধ্যে ক্রমিক আদান প্রদান চল্‌চে, তারা পরস্পর সুপরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। একদিকে প্রকাণ্ড প্রকৃতি উদাসীন ভাবে দাঁড়িয়ে আর একদিকে বৈরাগ্য-বৃদ্ধ মানব উদাসীন ভাবে শুয়ে—য়ুরোপের সে ভাব নয়। এদের এই সুন্দরী ভূমি এদের একান্ত সাধনার ধন, একে এরা নিয়ত বহু আদর করে' রেখেচে। এর জন্যে যদি প্রাণ না দেবে ত কিসের জন্যে দেবে! এই প্রেয়সীর প্রতি কেউ তিলমাত্র হস্তক্ষেপ কর্‌লে কি আর সহ্য হয়?

কিন্তু এ কি চমৎকার চিত্র! পর্ব্বতের কোলে, নদীর ধারে, হ্রদের

তীরে পপ্লার-উইলোবেষ্টিত কাননশ্রেণী। নিষ্কণ্টক নিরাপদ নিরাময় ফলশস্যপরিপূর্ণ প্রকৃতি প্রতিক্ষণে মানুষের ভালবাসা পাচ্চে এবং মানুষকে দ্বিগুণ ভালবাস্‌চে। মানুষের মত জীবের এইত যোগ্য আবাসস্থান। মানুষের প্রেম এবং মানুষের ক্ষমতা যদি আপনার চতুর্দ্দিককে সংযত সুন্দর সমুজ্জ্বল করে' না তুল্‌তে পারে তবে তরুকোটর-গুহাগহ্বর-বনবাসী জন্তুর সঙ্গে তার প্রভেদ কি ?

৮ সেপ্টেম্বর। পথের মধ্যে আমাদের প্যারিসে নাব্‌বার প্রস্তাব হচ্চে। রাত দু'টোর সময় আমাদের জাগিয়ে দিলে। ট্রেন বদল করতে হবে। জিনিষপত্র বেঁধে বেরিয়ে পড়লুম। বিষম ঠাণ্ডা। অনতিদূরে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে। কেবলমাত্র একটি এঞ্জিন্, একটি ফাষ্টক্লাস্ এবং একটি রেক্‌ভ্যান্। আরোহীর মধ্যে আমরা তিনটি ভারতবর্ষীয়। রাত তিনটের সময় প্যারিসের জনশূন্য বৃহৎ ষ্টেশনে পৌঁছন গেল। সুপ্তোত্থিত দুই একজন "মাসির" আলো হস্তে উপস্থিত। অনেক হাঙ্গাম করে' নিদ্রিত কাষ্টম্ হৌস্‌কে জাগিয়ে তার পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করলুম। তখন প্যারিস্ তার সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে' স্তব্ধ রাজপথে দীপশ্রেণী জ্বালিয়ে রেখে নিদ্রামগ্ন। আমরা হোটেল ট্যার্মিনুতে আমাদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করলুম। পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন, বিদ্যুদুজ্জ্বল, স্ফটিকমণ্ডিত, কার্পেটাবৃত, চিত্রিতভিত্তি, নীলযবনিকাপ্রচ্ছন্ন শয়নশালা ; বিহগপক্ষসুকোমল শুভ্র শয্যা।

বেশ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক শয়নের উদ্যোগ করবার সময় দেখা গেল আমাদের জিনিষপত্রের মধ্যে আর এক জনের ওভারকোট্ গাত্রবস্ত্র। আমরা তিনজনেই পরস্পরের জিনিষ চিনিনে ; সুতরাং হাতের কাছে যে-কোন অপরিচিত বস্তু পাওয়া যায় সেইটেই আমাদের কারো-না কারো স্থির করে' অসংশয়ে সংগ্রহ করে' আনি। অবশেষে নিজের নিজের জিনিষ পৃথক্ পৃথক্ করে' নেবার পর যখন দুটো চারটে উদ্বৃত্ত সামগ্রী পাওয়া

যায়, তখন তা' আর পূর্ব্বাধিকারীকে ফিরিয়ে দেবার কোন সুযোগ থাকে না। ওভারকোট্‌টি রেলগাড়ি থেকে আনা হয়েচে; যার কোট্‌ সে বেচারা বিশ্বস্তচিত্তে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। গাড়ি এতক্ষণে সমুদ্রতীরস্থ ক্যালে নগরীর নিকটবর্ত্তী হয়েচে। লোকটি কে, এবং সমস্ত বৃটিশ রাজ্যের মধ্যে তার ঠিকানা কোথায়, আমরা কিছুই জানিনে। মাঝের থেকে তার লম্বা কুর্ত্তি এবং আমাদের পাপের ভার স্কন্ধের উপর বহন করে বেড়াচ্চি—প্রায়শ্চিত্তের পথ বন্ধ। মনে হচ্চে, একবার যে লোকটির কম্বল হরণ করেছিলুম এ কুর্ত্তিটিও তার। কারণ, রেলগাড়িতে সে ঠিক আমাদের পরবর্ত্তী শয্যা অধিকার করেছিল। সে বেচারা বৃদ্ধ, শীতপীড়িত, বাতে পঙ্গু, অ্যাংলো-ইণ্ডিয় পুলিস অধ্যক্ষ। পুলিসের কাজ করে' মানব চরিত্রের প্রতি সহজেই তার বিশ্বাস শিথিল হয়ে এসেচে, তার পরে যখন দেখ্‌বে এক যাত্রায় একই রকম ঘটনা একই লোকের দ্বারা গভীর রাত্রে দুইদুইবার সংঘটন হল তখন আর যাই হোক্‌ কখনই আমাকে সে ব্যক্তি সুশীল সচ্চরিত্র বলে ঠাওরাবে না। বিশেষতঃ কাল প্রত্যূষে ব্রিটিশ্‌ চ্যানেল্‌ পার হবার সময় তীব্র শীতবায়ু যখন তার হৃতকুর্ত্তি জীর্ণ দেহকে কম্পান্বিত করে' তুলবে তখন সেই সঙ্গে মনুষ্যজাতির সাধুতার প্রতি তার বিশ্বাস চতুর্গুণ কম্পিত হতে থাক্‌বে।

প্রাতঃকালে আমরা তিন জনে প্যারিসের পথে পদব্রজে বেরিয়ে পড়লুম। প্রকাণ্ড রাজপথ দোকান বাগান প্রাসাদ প্রস্তরমূর্ত্তি ফোয়ারা লোকজন গাড়িঘোড়ার মধ্যে অনেক ঘুরে ঘুরে এক ভোজন-গৃহের বিরাট স্ফটিকশালার প্রান্তটেবিলে বসে' অল্প আহার করে' এবং বিস্তর মূল্য দিয়ে ঈফেল্‌ স্তম্ভ দেখ্‌তে গেলেম। এই লৌহস্তম্ভ চারি পায়ের উপরে ভর দিয়ে এক কাননের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। কলের দোলায় চড়ে এই স্তম্ভের চতুর্থ তলায় উঠে নিয়ে সমস্ত প্যারিসটাকে খুব একটা বড় ম্যাপের মত প্রসারিত দেখ্‌তে পেলুম।

বলা বাহুল্য, এমন করে' একদিনে তাড়াতাড়ি চক্ষু দ্বারা বহির্ভাগ লেহন করে' প্যারিসের রসাস্বাদন করা যায় না। এ যেন, ধনীগৃহের মেয়েদের মত বন্ধ পাল্কির মধ্যে থেকে গঙ্গাস্নান করার মত—কেবল নিতান্ত তীরের কাছে একটা অংশে একডুবে যতখানি পাওয়া যায়। কেবল হাঁপানিই সার।

১০ সেপ্টেম্বর। লণ্ডন অভিমুখে চল্লুম। সন্ধ্যার সময় লণ্ডনে পৌঁছে দুই একটা হোটেল অন্বেষণ করে' দেখা গেল স্থানাভাব। অবশেষে একটি ভদ্র পরিবারের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল।

১১ সেপ্টেম্বর। সকালবেলায় আমাদের পুরাতন বন্ধুদের সন্ধানে বাহির হওয়া গেল।

প্রথমে, লণ্ডনের মধ্যে আমার একটি পূর্ব্বপরিচিত বাড়িব দ্বারে গিয়ে আঘাত করা গেল। যে দাসী এসে দরজা খুলে দিলে তাকে চিনিনে। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম আমাব বন্ধু বাড়িতে আছেন কি না। সে বল্লে তিনি এ বাড়িতে থাকেন না। জিজ্ঞাসা কবলুম, কোথায় থাকেন? সে বল্লে, আমি জানিনে, আপনারা ঘরে এসে বসুন আমি জিজ্ঞাসা করে আসচি। পূর্ব্বে যে ঘরে আমরা আহার করতুম সেই ঘরে গিয়ে দেখ্‌লুম সমস্ত বদল হয়ে গেছে—সেখানে টেবিলের উপর খবরের'কাগজ এবং বই—সে ঘর এখন অতিথিদেব প্রতীক্ষাশালা হয়েছে। খানিকক্ষণবাদে দাসী একটা কার্ডে লেখা ঠিকানা এনে দিলে। আমার বন্ধু এখন লণ্ডনের বাইরে কোন্ এক অপরিচিত স্থানে থাকেন। নিরাশ হৃদয়ে আমার সেই পরিচিত বাড়ি থেকে বেরলুম।

মনে কল্পনা উদয় হল, মৃত্যুর বহুকাল পরে আবার যেন পৃথিবীতে ফিরে এসেচি। আমাদের সেই বাড়ির দরজার কাছে এসে দ্বারীকে জিজ্ঞাসা করলুম— সেই অমুক এখানে আছে ত? দ্বারী ... কোন করলে—না—সে অনেক দিন হল চলে গেছে।—চলে গেছে? ...খর দিকে

চলে গেছে! আমি মনে করেছিলুম কেবল আমিই চলে গিয়েছিলুম, পৃথিবী-সুদ্ধ আর সবাই আছে। আমি চলে যাওয়ার পরেও সকলেই আপন আপন সময় অনুসারে চলে গেছে। তবে ত সেই সমস্ত জানা লোকেরা আর কেহ কারো ঠিকানা খুঁজে পাবে না! জগতের কোথাও তাদের আর নির্দ্দিষ্ট মিলনের জায়গা রইল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌চি এমন সময়ে বাড়ির কর্ত্তা বেরিয়ে এলেন—জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কে হে! আমি নমস্কার করে' বল্লুম, আজ্ঞে, আমি কেউ না, আমি বিদেশী।—কেমন করে' প্রমাণ করব এ বাড়ি আমার এবং আমাদের ছিল! একবার ইচ্ছে হল, অন্তঃপুরের সেই বাগানটা দেখে আসি; আমার সেই গাছগুলো কত বড় হয়েছে। আর সেই ছাতের উপরকার দক্ষিণমুখো কুঠরি, আর সেই ঘর এবং সেই ঘর এবং সেই আর একটা ঘর। আর সেই যে ঘরের সম্মুখে বারাণ্ডার উপর ভাঙা টবে গোটাকতক জীর্ণ গাছ ছিল—সেগুলো এত অকিঞ্চিৎকর যে হয়ত ঠিক তেমনি রয়ে গেছে, তাদের সরিয়ে ফেল্‌তে কারো মনে পড়েনি!

আর বেশিক্ষণ কল্পনা করবার সময় পেলুম না। লণ্ডনের সুরঙ্গপথে যে পাতাল-বাষ্পযান চলে, তাই অবলম্বন করে' বাসায় ফেরবার চেষ্টা করা গেল। কিন্তু পরিণামে দেখ্‌তে পেলুম পৃথিবীতে সকল চেষ্টা সফল হয় না। আমরা দুই ভাই ত গাড়িতে চড়ে' বেশ নিশ্চিন্ত বসে আছি; এমন সময় গাড়ি যখন হ্যামার্‌স্মিথ্‌ নামক দূরবর্ত্তী ষ্টেশনে গিয়ে থাম্‌ল তখন আমাদের বিশ্বস্ত চিত্তে ঈষৎ সংশয়ের সঞ্চার হল। একজনকে জিজ্ঞাসা করাতে সে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে আমাদের গম্যস্থান যেদিকে এ গাড়ির গম্যস্থান সেদিকে নয়। পুনর্ব্বার তিনচার ষ্টেশন ফিরে গিয়ে গাড়ি বদল করা আবশ্যক। তাই করা গেল। শেষে গম্য ষ্টেশনে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে আমাদের বাসা খুঁজে পাই ম্য বিস্তর গবেষণার পর বেলা সাড়ে তিনটের সময় বাড়ি ফিরে ঠাণ্ডা

টিফিন খাওয়া গেল। এইটুকু আত্মজ্ঞান জন্মেছে যে, আমরা দুটি ভাই লিভিংষ্টোন অথবা ষ্টান্‌লির মত ভৌগোলিক আবিষ্কারক নই ; পৃথিবীতে যদি অক্ষয় খ্যাতি উপার্জ্জন করতে চাই ত নিশ্চয়ই অন্য কোন দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

১২ সেপ্টেম্বর। আমাদের বন্ধুর একটি গুণ আছে তিনি যতই কল্পনার চর্চ্চা করুন না কেন, কখনও পথ ভোলেন না। সুতরাং তাঁকেই আমাদের লণ্ডনের পাণ্ডাপদে বরণ করেছি। আমরা যেখানে যাই তাঁকে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাই, এবং তিনি যেখানে যান আমরা কিছুতেই তাঁর সঙ্গ ছাড়িনে। কিন্তু একটা আশঙ্কা আছে এ রকম অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব এ পৃথিবীতে সকল সময় সমাদৃত হয় না। হায়! এ সংসারে কুসুমে কণ্টক, কলানাথে কলঙ্ক এবং বন্ধুত্বে বিচ্ছেদ আছে—কিন্তু, ভাগ্যিস্ আছে!

আজ বন্ধুসহায় হয়ে নিশ্চিন্তমনে সহর ঘোরা গেল। ন্যাশনাল্ গ্যালারিতে ছবি দেখ্‌তে গেলুম। বড় ভয়ে ভয়ে দেখ্‌লুম। কোন ছবি পুরোপুরি ভাল লাগতে দিতে দ্বিধা উপস্থিত হয়। সন্দেহ হয়, কোন প্রকৃত সমজ্‌দারের এ ছবি ভাল লাগা উচিত কি না। আবার যে ছবি ভাল লাগে না তার সম্বন্ধেও মুখ ফুটে কোন কথা বলতে পারিনে।

১৯ সেপ্টেম্বর। এখানে রাস্তায় বেরিয়ে সুখ আছে। সুন্দর মুখ চোখে পড়বেই। শ্রীযুক্ত দেশানুরাগ যদি পারেন ত আমাকে ক্ষমা করবেন, ইংরাজ মেয়ে সুন্দরী বটে। শুভানুধ্যায়িরা শঙ্কিত এবং চিন্তিত হবেন, এবং প্রিয় বয়স্যেরা পরিহাস করবেন কিন্তু এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে সুন্দর মুখ আমার সুন্দর লাগে। তাই যদি না লাগ্‌ত বিধাতার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হত। সুন্দর হওয়া এবং মিষ্ট করে' হাসা মানুষের একটি পরমাশ্চর্য্য ক্ষমতা। আমার ভাগ্যক্রমে ঐ হাসিটা এদেশে এসে কিছু বাহুল্য পরিমাণে দেখ্‌তে পাই। এমন অনেক সময় হয়, রাজপথে কোন নীলনয়না পান্থরমণীর যেমন সম্মুখবর্ত্তী হই অম্‌নি সে আমার মুখের দিকে

চেয়ে আর হা্সি সম্বরণ করতে পারে না। তখন তাকে ডেকে বলে' দিতে ইচ্ছা করে, "সুন্দরি, আমি হাসি ভালবাসি বটে, কিন্তু এতটা নয়। তা ছাড়া বিম্বাধরের উপর হাসি যতই সুমিষ্ট হোক্ না কেন, তারো একটা যুক্তি-সঙ্গত কারণ থাকা চাই; কারণ, মানুষ কেবলমাত্র যে সুন্দর তা নয়, মানুষ বুদ্ধিমান জীব। হে নীলাঞ্জনয়নে, আমি ত ইংরাজের মত অসভ্য খাটো কুর্ত্তি এবং অসঙ্গত লম্বা ধুচুনি টুপি পরিনে, তবে হাস কি দেখে'? আমি সুশ্রী কি কুশ্রী সে বিষয়ে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা রুচিবিরুদ্ধ -- কিন্তু এটা আমি খুব জোর করে বল্‌তে পারি বিদ্রূপের তুলি দিয়ে বিধাতা-পুরুষ আমার মুখমণ্ডল অঙ্কিত করেন নি। তবে যদি রংটা কালো এবং চুলগুলো কিছু লম্বা দেখে' হাসি পায় তাহলে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, প্রকৃতিভেদে হাস্যরসসম্বন্ধে অদ্ভুত রুচিভেদ লক্ষিত হয়। তোমরা যাকে "হিউমার্" বল, আমার মতে কালো রঙের সঙ্গে তার কোন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নেই। দেখেছি বটে, তোমাদের দেশে মুখে কালী মেখে কাফ্রি সেজে নৃত্যগীত করা একটা কৌতুকের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু, কনক-কেশিনি, সেটা আমার কাছে নিতান্ত হৃদয়হীন বর্ব্বরতা বলে' বোধ হয়।"

৬ অক্টোবর। এখনো আমাদের প্রবাসের সময় উত্তীর্ণ হয় নি, কিন্তু আমি আর এখানে পেরে উঠচিনে। বল্‌তে লজ্জা বোধ হয়, আমার এখানে ভাল লাগচে না। সেটা গর্ব্বের বিষয় নয়, লজ্জার বিষয়—সেটা আমার স্বভাবের ত্রুটি।

যখন কৈফিয়ৎ সন্ধান করি তখন মনে হয় যে, য়ুরোপের যে ভাবটা আমাদের মনে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে, সেটা সেখানকার সাহিত্য পড়ে'। অতএব সেটা হচ্চে 'আইডিয়াল্' য়ুরোপ। অন্তরের মধ্যে প্রবেশ না করলে সেটা প্রত্যক্ষ করবার যো নেই। তিন মাস, ছ'মাস কিম্বা ছ'বৎসর এখানে থেকে আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার কেবল হাতপা নাড়া দেখ্‌তে

পাত্র মাত্র। বড় বড় বাড়ি, বড় বড় কারখানা, নানা আমোদের জায়গা; লোক চলচে ফিরছে, যাচ্চে আস্‌চে, খুব একটা সমারোহ। সে যতই বিচিত্র যতই আশ্চর্য্য হোক্ না কেন, তাতে দর্শককে শ্রান্তি দেয়; কেবলমাত্র বিস্ময়ের আনন্দ চিত্তকে পরিপূর্ণ করতে পারে না বরং তাতে মনকে সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত করতে থাকে।

অবশেষে এই কথা মনে আসে—আচ্ছা ভালরে বাপু, আমি মেনে নিচ্চি তুমি মস্ত সহর, মস্ত দেশ, তোমার ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই। আর অধিক প্রমাণের আবশ্যক নেই। এখন আমি বাড়ি যেতে পারলে বাচি। সেখানে আমি সকলকে চিনি, সকলকে বুঝি; সেখানে সমস্ত বাহ্যাবরণ ভেদ করে' মনুষ্যত্বের আস্বাদ সহজে পাই। সহজে উপভোগ করতে পারি, সহজে চিন্তা কর্‌তে পারি, সহজে ভালবাস্‌তে পারি। যেখানে আসল মানুষটি আছে সেখানে যদি অবাধে যেতে পারতুম, তাহলে এখানকে আর প্রবাস বলে' মনে হত না।

এইখানে কথামালার একটা গল্প মনে পড়চে।

একটা চতুর শৃগাল একদিন সুবিজ্ঞ বককে আহারে নিমন্ত্রণ করেছিল। বক সভায় গিয়ে দেখে বড় বড় থালা সুমিষ্ট লেহ্য পদার্থে পরিপূর্ণ। প্রথম শিষ্ট সম্ভাষণের পর শৃগাল বল্‌লে "ভাই, এস, আরম্ভ করে' দেওয়া যাক্!" বলেই তৎক্ষণাৎ অবলীলাক্রমে লেহন করতে প্রবৃত্ত হল। বক তার দীর্ঘ চঞ্চু নিয়ে থালার মধ্যে যতই ঠোকর মারে মুখে কিছুই তুলতে পারে না। অবশেষে চেষ্টায় নিবৃত্ত হয়ে স্বাভাবিক অটল গাম্ভীর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক সরোবরকূলের ধ্যানে নিমগ্ন হল। শৃগাল বোধ করি মাঝে মাঝে কটাক্ষপাত করে' বলছিল "ভাই খাচ্চ না যে! এ কেবল তোমাকে মিথ্যা কষ্ট দেওয়াই হল। তোমার যোগ্য আয়োজন হয় নি!" বক বোধ করি মাথা নেড়ে উত্তর দিয়েছিল "আহা সে কি কথা! রন্ধন অতি পরিপাটি হয়েছে! কিন্তু শরীরগতিকে আজ আমার কেমন ক্ষুধা

বোধ হচ্চে না!" পরদিন বকের নিমন্ত্রণে শৃগাল গিয়া দেখেন, লম্বা ভাঁড়ের মধ্যে বিবিধ উপাদেয় সামগ্রী সাজানো রয়েছে। দেখে' লোভ হয় কিন্তু তার মধ্যে শৃগালের মুখ প্রবেশ করে না। বক অনতিবিলম্বে চঞ্চুচালনা করে' ভোজনে প্রবৃত্ত হল। শৃগাল বাহিরের থেকে পাত্রলেহন এবং দুটো একটা উৎক্ষিপ্ত খাদ্যখণ্ডের স্বাদগ্রহণ করে' নিতান্ত ক্ষুধাতুর ভাবে বাড়ি ফিরে গেল।

জাতীয় ভোজে বিদেশীর অবস্থা সেই রকম। খাদ্যটা উভয়ের পক্ষে সমান উপাদেয় কিন্তু পাত্রটা তফাৎ। ইংরাজ যদি শৃগাল হয় তবে তার সুবিস্তৃত শুভ্র রজত থালের উপর উদ্ঘাটিত পায়সান্ন কেবল চক্ষে দর্শন করেই আমাদের ক্ষুধিতভাবে চলে' আস্‌তে হয়, আর আমরা যদি তপস্বী বক হই, তবে আমাদের সুগভীর পাথরের পাত্রটার মধ্যে কি আছে শৃগাল তা ভাল করে' চক্ষেও দেখ্‌তে পায় না—দূর থেকে ঈষৎ ঘ্রাণ নিয়েই তাকে ফিরতে হয়।

প্রত্যেক জাতির অতীত ইতিহাস এবং বাহ্যিক আচার ব্যবহার তার নিজের পক্ষে সুবিধা কিন্তু অন্য জাতির পক্ষে বাধা। এই জন্য ইংরাজ সমাজ যদিও বাহ্যতঃ সাধারণসমক্ষে উদ্ঘাটিত কিন্তু আমরা চঞ্চুর অগ্রভাগটুকুতে তার দুই চার ফোঁটার স্বাদ পাই মাত্র, ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারিনে। সর্ব্বজাতীয় ভোজ কেবল সাহিত্য-ক্ষেত্রেই সম্ভব। সেখানে, যার লম্বা চঞ্চু সেও বঞ্চিত হয় না, যার লোল জিহ্বা সেও পরিতৃপ্ত হয়।

কারণটা সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হোক্ বা না হোক্, এখানকার লোকের সঙ্গে হৌ-ডু-য়ু-ডু বলে', হাঁ করে' রাস্তায় ঘাটে পর্য্যটন করে', থিয়েটার দেখে', দোকান ঘুরে', কল-কারখানার তথ্য নির্ণয় করে'—এমন কি সুন্দর মুখ দেখে' আমার শ্রান্তি বোধ হয়েচে।

অতএব স্থির করেছি এখন বাড়ি ফিরব।—

৭ অক্টোবর। "টেমস্" জাহাজে একটা ক্যাবিন্ স্থির করে' আসা গেল। পর্শু জাহাজ ছাড়বে।

৯ অক্টোবর। জাহাজে ওঠা গেল। এবারে আমি একা। আমার সঙ্গীরা বিলাতে রয়ে গেলেন। আমার নির্দ্দিষ্ট ক্যাবিনে গিয়ে দেখি সেখানে এক কক্ষে চার জনের থাকবার স্থান; এবং আর এক জনের জিনিষপত্র একটি কোণে রাশীকৃত হয়ে আছে। বাক্স তোরঙ্গের উপর নামের সংলগ্নে লেখা আছে "বেঙ্গল সিভিল্ সার্ভিস্।" বলা বাহুল্য, এই লিখন দেখে' ভাবী সঙ্গসুখের কল্পনায় আমার মনে অপরিমেয় নিবিড়ানন্দের সঞ্চার হয় নি। ভাব্‌লুম, কোথাকার এক ভারতবর্ষের রোদে ঝল্‌সা এবং শুক্‌নো খট্‌খটে হাড়-পাকা অত্যন্ত ঝাঁঝালো ঝুনো অ্যাংলোইণ্ডিয়ানের সঙ্গে আমাকে এক জাহাজে পুরেচে! যাদের মধ্যে শত হস্ত ব্যবধান যথেষ্ট নয় এইটুকু ক্যাবিনের মধ্যে তাদের দুজনের স্থান সংকুলান্ হবে কি করে'? গালে হাত দিয়ে বসে' এই কথা ভাবচি এমন সময়ে এক অল্প বয়স্ক সুশ্রী আইরিশ যুবক ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাকে সহাস্য মুখে শুভ প্রভাত অভিবাদন করলেন—মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার সমস্ত আশঙ্কা দূর হয়ে গেল। সবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইনি ভারতবর্ষে যাত্রা করচেন। এঁর শরীরে ইংলণ্ডবাসী ইংরাজের স্বাভাবিক সহৃদয় ভদ্রতার ভাব এখনো সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রয়েচে।

১০ অক্টোবর। সুন্দর প্রাতঃকাল। সমুদ্র স্থির। আকাশ পরিষ্কার। সূর্য্য উঠেচে। ভোরের বেলা কুয়াশার মধ্যে দিয়া আমাদের ডান দিক থেকে অল্প অল্প তীরের চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। অল্পে অল্পে কুয়াশার যবনিকা উঠে গিয়ে ওয়াইট্ দ্বীপের পার্ব্বত্য তীর এবং ভেণ্ট্‌নর সহর ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়ল।

এ জাহাজে বড় ভিড়। নিরিবিলি কোণে চৌকি টেনে যে একটু লিখ্‌ব তার জো নেই, সুতরাং সম্মুখে যা-কিছু চোখে পড়ে তাই চেয়ে চেয়ে দেখি।

ইংরাজ মেয়ের চোখ নিয়ে আমাদের দেশের লোক প্রায়ই ঠাট্টা করে, বিড়ালের চোখের সঙ্গে তার তুলনা করে' থাকে। কিন্তু, এমন সর্ব্বদাই দেখা যায়, তারাই যখন আবার বিলাতে আসে তখন স্বদেশের হরিণ-নয়নের কথাটা আর তাদের বড় মনে থাকে না। অভ্যাসের বাধাটা একবার অতিক্রম করতে পারলেই এক সময়ে যাকে পরিহাস করা গিয়েচে আর এক সময় তার কাছেই পরাভব মানা নিতান্ত অসম্ভব নয় - ওটা স্পষ্ট স্বীকার করাই ভাল। যতক্ষণ দূরে আছি কোন বালাই নেই, কিন্তু লক্ষ্যপথে প্রবেশ করলেই ইংরাজ সুন্দরীর দৃষ্টি আমাদের অভ্যাসের আবরণ বিদ্ধ করে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে। ইংরাজ সুনয়নার চোখ মেঘমুক্ত নীলাকাশের মত পরিষ্কার, হীরকের মত উজ্জ্বল এবং ঘন পল্লবে আচ্ছন্ন, তাতে আবেশের ছায়া নেই। অন্য কারো সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইনে, কিন্তু একটি মুগ্ধহৃদয়ের কথা বলতে পারি, সে নীলনেত্রের কাছেও অভিভূত এবং হরিণনয়নকেও কিছুতেই উপেক্ষা কর্‌তে পারে না। কৃষ্ণ কেশপাশও সে মূঢ়ের পক্ষে বন্ধন এবং কনককুন্তলও সামান্য দৃঢ় নয়।

সঙ্গীত সম্বন্ধেও দেখা যায়, পূর্ব্বে যে ইংরাজী সঙ্গীতকে পরিহাস করে' আনন্দ লাভ করা গেছে, এখন তৎপ্রতি মনোযোগ করে' ততোধিক বেশি আনন্দ লাভ করা যায়। এখন অভ্যাসক্রমে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের এতটুকু আস্বাদ পাওয়া গেছে যার থেকে নিদেন এইটুকু বোঝা গেছে যে যদি চর্চ্চা করা যায় তা হলে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের মধ্যে থেকে পরিপূর্ণ রস পাওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশী সঙ্গীত যে আমার ভাল লাগে সে কথার বিশেষ উল্লেখ করা বাহুল্য। অথচ দুয়ের মধ্যে যে সম্পূর্ণ জাতিভেদ আছে তার আর সন্দেহ নেই।

আজ অনেক রাত্রে নিরালায় একলা দাঁড়িয়ে জাহাজের কাঠ্‌রা ধরে' সমুদ্রের দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে গুন্ গুন্ করে একটা দিশি

রাগিণী ধরেছিলুম। তখন দেখ্‌তে পেলুম অনেক দিন ইংরাজী গান গেয়ে গেয়ে মনের ভিতরটা যেন শ্রান্ত এবং অতৃপ্ত হয়ে ছিল। হঠাৎ এই বাংলা সুরটা পিপাসার জলের মত বোধ হল। সেই সুরটি সমুদ্রের উপর অন্ধকারের মধ্যে যে রকম প্রসারিত হল, এমন আর কোন সুর কোথাও পাওয়া যায় বলে' আমার মনে হয় না। আমার কাছে ইংরাজি গানের সঙ্গে আমাদের গানের এই প্রধান প্রভেদ ঠেকে যে, ইংরাজি সঙ্গীত লোকালয়ের সঙ্গীত, আর আমাদের সঙ্গীত প্রকাণ্ড নির্জ্জন প্রকৃতির অনির্দ্দিষ্ট অনির্ব্বচনীয় বিষাদের সঙ্গীত। কানাড়া টোড়ি প্রভৃতি বড় বড় রাগিণীর মধ্যে যে গভীরতা এবং কাতরতা আছে সে যেন কোন ব্যক্তিবিশেষের নয়—সে যেন অকূল অসীমের প্রান্তবর্ত্তী এই সঙ্গীহীন বিশ্বজগতের।

১৭ অক্টোবর। বিকালের দিকে জাহাজ মল্টা দ্বীপে পৌছল। কঠিন দুর্গপ্রাকারে বেষ্টিত অট্টালিকাখচিত তরুগুল্মহীন সহর। এই শ্যামল পৃথিবীর একটা অংশ যেন ব্যাধি হয়ে কঠিন হয়ে গেছে। দূর থেকে দেখে' নাব্‌তে ইচ্ছে করে না। অবশেষে আমার নববন্ধুর অনুরোধে তাঁর সঙ্গে একত্রে নেবে পড়া গেল। সমুদ্রতীরে থেকে সুড়ঙ্গপথের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ঘাটের মত উঠেছে, তারি সোপান বেয়ে সহরের মধ্যে উঠ্‌লুম। অনেকগুলি গাইড্‌পাণ্ডা আমাদের ছেঁকে ধরলে। আমার বন্ধু বহুকষ্টে তাদের তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু একজন কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়লে না। বন্ধু তাকে বারবার ঝেঁকে ঝেঁকে গিয়ে বল্লেন—"চাইনে তোমাকে"—"একটি পয়সাও দেব না"—তবু সে সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে লেগে ছিল। তার পরে যখন তাকে নিতান্তই তাড়িয়ে দিলে তখন সে ম্লানমুখে চলে' গেল। আমার তাকে কিছু দেবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সঙ্গে স্বর্ণমুদ্রা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বন্ধু বল্লেন লোকটা গরীব সন্দেহ নেই কিন্তু কোন ইংরাজ হলে এমন করত

না!—আসলে মানুষ পরিচিত দোষ গুরুতর হলেও মার্জ্জনা করতে পারে কিন্তু সামান্য অপরিচিত দোষ সহ্য করতে পারে না। এই জন্যে এক জাতীয়ের পক্ষে আর এক জাতীয়কে বিচার করা কঠিন।

‘মল্টা’ সহরটা দেখে’ মনে হয় একটা অপরিণত বিকৃত য়ুরোপীয় সহর। পাথরে বাঁধানো সরু রাস্তা একবার উপরে উঠ্‌চে একবার নীচে নাম্‌চে। সমস্তই দুর্গন্ধ ঘেঁষাঘেঁষি অপরিষ্কার। রাত্রে হোটেলে গিয়ে খেলুম। অনেক দাম দেওয়া গেল, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য অতি কদর্য্য। আহারান্তে, সহরের মধ্যে একটি বাঁধানো চক্‌ আছে, সেইখানে ব্যাণ্ড্‌ বাদ্য শুনে রাত দশটার সময় জাহাজে ফিরে’ আসা গেল। ফেরবার সময় নৌকাওয়ালা আমাদের কাছ থেকে ন্যায্য ভাড়ার চেয়ে কিছু বেশি আদায়ের চেষ্টায় ছিল। আমার বন্ধু এদের অসৎ ব্যবহারে বিষম রাগান্বিত। তাতে আমার মনে পড়ল এবারে লণ্ডনে প্রথম যেদিন আমরা দুই ভাই গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলুম গাড়োয়ান পাঁচ শিলিং ভাড়ার জায়গায় আমাদের কাছে বারো শিলিং ঠকিয়ে নিয়েছিল।

১৯ অক্টোবর। আজ সকালে জাহাজ যখন ব্রিন্দিশি পৌঁছল তখন ঘোর বৃষ্টি। এই বৃষ্টিতে একদল গাইয়ে বাজিয়ে হার্প্‌ বেয়ালা ম্যাণ্ডোলীন্‌ নিয়ে ছাতা মাথায় জাহাজের সম্মুখে বন্দরের পথে দাঁড়িয়ে গান বাজনা জুড়ে’ দিলে।

বৃষ্টি থেমে গেলে বন্ধুর সঙ্গে ব্রিন্দিশিতে বেরোন গেল। সহর ছাড়িয়ে একটা খোলা জায়গায় গিয়ে পৌঁছলুম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পাহাড়ে’ রাস্তা শুকিয়ে গেছে, কেবল দুইধারে নালায় মাঝে মাঝে জল দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার ধারে গাছে চড়ে’ দুটো খালি-পা ইটালিয়ান্‌ ছোক্‌রা ফিগ্‌ পেড়ে খাচ্ছিল; আমাদের ডেকে ইসারায় জিজ্ঞাসা করলে তোমরা খাবে কি—আমরা বল্লুম, না। খানিক বাদে দেখি তারা ফলবিশিষ্ট একটা ছিন্ন অলিভ্‌শাখা নিয়ে এসে উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করলে, অলিভ্‌

পারে ? আমরা অসম্মত হলুম। তার পরে ইসারায় তামাক প্রার্থনা করে' বন্ধুর কাছ থেকে কিঞ্চিৎ তামাক আদায় করলে। তামাক খেতে খেতে দুজনে বরাবর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল। আমরা পরস্পরের ভাষা জানিনে—আমাদের উভয় পক্ষে প্রবল অঙ্গভঙ্গিদ্বারা ভাব প্রকাশ চল্‌তে লাগ্‌ল। জনশূন্য রাস্তা ক্রমশঃ উচ্চ হয়ে শস্যক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে বরাবর চলে' গিয়েছে। কেবল মাঝে মাঝে এক একটা ছোট বাড়ি, জান্‌লার কাছে ফিগ্‌ফল শুকোতে দিয়েছে। এক এক জায়গায় ছোট ছোট শাখাপথ বক্রগতিতে একপাশ দিয়ে নেমে নীচে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ফেরবার মুখে একটা গোরস্থানে ঢোকা গেল। এখানকার গোর নূতন রকমের দেখ্‌লুম। অধিকাংশ গোরের উপরে এক-একটি ছোট ঘর গেঁথেছে। সেই ঘর পর্দ্দা দিয়ে ছবি দিয়ে রঙীন্ জিনিষ দিয়ে নানা রকমে সাজানো, যেন মৃত্যুর একটা খেলাঘর—এর মধ্যে কেমন একটি ছেলে-মানুষী আছে—মৃত্যুটাকে যেন যথেষ্ট খাতির করা হচ্চে না।

গোরস্থানের একজায়গায় সিঁড়ি দিয়ে একটা মাটির নীচেকার ঘরে নাবা গেল। সেখানে সহস্র সহস্র মড়ার মাথা অতি সুশৃঙ্খল ভাবে স্তূপাকারে সাজানো। তৈমুরলঙ্গ বিশ্ববিজয় করে' একদিন এইরকম একটা উৎকট কৌতুকদৃশ্য দেখেছিলেন। আমার সঙ্গে সঙ্গেই নিশিদিন যে একটা কঙ্কাল চলে' বেড়াচ্চে ঐ মুণ্ডগুলো দেখে তার আকৃতিটা মনে উদয় হল। জীবন এবং সৌন্দর্য্য এই অসীম জীবলোকের উপর একটা চিত্রিত পর্দ্দা ফেলে রেখেছে—কোন নিষ্ঠুর দেবতা যদি হঠাৎ একদিন সেই লাবণ্যময় চর্ম্মযবনিকা সমস্ত নরসংসার থেকে উঠিয়ে ফেলে, তাহলে অকস্মাৎ দেখ্‌তে পাওয়া যায় আরক্ত অধরপল্লবের অন্তরালে গোপনে বসে' বসে' শুষ্ক শ্বেত দন্তপংক্তি সমস্ত পৃথিবী জুড়ে' বিকট বিদ্রূপের হাস্য করছে। পুরোণো বিষয়! পুরোণো কথা! ঐ নরকপাল অবলম্বন করে' নীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা অনেক বিভীষিকা প্রচার করেচেন—কিন্তু অনেক-

ক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখে' আমার কিছুই ভয় হল না! শুধু এই মনে হল, সীতাকুণ্ডের বিদীর্ণ জলবিম্ব থেকে যেমন খানিকটা তপ্ত বাষ্প বেরিয়ে যায়, তেমনি পৃথিবীর কত যুগের কত দুশ্চিন্তা, দুরাশা, অনিদ্রা ও শিরঃপীড়া ঐ মাথার খুলিগুলোর—ঐ গোলাকার অস্থিবুদ্‌বুদ্‌গুলোর মধ্যে থেকে অব্যাহতি পেয়েছে! এবং সেই সঙ্গে এও মনে হল, পৃথিবীতে অনেক ডাক্তার অনেক টাকের ওষুধ আবিষ্কার করে' চীৎকার করে' মরচে, কিন্তু ঐ লক্ষ লক্ষ কেশহীন মস্তক তৎপ্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, এবং দন্ত-মার্জ্জনওয়ালারা যতই প্রচুর বিজ্ঞাপন প্রচার করচে এই অসংখ্য দন্তশ্রেণী তার কোন খোঁজ নিচ্চেনা।

যাই হোক্, আপাততঃ আমার এই কপালফলকটার মধ্যে বাড়ির চিঠির প্রত্যাশা সঞ্চরণ করচে। যদি পাওয়া যায় তা হলে এই খুলিটার মধ্যে খানিকটা খুসির উদয় হবে, আর যদি না পাই তা হলে এই অস্থি-কোটরের মধ্যে দুঃখ নামক একটা ব্যাপারের উদ্ভব হবে—ঠিক মনে হবে আমি কষ্ট পাচ্চি।

২৩ অক্টোবর। সুয়েজ খালের মধ্যে দিয়ে চলেছি। জাহাজ অতি মন্থর গতিতে চলেচে।

উজ্জ্বল উত্তপ্ত দিন। একরকম মধুর আলস্যে পূর্ণ হয়ে আছি। য়ুরোপের ভাব একেবারে দূর হয়ে গেছে। আমাদের সেই রৌদ্রতপ্ত শ্রান্ত দরিদ্র ভারতবর্ষ, আমাদের সেই ধরাপ্রান্তবর্ত্তী পৃথিবীর অপরিচিত নিভৃত নদীকলধ্বনিত ছায়াসুপ্ত বাংলা দেশ, আমার সেই অকর্ম্মণ্য গৃহপ্রিয় বাল্যকাল, কল্পনাক্লিষ্ট যৌবন, নিশ্চেষ্ট নিরুদ্যম চিন্তাপ্রিয় জীবনের স্মৃতি এই সূর্য্যকিরণে, এই তপ্ত বায়ুহিল্লোলে সুদূর মরীচিকার মত আমার দৃষ্টির সম্মুখে জেগে উঠ্‌ছে।

ডেকের উপরে' গল্পের বই পড়ছিলুম। মাঝে একবার উঠে' দেখলুম, দু'ধারে ধূসরবর্ণ বালুকাতীর—জলের ধারে ধারে একটু একটু বনঝাউ

এবং অর্দ্ধশুষ্ক তৃণ উঠেছে। আমাদের ডানদিকের বালুকা-রাশির মধ্যে দিয়ে একদল আরব শ্রেণীবদ্ধ উট্ বোঝাই করে' নিয়ে চলেচে। প্রখর সূর্য্যালোক এবং ধূসর মরুভূমির মধ্যে তাদের নীল কাপড় এবং সাদা পাগ্ড়ি দেখা যাচ্চে। কেউ বা এক জায়গায় বালুকাগহ্বরের ছায়ায় পা ছড়িয়ে অলস ভাবে শুয়ে আছে—কেউ বা নমাজ পড়চে, কেউ বা নাসারজ্জু ধরে' অনিচ্ছুক উট্‌কে টানাটানি করচে। সমস্তটা মিলে খররৌদ্র আরব-মরুভূমির একখণ্ড ছবির মত মনে হল।

২৪ অক্টোবর। আমাদের জাহাজের মিসেস্—কে দেখে একটা নাট্যশালার ভগ্নাবশেষ বলে' মনে হয়। সেখানে অভিনয়ও বন্ধ, বাসের পক্ষেও সুবিধা নয়। রমণীটি খুব তীক্ষ্ণধার—যৌবনকালে বোধ করি অনেকের উপর অনেক খরতর শর চালনা করেছে। যদিও এখনো নাকে মুখে কথা কয় এবং অচিরজাত বিড়ালশাবকের মত ক্রীড়াচাতুরী-শালিনী, তবু কোন যুবক এর সঙ্গে দুটো কথা বলবার জন্যে ছুতো অন্বেষণ করে না, নাচের সময় আহ্বান করে না, আহারের সময় সযত্নে পরিবেষণ করে না। তার চঞ্চলতার মধ্যে শ্রী নেই, প্রখরতার মধ্যে জ্যোতি নেই, এবং প্রৌঢ়তার সঙ্গে রমণীর মুখে যে একটি স্নেহময় সুপ্রসন্ন সুগভীর মাতৃভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তাও তার কিছুমাত্র নেই।

ওদিকে আবার মিস্ অমুক এবং অমুককে দেখ! কুমারীদ্বয় অবিশ্রাম পুরুষসমাজে কি খেলাই খেলাচ্চে! আর কোন কাজ নেই, আর কোন ভাবনা নেই, আর কোন সুখ নেই,—মন নেই, আত্মা নেই, কেবল চখে মুখে হাসি এবং কথা এবং উত্তর-প্রত্যুত্তর।

২৬ অক্টোবর। জাহাজের একটা দিন বর্ণনা করা যাক্।

সকালে ডেক্ ধুয়ে গেছে, এখনো ভিজে রয়েছে। দুইধারে ডেক্-চেয়ার বিশৃঙ্খলভাবে পরস্পরের উপর রাশীকৃত। খালিপায়ে রাত-কাপড়-পরা পুরুষগণ কেউবা বন্ধুসঙ্গে কেউবা একলা মধ্যপথ দিয়ে হুহু করে'

বেড়াচ্চে। ক্রমে যখন আটটা বাজ্‌ল এবং একটি আধটি করে' মেয়ে উপরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল তখন একে একে এই বিরলবেশ পুরুষদের অন্তর্ধান।

স্নানের ঘরের সম্মুখে বিষম ভিড়! তিনটি মাত্র স্নানাগার; আমরা অনেকগুলি দ্বারস্থ। তোয়ালে এবং স্পঞ্জ হাতে দ্বারমোচনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। দশ মিনিটের অধিক স্নানের ঘর অধিকার করবার নিয়ম নেই।

স্নান এবং বেশভূষা সমাপনের পর উপরে গিয়ে দেখা যায় ডেকের উপর পদচারণশীল প্রভাতবায়ুসেবী অনেকগুলি স্ত্রীপুরুষের সমাগম হয়েচে। ঘন ঘন টুপি উদ্‌ঘাটন করে' মহিলাদের এবং শিরঃকম্পে পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে শুভপ্রভাত অভিবাদনপূর্ব্বক গ্রীষ্মের তারতম্য সম্বন্ধে পরস্পরের মতামত ব্যক্ত করা গেল।

নয়টার ঘণ্টা বাজ্‌ল। ব্রেক্‌ফাষ্ট প্রস্তুত। বুভুক্ষু নরনারীগণ সোপানপথ দিয়ে নিম্নকক্ষে ভোজনবিবরে প্রবেশ করলে। ডেকের উপরে আর জনপ্রাণী অবশিষ্ট রইল না। কেবল সারিসারি শূন্যহৃদয় চৌকি ঊর্দ্ধমুখে প্রভুদের জন্যে অপেক্ষা করে' রইল।

ভোজনশালা প্রকাণ্ড ঘর। মাঝে দুইসার লম্বা টেবিল, এবং তার দুইপার্শ্বে খণ্ড খণ্ড ছোট ছোট টেবিল। আমরা দক্ষিণ পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র টেবিল অধিকার করে' সাতটি প্রাণী দিনের মধ্যে তিনবার ক্ষুধা নিবৃত্তি করে' থাকি। মাংস রুটি ফলমূল মিষ্টান্ন মদিরায় এবং হাস্য-কৌতুক গল্প-গুজবে এই অনতি উচ্চ সুপ্রশস্ত ঘর কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

আহারের পর উপরে গিয়ে যে যার নিজ নিজ চৌকি অন্বেষণ এবং যথাস্থানে স্থাপনে ব্যস্ত। চৌকি খুঁজে পাওয়া দায়। ডেক্‌ ধোবার সময় কার চৌকি কোথায় ফেলেচে তার ঠিক নেই।

তারপর চৌকি খুঁজে নিয়ে আপনার জায়গাটুকু গুছিয়ে নেওয়া বিষম

ব্যাপার। যেখানে একটু কোণ, যেখানে একটু বাতাস, যেখানে একটু রৌদ্রের তেজ কম, যেখানে যার অভ্যাস সেইখানে ঠেলেঠুলে টেনেটুনে পাশ কাটিয়ে পথ করে' আপনার চৌকিটি রাখতে পারলে সমস্ত দিনের মত নিশ্চিন্ত।

তারপরে দেখা যায় কোন চৌকিহারা ম্লানমুখী রমণী কাতরভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করচে, কিম্বা কোন বিপদ্‌গ্রস্ত অবলা এই চৌকি-অরণ্যের মধ্যে থেকে নিজেরটি বিশ্লিষ্ট করে' নিয়ে অভিপ্রেত স্থানে স্থাপন করতে পারচে না—তখন পুরুষগণ নারীসহায়ব্রতে চৌকি-উদ্ধারকার্য্যে নিযুক্ত হয়ে সুশিষ্ট ও সুমিষ্ট ধন্যবাদ অর্জ্জন করে' থাকে।

তার পরে যে যার চৌকি অধিকার করে' বসে' যাওয়া যায়। ধূমসেবিগণ, হয় ধূমকক্ষে নয় ডেকের পশ্চাদ্ভাগে সমবেত হয়ে পরিতৃপ্ত মনে ধূমপান করচে। মেয়েরা অর্দ্ধনিলীন অবস্থায় কেউ বা নবেল পড়চে, কেউবা শেলাই করচে; মাঝে মাঝে দুই একজন যুবক ক্ষণেকের জন্যে পাশে বসে' মধুকরের মত কানের কাছে গুন্ গুন্ করে' আবার চলে' যাচ্চে।

আহার কিঞ্চিৎ পরিপাক হবামাত্র এক দলের মধ্যে কয়ট্‌স্ খেলা আরম্ভ হল। দুই বাল্‌তি পরস্পর হতে হাত দশেক দূরে স্থাপিত হল। দুই জুড়ি স্ত্রীপুরুষ বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করে' পালাক্রমে স্ব স্ব স্থান থেকে কল্‌সীর বিড়ের মত কতকগুলি রজ্জুচক্র বিপরীত বাল্‌তির মধ্যে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল। যে পক্ষ সর্ব্বাগ্রে একুশ করতে পারবে তারই জিত। মেয়ে খেলোয়াড়েরা কখনো জয়োচ্ছ্বাসে কখনো নৈরাশ্যে ঊর্দ্ধকণ্ঠে চীৎকার করে' উঠ্‌চেন। কেউ বা দাঁড়িয়ে দেখ্‌চে, কেউবা গণনা করচে, কেউবা খেলায় যোগ দিচ্চে, কেউবা আপন আপন পড়ায় কিম্বা গল্পে নিবিষ্ট হয়ে আছে।

একটার সময় আবার ঘণ্টা। আবার আহার। আহারান্তে উপরে ফিরে এসে দুইস্তর খাদ্যের ভারে এবং মধ্যাহ্নের উত্তাপে আলস্য অত্যন্ত

ঘনীভূত হয়ে আসে। সমুদ্র প্রশান্ত, আকাশ সুনীল মেঘমুক্ত, অল্প অল্প বাতাস দিচ্চে। কেদারায় হেলান্ দিয়ে নীরবে নভেল পড়্তে পড়্তে অধিকাংশ নীলনয়নে নিদ্রাবেশ হয়ে আস্চে। কেবল দুই একজন দাবা, ব্যাক্গ্যামন্ কিম্বা ড্রফ্ট্ খেল্চে, এবং দুই একজন অশ্রান্ত অধ্যবসায়ী যুবক সমস্ত দিনই ক্বয়ট্স্ খেলায় নিযুক্ত। কোন রমণী কোলের উপর কাগজ কলম নিয়ে একাগ্রমনে চিঠি লিখ্চে, এবং কোন শিল্পকুশলা কৌতুকপ্রিয়া যুবতী নিদ্রিত সহযাত্রীর ছবি আঁক্তে চেষ্টা করচে।

ক্রমে রৌদ্রের প্রখরতা হ্রাস হয়ে এল। তখন তাপক্লিষ্ট ক্লান্তকায়গণ নীচে নেমে গিয়ে রুটিমাখনমিষ্টান্ন সহযোগে চা-রস পান করে' শরীরের জড়তা পরিহারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ডেকে উপস্থিত। পুনর্ব্বার যুগল মূর্ত্তির সোৎসাহ পদচারণা এবং মৃদুমন্দ হাস্যালাপ আরম্ভ হল। কেবল দু'চার জন পাঠিকা উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদ থেকে কিছুতেই আপনাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারচে না,—দিবাবসানের ম্লান ক্ষীণালোকে একাগ্রনিবিষ্ট দৃষ্টিতে নায়ক নায়িকার পরিণাম অনুসরণ করচে।

দক্ষিণে জলন্ত কনকাকাশ এবং অগ্নিবর্ণ জলরাশির মধ্যে সূর্য্য অস্ত গেল এবং বামে সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্ব হতেই চন্দ্রোদয় হয়েচে। জাহাজ থেকে পূর্ব্বদিগন্ত পর্য্যন্ত বরাবর জ্যোৎস্না-রেখা ঝিক্‌ঝিক্ করচে। পূর্ণিমার সন্ধ্যা নীল সমুদ্রের উপর আপনার শুভ্র অঙ্গুলি স্থাপন করে' আমাদের সেই জ্যোৎস্নাপুলকিত পূর্ব্বভারতবর্ষের পথ নির্দ্দেশ করে' দিচ্চে।

জাহাজের ডেকের উপরে এবং কক্ষে কক্ষে বিদ্যুদ্দীপ জ্বলে' উঠ্‌ল। ছটার সময় ডিনারের প্রথম ঘণ্টা বাজ্‌ল। বেশ পরিবর্ত্তন উপলক্ষে সকলে স্ব স্ব কক্ষে প্রবেশ করলে। আধঘণ্টা পরে দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজ্‌ল। ভোজনগৃহে প্রবেশ করা গেল। সারিসারি নরনারী বসে' গেছে। কারো বা কালো কাপড়, কারো রঙীন কাপড়, কারো বা শুভ্রবক্ষ অর্দ্ধ-অনাবৃত। মাথার উপরে শ্রেণীবদ্ধ বিদ্যুৎ-আলোক জ্বলচে। গুন্‌গুন্

আলাপের সঙ্গে কাঁটাচামচের টুং টুং ঠুং ঠুং শব্দ উঠ্‌চে, এবং বিচিত্র খাদ্যের পর্য্যায় পরিচারকের হাতে হাতে নিঃশব্দ স্রোতের মত যাতায়াত করচে।

আহারের পর ডেকে গিয়ে শীতল বায়ু সেবন। কোথাও বা যুবক-যুবতী অন্ধকার কোণের মধ্যে চৌকি টেনে নিয়ে গুন্‌গুন্ করচে, কোথাও বা দু'জনে জাহাজের বারান্দা ধরে' ঝুঁকে পড়ে' রহস্যালাপে নিমগ্ন, কোন কোন জুড়ি গল্প করতে করতে ডেকের আলোক ও অন্ধকারের মধ্য দিয়ে দ্রুতপদে একবার দেখা দিচ্চে, একবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্চে, কোথাও বা একধারে পাঁচসাত জন স্ত্রীপুরুষ এবং জাহাজের কর্ম্মচারী জটলা করে' উচ্চ-হাস্যে প্রমোদকল্লোল উচ্ছ্বসিত করে' তুলচে। অলস পুরুষরা কেউবা বসে' কেউবা দাঁড়িয়ে কেউবা অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় চুরট খাচ্চে, কেউবা স্মোকিং সেলূনে কেউবা নীচে খাবার ঘরে হুইস্কি-সোডা পাশে রেখে চারজনে দল বেঁধে বাজি রেখে তাস খেলচে। ওদিকে সঙ্গীত-শালায় সঙ্গীতপ্রিয় দু'চার জনের সমাবেশ হয়ে গান বাজনা এবং মাঝে মাঝে করতালি শোনা যাচ্চে।

ক্রমে সাড়ে দশটা বাজে,—মেয়েরা নেবে যায়,—ডেকের উপরে আলো হঠাৎ নিবে যায়,—ডেক্ নিঃশব্দ নির্জ্জন অন্ধকার হয়ে আসে, এবং চারিদিকে নিশীথের নিস্তব্ধতা, চন্দ্রালোক এবং অনন্ত সমুদ্রের অশ্রান্ত কলধ্বনি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

২৭ অক্টোবর। লোহিত সমুদ্রের গরম ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌চে। ডেকের উপর মেয়েরা সমস্ত দিন তৃষাতুরা হরিণীর মত ক্লিষ্ট কাতর হয়ে রয়েচে। তারা কেবল অতি ক্লান্তভাবে পাখা নাড়চে, স্মেলিং সল্ট্ শুঁকচে, এবং সকরুণ যুবকেরা যখন পাশে এসে কুশল জিজ্ঞাসা করচে তখন নিমীলিত-প্রায় নেত্রপল্লব ঈষৎ উন্মীলন করে' ম্লানহাস্যে কেবল গ্রীবাভঙ্গী দ্বারা আপন সুকুমার দেহলতার একান্ত অবসন্নতা ইঙ্গিতে জানাচ্চে। যতই

পরিপূর্ণ করে' টিফিন্ এবং লেবুর সরবৎ খাচ্চে ততই জড়ত্ব এবং ক্লান্তি বাড়চে, নেত্র নিদ্রানত ও সর্ব্বশরীর শিথিল হয়ে আস্‌চে।

২৮ অক্টোবর। আজ এডেনে পৌছন গেল।

২ নবেম্বর। ভারতবর্ষের কাছাকাছি আসা গেছে। কাল বোম্বাই পৌছবার কথা।

আজ সুন্দর সকালবেলা। ঠাণ্ডা বাতাস বচ্চে—সমুদ্র সফেন তরঙ্গে নৃত্য করচে, উজ্জ্বল রৌদ্র উঠেচে; কেউ কয়ট্‌স্ খেল্‌চে, কেউ নবেল পড়্‌চে, কেউ গল্প করচে; ম্যুজিক সেলুনে গান চল্‌চে, স্মোকিং সেলুনে তাস চল্‌চে, ডাইনিং সেলুনে খানার আয়োজন হচ্চে, এবং একটি সঙ্কীর্ণ ক্যাবিনের মধ্যে আমাদের একটি বৃদ্ধ সহযাত্রী মরচে।

সন্ধ্যা আটটার সময় ডিলন্ সাহেবের মৃত্যু হল। আজ সন্ধ্যার সময় একটি নাটক অভিনয় হবার কথা ছিল।

৩ নবেম্বর। সকালে অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানের পর ডিলনের মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হল। আজ আমাদের সমুদ্রযাত্রার শেষ দিন।

অনেক রাত্রে জাহাজ বোম্বাইবন্দরে পৌছল।

৪ নবেম্বর। জাহাজ ত্যাগ করে' ভারতবর্ষে নেমে এখন সংসারটা মোটের উপরে বেশ আনন্দের স্থান বোধ হচ্চে। কেবল একটা গোল বেধেছিল—টাকাকড়িসমেত আমার ব্যাগটি জাহাজের ক্যাবিনে ফেলে' এসেছিলুম। তাতে করে' সংসারের আকৃতির হঠাৎ অনেকটা পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হোটেল থেকে অবিলম্বে জাহাজে ফিরে গিয়ে সেটি সংগ্রহ করে' এনেছি। এই ব্যাগ্ ভুলে যাবার সম্ভাবনা কাল চকিতের মত একবার মনে উদয় হয়েছিল। মনকে তখনি সাবধান করে' দিলুম ব্যাগটি যেন না ভোলা হয়। মন বল্‌লে, ক্ষেপেছ! আমাকে তেমনি লোক পেয়েছ!—আজ সকালে তাকে বিলক্ষণ একচোট ভর্ৎসনা করেচি—

সে নতমুখে নিরুত্তর হয়ে রইল। তার পর যখন ব্যাগ্ ফিরে পাওয়া গেল তখন আবার তার পিঠে হাত বুলতে বুলতে হোটেলে ফিরে এসে স্নান করে' বড় আরাম বোধ হচ্চে! এই ঘটনা নিয়ে আমার স্বাভাবিক বুদ্ধির প্রতি কটাক্ষপাত করে' পরিহাস করবেন সৌভাগ্যক্রমে এমন প্রিয়বন্ধু কেউ উপস্থিত নেই। সুতরাং রাত্রে যখন কলিকাতামুখী গাড়িতে চড়ে' বসা গেল, তখন যদিও আমার বালিশটা ভ্রমক্রমে হোটেলে ফেলে এসেছিলুম তবু আমার সুখনিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হয় নি।

পঞ্চভূত।

পরিচয়।

রচনার সুবিধার জন্য আমার পাঁচটি পরিপার্শ্বিককে পঞ্চভূত নাম দেওয়া যাক্। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।

একটা গড়া নাম দিতে গেলেই মানুষকে বদল করিতে হয়। তলোয়ারের যেমন খাপ, মানুষের তেমন নামটি ভাষায় পাওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ ঠিক পাঁচ ভূতের সহিত পাঁচটা মানুষ অবিকল মিলাইব কি করিয়া?

আমি ঠিক মিলাইতে চাহি না। আমি ত আদালতে উপস্থিত হইতেছি না। কেবল পাঠকের এজলাসে লেখকের একটা এই ধর্ম্মশপথ আছে, যে, সত্য বলিব। কিন্তু সে সত্য বানাইয়া বলিব।

এখন পঞ্চভূতের পরিচয় দিই।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতি আমাদের সকলের মধ্যে গুরুভার। তাঁহার অধিকাংশ বিষয়েই অচল অটল ধারণা। তিনি যাহাকে প্রত্যক্ষভাবে একটা দৃঢ় আকারের মধ্যে পান, এবং আবশ্যক হইলে কাজে লাগাইতে পারেন তাহাকেই সত্য বলিয়া জানেন। তিনি বলেন, যে সকল জ্ঞান আবশ্যক তাহারই ভার বহন করা যথেষ্ট কঠিন। বোঝা ক্রমেই ভারী এবং শিক্ষা ক্রমেই দুঃসাধ্য হইয়া উঠিতেছে। প্রাচীনকালে যখন জ্ঞান বিজ্ঞান এত স্তরে স্তরে জমা হয় নাই, মানুষের নিতান্তশিক্ষণীয় বিষয় যখন যৎসামান্য ছিল, তখন সৌখীন শিক্ষার অবসর ছিল। কিন্তু এখন আর ত সে অবসর নাই। ছোট ছেলেকে কেবল বিচিত্র বেশবাস এবং অলঙ্কারে আচ্ছন্ন করিলে কোন ক্ষতি নাই, তাহার খাইয়াদাইয়া আর কোন কর্ম্ম নাই।

কিন্তু তাই বলিয়া, বয়ঃপ্রাপ্ত লোক, যাহাকে করিয়া-কর্ম্মিয়া, নড়িয়া-চড়িয়া, উঠিয়া হাঁটিয়া ফিরিতে হইবে, তাহাকে পায়ে নূপুর, হাতে কঙ্কণ, শিখায় ময়ূরপুচ্ছ দিয়া সাজাইলে চলিবে কেন? তাহাকে কেবল মালকোঁচা এবং শিরস্ত্রাণ আঁটিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে হইবে। এই কারণে সভ্যতা হইতে প্রতিদিন অলঙ্কার খসিয়া পড়িতেছে। উন্নতির অর্থই এই, ক্রমশঃ আবশ্যকের সঞ্চয় এবং অনাবশ্যকের পরিহার।

শ্রীমতী অপ্ (ইহাকে আমরা স্রোতস্বিনী বলিব) ক্ষিতির এ তর্কের কোন রীতিমত উত্তর করিতে পারেন না। তিনি কেবল মধুর কাকলীতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বলিতে থাকেন—না, না, ও কথা কখনই সত্য না। ও আমার মনে লইতেছে না, ও কথনই সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে না। কেবল বারবার "না না, নহে নহে"। তাহার সহিত আর কোন যুক্তি নাই কেবল না না, নহে নহে। আমি অনাবশ্যককে ভালবাসি, অতএব অনাবশ্যকও আবশ্যক। অনাবশ্যক আমাদের আর কোন উপকার করে না, কেবলমাত্র আমাদের স্নেহ, আমাদের ভালবাসা, আমাদের করুণা, আমাদের স্বার্থবিসর্জ্জনের স্পৃহা উদ্রেক করে, পৃথিবীতে সেই ভালবাসার আবশ্যকতা কি নাই? শ্রীমতী স্রোতস্বিনীর এই অনুনয়প্রবাহে শ্রীযুক্ত ক্ষিতি প্রায় গলিয়া যান, কিন্তু কোন যুক্তির দ্বারা তাঁহাকে পরাস্ত করিবার সাধ্য কি?

শ্রীমতী তেজ (ইহাঁকে দীপ্তি নাম দেওয়া গেল) একেবারে নিষ্কাসিত অসিলতার মত ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠেন এবং শাণিত সুন্দর সুরে ক্ষিতিকে বলেন, ইস্! তোমরা মনে কর পৃথিবীতে কাজ তোমরা কেবল একলাই কর! তোমাদের কাজে যাহা আবশ্যক নয় বলিয়া ছাঁটিয়া ফেলিতে চাও, আমাদের কাজে তাহা আবশ্যক হইতে পারে। তোমাদের আচার-ব্যবহার, কথাবার্ত্তা, বিশ্বাস, শিক্ষা এবং শরীর হইতে অলঙ্কারমাত্রই তোমরা ফেলিয়া দিতে চাও, কেন না, সভ্যতার ঠেলাঠেলিতে স্থান এবং

সময়ের বড় অনটন হইয়াছে। কিন্তু আমাদের যাহা চিরন্তন কাজ, ঐ অলঙ্কারগুলো ফেলিয়া দিলে তাহা একপ্রকার বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের কত টুকিটাকি, কত ইটি-উটি, কত মিষ্টতা, কত শিষ্টতা, কত কথা, কত কাহিনী, কত ভাব, কত ভঙ্গী, কত অবসর সঞ্চয় করিয়া তবে এই পৃথিবীর গৃহকার্য্য চালাইতে হয়! আমরা মিষ্ট করিয়া হাসি, বিনয় করিয়া বলি, লজ্জা করিয়া কাজ করি, দীর্ঘকাল যত্ন করিয়া যেখানে যেটি পরিলে শোভা পায় সেটি পরি, এই জন্যই তোমাদের মাতার কাজ, তোমাদের স্ত্রীর কাজ এত সহজে করিতে পারি। যদি সত্যই সভ্যতার তাড়ায় অত্যাবশ্যক জ্ঞানবিজ্ঞান ছাড়া আর সমস্তই দূর হইয়া যায়, তবে, একবার দেখিবার ইচ্ছা আছে অনাথ শিশুসন্তানের এবং পুরুষের মত এত বড় অসহায় এবং নির্ব্বোধ জাতির কি দশাটা হয়!

শ্রীযুক্ত বায়ু (ইহাঁকে সমীর বলা যাক্) প্রথমটা একবার হাসিয়া সমস্ত উড়াইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, ক্ষিতির কথা ছাড়িয়া দাও; একটুখানি পিছন হঠিয়া, পাশ ফিরিয়া, নড়িয়া-চড়িয়া একটা সত্যকে নানা দিক্ হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে গেলেই উহার চলৎশক্তিহীন মানসিক রাজ্যে এমনি একটা ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, যে, বেচারার বহুযত্ননির্ম্মিত পাকা মতগুলি কোনটা বিদীর্ণ, কোনটা ভূমিসাৎ হইয়া যায়। কাজেই ও ব্যক্তি বলে, দেবতা হইতে কীট পর্য্যন্ত সকলি মাটি হইতে উৎপন্ন; কারণ মাটির বাহিরে আর কিছু আছে স্বীকার করিতে গেলে আবার মাটি হইতে অনেকখানি নড়িতে হয়।

শ্রীযুক্ত ব্যোম কিয়ৎকাল চক্ষু মুদিয়া বলিলেন—ঠিক মানুষের কথা যদি বল, যাহা অনাবশ্যক তাহাই তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক। যে কোন-কিছুতে সুবিধা হয়, কাজ চলে, পেট ভরে, মানুষ তাহাকে প্রতিদিন ঘৃণা করে। এই জন্য ভারতের ঋষিরা ক্ষুধাতৃষ্ণা শীতগ্রীষ্ম একেবারেই উড়াইয়া দিয়া মনুষ্যত্বের স্বাধীনতা প্রচার করিয়াছিলেন।

বাহিরের কোন কিছুরই যে অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা আছে ইহাই জীবাত্মার পক্ষে অপমানজনক। অত্যাবশ্যকটাকেই যদি মানব-সভ্যতার সিংহাসনে রাজা করিয়া বসানো হয় এবং তাহার উপরে যদি আর কোন সম্রাটকে স্বীকার না করা যায়, তবে, সে সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা বলা যায় না।

ব্যোম যাহা বলে তাহা কেহ মনোযোগ দিয়া শোনে না। পাছে তাহার মনে আঘাত লাগে এই আশঙ্কায় স্রোতস্বিনী যদিও তাহার কথা প্রণিধানের ভাবে শোনে, তবু মনে মনে তাহাকে বেচারা পাগল বলিয়া বিশেষ দয়া করিয়া থাকে। কিন্তু দীপ্তি তাহাকে সহিতে পারে না। অধীর হইয়া উঠিয়া মাঝখানে অন্য কথা পাড়িতে চায়। তাহার কথা ভাল বুঝিতে পাবে না বলিয়া তাহার উপর দীপ্তির যেন একটা আন্তরিক বিদ্বেষ আছে।

কিন্তু ব্যোমের কথা আমি কখন একবারে উড়াইয়া দিই না। আমি তাহাকে বলিলাম, ঋষিরা কঠোর সাধনায় যাহা নিজের নিজের জন্য করিয়াছিলেন, বিজ্ঞান তাহাই সর্ব্বসাধারণের জন্য করিয়া দিতে চায়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীতগ্রীষ্ম এবং মানুষের প্রতি জড়ের যে শত শত অত্যাচার আছে, বিজ্ঞান তাহাই দূর করিতে চায়। জড়ের নিকট হইতে পলায়নপূর্ব্বক তপোবনে মনুষ্যত্বের মুক্তিসাধন না করিয়া জড়কেই ক্রীতদাস করিয়া ভৃত্যশালায় পুষিয়া রাখিলে এবং মনুষ্যকেই এই প্রকৃতির প্রাসাদে রাজ-রূপে অভিষিক্ত করিলে আর ত মানুষের অবমাননা থাকে না। অতএব স্থায়ীরূপে জড়ের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন আধ্যাত্মিক সভ্যতায় উপনীত হইতে গেলে মাঝখানে একটা দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক সাধনা অতিবাহিত করা নিতান্ত আবশ্যক।

ক্ষিতি যেমন তাঁর বিরোধী পক্ষের কোন যুক্তি খণ্ডন করিতে বসা নিতান্ত বাহুল্য জ্ঞান করেন, আমাদের ব্যোমও তেমনি একটা কথা বলিয়া চুপ মারিয়া থাকেন, তাহার পর যে যাহা বলে তাঁহার গাম্ভীর্য্য নষ্ট

করিতে পারে না। আমার কথাও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। ক্ষিতি যেখানে ছিল সেই খানেই অটল হইয়া রহিল এবং ব্যোমও আপনার প্রচুর গোঁফদাড়ি ও গাম্ভীর্য্যের মধ্যে সমাহিত হইয়া রহিলেন।

এই ত আমি এবং আমার পঞ্চভূত সম্প্রদায়। ইহার মধ্যে শ্রীমতী দীপ্তি একদিন প্রাতঃকালে আমাকে কহিলেন, "তুমি তোমার ডায়ারি রাখনা কেন?"

মেয়েদের মাথায় অনেকগুলি অন্ধসংস্কার থাকে, শ্রীমতী দীপ্তির মাথায় তন্মধ্যে এই একটি সংস্কার ছিল যে, আমি নিতান্ত যে-সে-লোক নহি; বলা বাহুল্য এই সংস্কার দূর করিবার জন্য আমি অত্যধিক প্রয়াস পাই নাই।

সমীর উদার চঞ্চলভাবে আমার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন "লেখ না হে!" ক্ষিতি এবং ব্যোম চুপ করিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম, ডায়ারি লিখিবার একটি মহদ্দোষ আছে।

দীপ্তি অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, তা থাক্, তুমি লেখ!

স্রোতস্বিনী মৃদুস্বরে কহিলেন, কি দোষ, শুনি!

আমি কহিলাম—ডায়ারি একটা কৃত্রিম জীবন। কিন্তু যখনি উহাকে রচিত করিয়া তোলা যায়, তখনি ও আমাদের প্রকৃত জীবনের উপর কিয়ৎ পরিমাণে আধিপত্য না করিয়া ছাড়ে না। ভিতরে একটা লোক প্রতিদিন সংসারের উপর নানা চিন্তা, নানা কাজ গাঁথিয়া গাঁথিয়া এক অনাবিষ্কৃত নিয়মে একটি জীবন গড়িয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ডায়ারি লিখিয়া গেলে আর একটি লোক গড়িয়া আর একটি দ্বিতীয় জীবন খাড়া করা হয়।

ক্ষিতি হাসিয়া কহিল—ডায়ারিকে কেন যে দ্বিতীয় জীবন বলিতেছ আমি ত এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।

আমি কহিলাম, আমার কথা এই, জীবন একদিকে একটা পথ আঁকিয়া চলিতেছে, তুমি যদি ঠিক তার পাশে কলম হস্তে তাহার

অনুরূপ আর একটা রেখা কাটিয়া যাও, তবে ক্রমে এমন অবস্থা আসিবার সম্ভাবনা, যখন বোঝা শক্ত হইয়া দাঁড়াইবে, তোমার কলম তোমার জীবনের সমপাতে লাইন কাটিয়া যায়, না, তোমার জীবন তোমার কলমের লাইন ধরিয়া চলে। জীবনের গতি স্বভাবতই রহস্যময়, তাহার মধ্যে অনেক আত্মখণ্ডন, অনেক স্বতোবিরোধ, অনেক পূর্ব্বাপরের অসামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু লেখনী স্বভাবতই একটা সুনির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিতে চাহে। সে, সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করিয়া, সমস্ত অসামঞ্জস্য সমান করিয়া, কেবল একটা মোটামুটি রেখা টানিতে পারে। সে একটা ঘটনা দেখিলে তাহার যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারে না। কাজেই তাহার রেখাটা সহজেই তাহার নিজের গড়া সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং জীবনকেও তাহার সহিত মিলাইয়া আপনার অনুবর্ত্তী করিতে চাহে।

কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য আমার ব্যাকুলতা দেখিয়া স্রোতস্বিনী দয়ার্দ্রচিত্তে কহিল—বুঝিয়াছি তুমি কি বলিতে চাও। স্বভাবতঃ আমাদের মহাপ্রাণী তাঁহার অতি গোপন নির্ম্মাণশালায় বসিয়া এক অপূর্ব্ব নিয়মে আমাদের জীবন গড়েন, কিন্তু ডায়ারি লিখিতে গেলে দুই ব্যক্তির উপর জীবন গড়িবার ভার দেওয়া হয়। কতকটা জীবন অনুসারে ডায়ারি হয়, কতকটা ডায়ারি অনুসারে জীবন হয়।

স্রোতস্বিনী এমনি সহিষ্ণুভাবে নীরবে সমনোযোগে সকল কথা শুনিয়া যায় যে, মনে হয় যেন বহুযত্নে সে আমার কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কার করা যায় যে, বহুপূর্ব্বেই সে আমার কথাটা ঠিক বুঝিয়া লইয়াছে।

আমি কহিলাম—সেই বটে।

দীপ্তি কহিল—তাহাতে ক্ষতি কি?

ইহার উত্তরে আমার অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু দেখিলাম

স্রোতস্বিনা একটা কি বলিবার জন্য ইতস্ততঃ করিতেছে, এমন সময় যদি আমি আমার বক্তৃতা আরম্ভ করি তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ নিজের কথাটা ছাড়িয়া দিবে। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে সে বলিল—কি জানি ভাই, আমার মনে হয় প্রতিদিন আমরা যাহা অনুভব করি তাহা প্রতিদিন লিপিবদ্ধ করিতে গেলে তাহার যথাযথ পরিমাণ থাকে না। আমাদের অনেক সুখদুঃখ, অনেক রাগদ্বেষ অকস্মাৎ সামান্য কারণে গুরুতর হইয়া দেখা দেয়। হয়ত অনেক দিন যাহা অনায়াসে সহ্য করিয়াছি একদিন তাহা একেবারে অসহ্য হইয়াছে, যাহা আসলে অপরাধ নহে একদিন তাহা আমার নিকটে অপরাধ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে, তুচ্ছকারণে হয় ত একদিনকার একটা দুঃখ আমার কাছে অনেক মহত্তর দুঃখের অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া মনে হইয়াছে, কোন কারণে আমার মন ভাল নাই বলিয়া আমরা অনেক সময় অন্যের প্রতি অন্যায় বিচার করিয়াছি, তাহার মধ্যে যেটুকু অপরিমিত, যেটুকু অন্যায়, যেটুকু অসত্য তাহা কালক্রমে আমাদের মন হইতে দূর হইয়া যায়—এইরূপে ক্রমশই জীবনের বাড়াবাড়িগুলি চুকিয়া গিয়া জীবনের মোটামুটিটুকু টিঁকিয়া যায়, সেইটেই আমার প্রকৃত আমাত্ব। তাহা ছাড়া আমাদের মনে অনেক কথা অর্দ্ধস্ফুট আকারে আসে যায় মিলায়, তাহাদের সবগুলিকে অতিস্ফুট করিয়া তুলিলে মনের সৌকুমার্য্য নষ্ট হইয়া যায়। ডায়ারি রাখিতে গেলে একটা কৃত্রিম উপায়ে আমরা জীবনের প্রতি তুচ্ছতাকে বৃহৎ করিয়া তুলি, এবং অনেক কচি কথাকে জোর করিয়া ফুটাইতে গিয়া ছিঁড়িয়া অথবা বিকৃত করিয়া ফেলি।

সহসা স্রোতস্বিনীর চৈতন্য হইল—কথাটা সে অনেকক্ষণ ধরিয়া এবং কিছু আবেগের সহিত বলিয়াছে, অমনি তাহার কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিল—মুখ ঈষৎ ফিরাইয়া কহিল—কি জানি, আমি ঠিক বলিতে পারি না, আমি ঠিক বুঝিয়াছি কি না কে জানে!

দীপ্তি কখন কোন বিষয়ে তিলমাত্র ইতস্তত করে না—সে একটা প্রবল উত্তর দিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া আমি কহিলাম—তুমি ঠিক বুঝিয়াছ। আমিও ঐ কথা বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু অমন ভাল করিয়া বলিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। শ্রীমতী দীপ্তির এই কথা মনে রাখা উচিত, বাড়িতে গেলে ছাড়িতে হয়। অর্জ্জন করিতে গেলে ব্যয় করিতে হয়। জীবন হইতে প্রতিদিন অনেক ভুলিয়া, অনেক ফেলিয়া, অনেক বিলাইয়া তবে আমরা অগ্রসর হইতে পারি। প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক ঘটনার উপর যে ব্যক্তি বুক দিয়া চাপিয়া পড়ে সে অতি হতভাগ্য!

দীপ্তি মৌখিক হাস্য হাসিয়া করযোড়ে কহিল—আমার ঘাট হইয়াছে তোমাকে ডায়ারি লিখিতে বলিয়াছিলাম, এমন কাজ আর কখন করিব না।

সমীর বিচলিত হইয়া কহিল—অমন কথা বলিতে আছে! পৃথিবীতে অপরাধ স্বীকার করা মহাভ্রম। আমরা মনে করি দোষ স্বীকার করিলে বিচারক দোষ কম করিয়া দেখে; তাহা নহে; অন্য লোককে বিচার করিবার এবং ভৎর্সনা করিবার সুখ একটা দুর্লভ সুখ, তুমি নিজের দোষ নিজে যতই বাড়াইয়া বল না কেন, কঠিন বিচারক সেটাকে ততই চাপিয়া ধরিয়া সুখ পায়। আমি কোন্ পথ অবলম্বন করিব ভাবিতেছিলাম, এখন স্থির করিতেছি আমি ডায়ারি লিখিব।

আমি কহিলাম—আমিও প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমার নিজের কথা লিখিব না। এমন কথা লিখিব যাহা আমাদের সকলের। এই আমরা যে সব কথা প্রতিদিন আলোচনা করি—

স্রোতস্বিনী কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া উঠিল। সমীর করজোড়ে কহিল—দোহাই তোমার, সব কথা যদি লেখায় ওঠে, তবে বাড়ি হইতে কথা মুখস্থ করিয়া আসিয়া বলিব, এবং বলিতে বলিতে যদি হঠাৎ মাঝখানে

ভুলিয়া যাই, তবে আবার বাড়ি গিয়া দেখিয়া আসিতে হইবে। তাহাতে ফল হইবে এই যে, কথা বিস্তর কমিবে এবং পরিশ্রম বিস্তর বাড়িবে। যদি খুব ঠিক সত্য কথা লেখ, তবে তোমার সঙ্গ হইতে নাম কাটাইয়া আমি চলিলাম।

আমি কহিলাম—আরে না, সত্যের অনুরোধ পালন করিব না, বন্ধুর অনুরোধই রাখিব। তোমরা কিছু ভাবিও না, আমি তোমাদের মুখে কথা বানাইয়া দিব।

ক্ষিতি বিশাল চক্ষু প্রসারিত করিয়া কহিল—সে যে আরো ভয়ানক। আমি বেশ দেখিতেছি তোমার হাতে লেখনী পড়িলে যত সব কুযুক্তি আমার মুখে দিবে আর তাহার অকাট্য উত্তর নিজের মুখ দিয়া বাহির করিবে।

আমি কহিলাম—মুখে যাহার কাছে তর্কে হারি, লিখিয়া তাহার প্রতিশোধ না নিলে চলে না। আমি আগে থাকিতেই বলিয়া রাখিতেছি, তোমার কাছে যত উপদ্রব এবং পরাভব সহ্য করিয়াছি এবারে তাহার প্রতিফল দিব।

সর্ব্বসহিষ্ণু ক্ষিতি সন্তুষ্টচিত্তে কহিল—তথাস্তু।

ব্যোম কোন কথা না বলিয়া ক্ষণকালের জন্য ঈষৎ হাসিল, তাহার সুগভীর অর্থ আমি এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই।

সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ।

বর্ষায় নদী ছাপিয়া ক্ষেতের মধ্যে জল প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের বোট অর্দ্ধমগ্ন ধানের উপর দিয়া সর্ সর্ শব্দ করিতে করিতে চলিয়াছে।

অদূরে উচ্চভূমিতে একটা প্রাচীরবেষ্টিত একতালা কোটা বাড়ি এবং দুই চারিটি টিনের ছাদবিশিষ্ট কুটীর, কলা কাঁঠাল আম বাঁশঝাড় এবং বৃহৎ বাঁধানো অশথগাছের মধ্য দিয়া দেখা যাইতেছে।

সেখান হইতে একটা সরু সুরের সানাই এবং গোটাকতক ঢাক-ঢোলের শব্দ শোনা গেল। সানাই অত্যন্ত বেসুরে একটা মেঠো রাগিণীর আরম্ভ অংশ বারম্বার ফিরিয়া ফিরিয়া নিষ্ঠুর ভাবে বাজাইতেছে এবং ঢাকঢোলগুলা যেন অকস্মাৎ বিনা কারণে ক্ষেপিয়া উঠিয়া বায়ুরাজ্য লণ্ডভণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছে।

স্রোতস্বিনী মনে করিল নিকটে কোথাও বুঝি একটা বিবাহ আছে। একান্ত কৌতূহলভরে বাতায়ন হইতে মুখ বাহির করিয়া তরুসমাচ্ছন্ন তীরের দিকে উৎসুক দৃষ্টি চালনা করিল।

আমি ঘাটে বাঁধা নৌকার মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি রে, বাজনা কিসের? সে কহিল, আজ জমিদারের পুণ্যাহ।

পুণ্যাহ বলিতে বিবাহ বুঝায় না শুনিয়া স্রোতস্বিনী কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। সে ঐ তরুচ্ছায়াঘন গ্রাম্য পথটার মধ্যে কোন এক জায়গায় ময়ূরপংখীতে একটি চন্দনচর্চ্চিত অজাতশ্মশ্রু নব বর অথবা লজ্জামণ্ডিতা রক্তাম্বরা নববধূকে দেখিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল।

আমি কহিলাম—পুণ্যাহ অর্থে জমিদারী বৎসরের আরম্ভ দিন। আজ প্রজারা যাহার যেমন ইচ্ছা কিছু কিছু খাজনা লইয়া কাছারি-ঘরে টোপর-পরা বরবেশধারী নায়েবের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিবে। সে টাকা সে দিন গণনা করিবার নিয়ম নাই। অর্থাৎ খাজনা দেনা-পাওনা যেন কেবলমাত্র স্বেচ্ছাকৃত একটা আনন্দের কাজ। ইহার মধ্যে একদিকে নীচ লোভ অপর দিকে হীন ভয় নাই। প্রকৃতিতে তরুলতা যেমন আনন্দ-মহোৎসবে বসন্তকে পুষ্পাঞ্জলি দেয় এবং বসন্ত তাহা সঞ্চয়-ইচ্ছায় গণনা করিয়া লয় না সেইরূপ ভাবটা আর কি।

দীপ্তি কহিল, কাজটা ত খাজনা আদায়, তাহার মধ্যে আবার বাজনা-বাদ্য কেন?

ক্ষিতি কহিল, ছাগশিশুকে যখন বলিদান দিতে লইয়া যায় তখন

কি তাহাকে মালা পরাইয়া বাজনা বাজায় না? আজ খাজনা-দেবীর নিকটে বলিদানের বাদ্য বাজিতেছে।

আমি কহিলাম, সে হিসাবে দেখিতে পার বটে, কিন্তু বলি যদি দিতেই হয় তবে নিতান্ত পশুর মত পশুহত্যা না করিয়া উহার মধ্যে যতটা পারা যায় উচ্চভাব রাখাই ভাল!

ক্ষিতি কহিল, আমি ত বলি যেটার যাহা সত্য ভাব তাহাই রক্ষা করা ভাল; অনেক সময়ে নীচকাজের মধ্যে উচ্চভাব আরোপ করিয়া উচ্চভাবকে নীচ করা হয়।

আমি কহিলাম, ভাবের সত্য মিথ্যা অনেকটা ভাবনার উপরে নির্ভর করে। আমি একভাবে এই বর্ষার পরিপূর্ণ নদীটিকে দেখিতেছি আর ঐ জেলে আর একভাবে দেখিতেছে, আমার ভাব যে একচুল মিথ্যা এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারি না।

সমীর কহিল—অনেকের কাছে ভাবের সত্য মিথ্যা ওজনদরে পরিমাপ হয়। যেটা যে পরিমাণে মোটা সেটা সেই পরিমাণে সত্য। সৌন্দর্য্যের অপেক্ষা ধূলি সত্য, স্নেহের অপেক্ষা স্বার্থ সত্য, প্রেমের অপেক্ষা ক্ষুধা সত্য।

আমি কহিলাম, কিন্তু তবু চিরকাল মানুষ এই সমস্ত ওজনে-ভারি মোটা জিনিষকে একেবারে অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিতেছে। ধূলিকে আবৃত করে, স্বার্থকে লজ্জা দেয়, ক্ষুধাকে অন্তরালে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখে। মলিনতা পৃথিবীতে বহুকালের আদিম সৃষ্টি; ধূলিজঞ্জালের অপেক্ষা প্রাচীন পদার্থ মেলাই কঠিন; তাই বলিয়া সেইটেই সব চেয়ে সত্য হইল, আর অন্তর-অন্তঃপুরের যে লক্ষ্মীরূপিণী গৃহিণী আসিয়া তাহাকে ক্রমাগত ধৌত করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহাকেই কি মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে?

ক্ষিতি কহিল, তোমরা ভাই এত ভয় পাইতেছ কেন? আমি

তোমাদের সেই অন্তঃপুরের ভিত্তিতলে ডাইনামাইট্‌ লাগাইতে আসি নাই। কিন্তু একটু ঠাণ্ডা হইয়া বল দেখি পুণ্যাহের দিন ঐ বেসুরো সানাইটা বাজাইয়া পৃথিবীর কি সংশোধন করা হয়! সঙ্গীতকলা ত নহেই।

সমীর কহিল, ও আর কিছুই নহে একটা সুর ধরাইয়া দেওয়া। সংবৎসরের বিবিধ পদস্খলন এবং ছন্দঃপতনের পর পুনর্ব্বার সমের কাছে আসিয়া একবার ধুয়ায় আনিয়া ফেলা। সংসারের স্বার্থকোলাহলের মধ্যে মাঝে মাঝে একটা পঞ্চম সুর সংযোগ করিয়া দিলে নিদেন ক্ষণকালের জন্য পৃথিবীর শ্রী ফিরিয়া যায়, হঠাৎ হাটের মধ্যে গৃহের শোভা আসিয়া আবির্ভূত হয়, কেনাবেচার উপর ভালবাসার স্নিগ্ধদৃষ্টি চন্দ্রালোকের ন্যায় নিপতিত হইয়া তাহার শুষ্ক কঠোরতা দূর করিয়া দেয়। যাহা হইয়া থাকে পৃথিবীতে তাহা চীৎকার স্বরে হইতেছে, আর, যাহা হওয়া উচিত তাহা মাঝে মাঝে এক এক দিন আসিয়া মাঝখানে বসিয়া সুকোমল সুন্দর স্বরে সুর দিতেছে, এবং তখনকার মত সমস্ত চীৎকারস্বর নরম হইয়া আসিয়া সেই সুরের সহিত আপনাকে মিলাইয়া লইতেছে—পুণ্যাহ সেই সঙ্গীতের দিন।

আমি কহিলাম, উৎসবমাত্রই তাই। মানুষ প্রতিদিন যে ভাবে কাজ করে এক একদিন তাহার উল্টাভাবে আপনাকে সারিয়া লইতে চেষ্টা করে। প্রতিদিন উপার্জ্জন করে একদিন খরচ করে, প্রতিদিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে একদিন দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়, প্রতিদিন গৃহের মধ্যে আমিই গৃহকর্ত্তা, আর একদিন আমি সকলের সেবায় নিযুক্ত। সেই দিন শুভদিন, আনন্দের দিন, সেই দিনই উৎসব। সেই দিন সম্বৎসরের আদর্শ। সে দিন ফুলের মালা, স্ফটিকের প্রদীপ, শোভন ভূষণ। সেদিন দূরে একটি বাঁশি বাজিয়া বলিতে থাকে, আজিকার এই সুরই যথার্থ সুর, আর সমস্তই বেসুরা। বুঝিতে পারি আমরা

মানুষে মানুষে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিত হইয়া আনন্দ করিতে আসিয়াছিলাম কিন্তু প্রতিদিনের দৈন্যবশতঃ তাহা পরিয়া উঠি না ;—যে দিন পারি সেই দিনই প্রধান দিন।

সমীর কহিল, সংসারে দৈন্যের শেষ নাই। সেদিক হইতে দেখিতে গেলে মানবজীবনটা অত্যন্ত শীর্ণশূন্য শ্রীহীনরূপে চক্ষে পড়ে। মানবাত্মা জিনিষটা যতই উচ্চ হউক্ না কেন দুইবেলা দুই মুষ্টি তণ্ডুল সংগ্রহ করিতেই হইবে, একখণ্ড বস্ত্র না হইলে সে মাটিতে মিশাইয়া যায়। এদিকে আপনাকে অবিনাশী অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করে, ওদিকে যে দিন নস্যের ডিবাটা হারাইয়া যায় সে দিন আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। যেমন করিয়াই হোক্, প্রতিদিন তাহাকে আহারবিহার কেনাবেচা দরদাম মারামারি ঠেলাঠেলি করিতেই হয়—সে জন্য সে লজ্জিত। এই কারণে সে এই শুষ্ক ধূলিময় লোকাকীর্ণ হাটবাজারের ইতরতা ঢাকিবার জন্য সর্ব্বদা প্রয়াস পায়। আহারে বিহারে আদানে প্রদানে আত্মা আপনার সৌন্দর্য্যবিভা বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। সে আপনার আবশ্যকের সহিত আপনার মহত্ত্বের সুন্দর সামঞ্জস্য সাধন করিয়া লইতে চায়।

আমি কহিলাম, তাহারই প্রমাণ এই পুণ্যাহের বাঁশি। একজনের ভূমি, আর একজন তাহারই মূল্য দিতেছে, এই শুষ্ক চুক্তির মধ্যে লজ্জিত মানবাত্মা একটি ভাবের সৌন্দর্য্য প্রয়োগ করিতে চাহে। উভয়ের মধ্যে একটি আত্মীয় সম্পর্ক বাঁধিয়া দিতে ইচ্ছা করে। বুঝাইতে চাহে ইহা চুক্তি নহে, ইহার মধ্যে একটি প্রেমের স্বাধীনতা আছে; রাজাপ্রজা ভাবের সম্বন্ধ, আদানপ্রদান হৃদয়ের কর্ত্তব্য। খাজনার টাকার সহিত রাগরাগিণীর কোন যোগ নাই, খাতাঞ্চিখানা নহবৎ বাজাইবার স্থান নহে, কিন্তু যেখানেই ভাবের সম্পর্ক আসিয়া দাঁড়াইল অমনি সেখানেই বাঁশি তাহাকে আহ্বান করে, রাগিণী তাহাকে প্রকাশ করে, সৌন্দর্য্য তাহার

সহচর। গ্রামের বাঁশি যথাসাধ্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে আজ আমাদের পুণ্যদিন, আমাদের রাজাপ্রজার মিলন। জমিদারী কাছারিতেও মানবাত্মা আপন প্রবেশপথ নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতেছে, সেখানেও একখানা ভাবের আসন পাতিয়া রাখিয়াছে।

স্রোতস্বিনী আপনার মনে ভাবিতে ভাবিতে কহিল, আমার বোধ হয় ইহাতে যে কেবল সংসারের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে তাহা নহে, যথার্থ দুঃখভার লাঘব করে। সংসারে উচ্চনীচতা যখন আছেই, সৃষ্টিলোপ ব্যতীত কখনই যখন তাহা ধ্বংস হইবার নহে, তখন উচ্চ এবং নীচের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ থাকিলে উচ্চতার ভার বহন করা সহজ হয়। চরণের পক্ষে দেহভার বহন করা সহজ; বিচ্ছিন্ন বাহিরের বোঝাই বোঝা।

উপমাপ্রয়োগ পূর্ব্বক একটা কথা ভাল করিয়া বলিবামাত্র স্রোতস্বিনীর লজ্জা উপস্থিত হয়, যেন একটা অপরাধ করিয়াছে। অনেকে অন্যের ভার চুরি করিয়া নিজের বলিয়া চালাইতে এরূপ কুণ্ঠিত হয় না।

ব্যোম কহিল, যেখানে একটা পরাভব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে সেখানে মানুষ আপনার হীনতা-দুঃখ দূর করিবার জন্য একটা ভাবের সম্পর্ক পাতাইয়া লয়। কেবল মানুষের কাছে বলিয়া নয়, সর্ব্বত্রই। পৃথিবীতে প্রথম আগমন করিয়া মানুষ যখন দাবাগ্নি ঝটিকা বন্যার সহিত কিছুতেই পারিয়া উঠিল না, পর্ব্বত যখন শিবের প্রহরী নন্দীর ন্যায় তর্জ্জনী দিয়া পথরোধ পূর্ব্বক নীরবে নীলাকাশ স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, আকাশ যখন স্পর্শাতীত অবিচল মহিমায় অমোঘ ইচ্ছাবলে কখন বৃষ্টি কখন বজ্র বর্ষণ করিতে লাগিল, তখন মানুষ তাহাদের সহিত দেবতা পাতাইয়া বসিল। নহিলে চিরনিবাসভূমি প্রকৃতির সহিত কিছুতেই মানুষের সন্ধিস্থাপন হইত না। অজ্ঞাতশক্তি প্রকৃতিকে যখন সে ভক্তিভাবে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল তখনই মানবাত্মা তাহার মধ্যে গৌরবের সহিত বাস করিতে পারিল।

ক্ষিতি কহিল, মানবাত্মা কোন মতে আপনার গৌরব রক্ষা করিবার জন্য নানাপ্রকার কৌশল করিয়া থাকে সন্দেহ নাই। রাজা যখন যথেচ্ছাচার করে, কিছুতেই তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই; তখন প্রজা তাহাকে দেবতা গড়িয়া হীনতাদুঃখ বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করে। পুরুষ যখন সবল এবং একাধিপত্য করিতে সক্ষম তখন অসহায় স্ত্রী তাহাকে দেবতা দাঁড় করাইয়া তাহার স্বার্থপর নিষ্ঠুর অত্যাচার কথঞ্চিৎ গৌরবের সহিত বহন করিতে চেষ্টা করে। এ কথা স্বীকার করি বটে মানুষের যদি এইরূপ ভাবের দ্বারা অভাব ঢাকিবার ক্ষমতা না থাকিত তবে এতদিনে সে পশুর অধম হইয়া যাইত।

স্রোতস্বিনী ঈষৎ ব্যথিতভাবে কহিল, মানুষ যে কেবল অগত্যা এইরূপ আত্মপ্রতারণা করে তাহা নহে। যেখানে আমরা কোনরূপে অভিভূত নহি বরং আমরাই যেখানে সবল পক্ষ সেখানেও আত্মীয়তা স্থাপনের একটা চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। গাভীকে আমাদের দেশের লোক মা বলিয়া ভগবতী বলিয়া পূজা করে কেন? সে ত অসহায় পশুমাত্র; পীড়ন করিলে তাড়না করিলে তাহার হইয়া দু'কথা বলিবার কেহ নাই। আমরা বলিষ্ঠ, সে দুর্ব্বল, আমরা মানুষ, সে পশু; কিন্তু আমাদের সেই শ্রেষ্ঠতাই আমরা গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছি। যখন তাহার নিকট হইতে উপকার গ্রহণ করিতেছি তখন যে সেটা বলপূর্ব্বক করিতেছি, কেবল আমরা সক্ষম এবং সে নিরুপায় বলিয়াই করিতেছি, আমাদের অন্তরাত্মা সে কথা স্বীকার করিতে চাহে না। সে এই উপকারিণী পরম ধৈর্য্যবতী প্রশান্তা পশুমাতাকে মা বলিয়া তবেই ইহার দুগ্ধ পান করিয়া যথার্থ তৃপ্তি অনুভব করে; মানুষের সহিত পশুর একটি ভাবের সম্পর্ক, একটি সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তবেই তাহার সৃজনচেষ্টা বিশ্রাম লাভ করে।

ব্যোম গম্ভীরভাবে কহিল তুমি একটা খুব বড় কথা কহিয়াছ।

শুনিয়া স্রোতস্বিনী চমকিয়া উঠিল। এমন দুষ্কর্ম্ম কখন্ করিল সে জানিতে পারে নাই। এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সলজ্জ সঙ্কুচিত-ভাবে সে নীরবে মার্জ্জনা প্রার্থনা করিল।

ব্যোম কহিল, ঐ যে আত্মার সৃজনচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়াছ উহার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। মাকড়সা যেমন মাঝখানে থাকিয়া চারিদিকে জাল প্রসারিত করিতে থাকে, আমাদের কেন্দ্রবাসী আত্মা সেইরূপ চারিদিকের সহিত আত্মীয়তা-বন্ধন স্থাপনের জন্য ব্যস্ত আছে; সে ক্রমাগতই বিসদৃশকে সদৃশ, দূরকে নিকট, পরকে আপনার করিতেছে। বসিয়া বসিয়া আত্মপরের মধ্যে সহস্র সেতু নির্ম্মাণ করিতেছে। ঐ যে আমরা যাহাকে সৌন্দর্য্য বলি সেটা তাহার নিজের সৃষ্টি। সৌন্দর্য্য আত্মার সহিত জড়ের মাঝখানকার সেতু। বস্তু কেবল পিণ্ডমাত্র; আমরা তাহা হইতে আহার গ্রহণ করি, তাহাতে বাস করি, তাহার নিকট হইতে আঘাতও প্রাপ্ত হই। তাহাকে যদি পর বলিয়া দেখিতাম তবে বস্তুসমষ্টির মত এমন পর আর কি আছে! কিন্তু আত্মার কার্য্য আত্মীয়তা করা। সে মাঝখানে একটি সৌন্দর্য্য পাতাইয়া বসিল। সে যখন জড়কে বলিল সুন্দর, তখন সেও জড়ের অন্তরে প্রবেশ করিল, জড়ও তাহার অন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল, সে দিন বড়ই পুলকের সঞ্চার হইল। এই সেতুনির্ম্মাণকার্য্য এখনো চলিতেছে। কবির প্রধান গৌরব ইহাই। পৃথিবীতে চারিদিকের সহিত সে আমাদের পুরাতন সম্বন্ধ দৃঢ় ও নব নব সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতেছে। প্রতিদিন পর-পৃথিবীকে আপনার, এবং জড়-পৃথিবীকে আত্মার বাসযোগ্য করিতেছে। বলা বাহুল্য, প্রচলিত ভাষায় যাহাকে জড় বলে আমিও তাহাকে জড় বলিতেছি। জড়ের জড়ত্ব সম্বন্ধে আমার মতামত ব্যক্ত করিতে বসিলে উপস্থিত সভায় সচেতন পদার্থের মধ্যে আমি একমাত্র অবশিষ্ট থাকিব।

সমীর ব্যোমের কথায় বিশেষ মনোযোগ না করিয়া কহিল,

স্রোতস্বিনী কেবল গাম্ভীর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, কিন্তু আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সেদিন যখন দেখিলাম এক ব্যক্তি রৌদ্রে তাতিয়া-পুড়িয়া আসিয়া মাথা হইতে একটা কেরোসিন তেলের শূন্য টিনপাত্র কূলে নামাইয়া মা গো বলিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল, মনে বড় একটু লাগিল। এই যে স্নিগ্ধ সুন্দর সুগভীর জলরাশি সুমিষ্ট কলস্বরে দুই তীরকে স্তনদান করিয়া চলিয়াছে ইহারই শীতল ক্রোড়ে তাপিত শরীর সমর্পণ করিয়া দিয়া ইহাকে মা বলিয়া আহ্বান করা, অন্তরের এমন সুমধুর উচ্ছ্বাস আর কি আছে! এই ফলশস্যসুন্দরা বসুন্ধরা হইতে পিতৃপিতামহ-সেবিত আজন্মপরিচিত বাস্তুগৃহ পর্য্যন্ত যখন স্নেহসজীব আত্মীয়রূপে দেখা দেয় তখন জীবন অত্যন্ত উর্ব্বর সুন্দর হইয়া উঠে। তখন জগতের সঙ্গে সুগভীর যোগসাধন হয়; জড় হইতে জন্তু এবং জন্তু হইতে মানুষ পর্য্যন্ত যে একটি অবিচ্ছেদ্য ঐক্য আছে এ কথা আমাদের কাছে অত্যদ্ভুত বোধ হয় না; কারণ, বিজ্ঞান এ কথার আভাস দিবার পূর্ব্বে আমরা অন্তর হইতে এ কথা জানিয়াছিলাম; পণ্ডিত আসিয়া আমাদের জ্ঞাতিসম্বন্ধের কুলজি বাহির করিবার পূর্ব্বেই আমরা নাড়ির টানে সর্ব্বত্র ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়াছিলাম।

আমাদের ভাষায় "থ্যাঙ্ক" শব্দের প্রতিশব্দ নাই বলিয়া কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত সন্দেহ করেন আমাদের কৃতজ্ঞতা নাই। কিন্তু আমি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতে পাই। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার জন্য আমাদের অন্তর যেন লালায়িত হইয়া আছে। জন্তুর নিকট হইতে যাহা পাই জড়ের নিকট হইতে যাহা পাই তাহাকেও আমরা স্নেহ দয়া উপকার জ্ঞান করিয়া প্রতিদান দিবার জন্য ব্যগ্র হই। যে জাতির লাঠিয়াল আপনার লাঠিকে, ছাত্র আপনার গ্রন্থকে এবং শিল্পী আপনার যন্ত্রকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ লালসায় মনে মনে জীবন্ত করিয়া তোলে, একটা বিশেষ শব্দের অভাবে সে জাতিকে অকৃতজ্ঞ বলা যায় না।

আমি কহিলাম, বলা যাইতে পারে। কারণ, আমরা কৃতজ্ঞতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া গিয়াছি। আমরা যে পরস্পরের নিকট অনেকটা পরিমাণে সাহায্য অসঙ্কোচে গ্রহণ করি অকৃতজ্ঞতা তাহার কারণ নহে, পরস্পরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যভাবের অপেক্ষাকৃত অভাবই তাহার প্রধান কারণ। ভিক্ষুক এবং দাতা, অতিথি এবং গৃহস্থ, আশ্রিত এবং আশ্রয়দাতা, প্রভু এবং ভৃত্যের সম্বন্ধ যেন একটা স্বভাবিক সম্বন্ধ। সুতরাং সে স্থলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক ঋণমুক্ত হইবার কথা কাহারও মনে উদয় হয় না।

ব্যোম কহিল, বিলাতী হিসাবের কৃতজ্ঞতা আমাদের দেবতাদের প্রতিও নাই। য়ুরোপীয় যখন বলে থ্যাঙ্ক্ গড্ তখন তাহার অর্থ এই, ঈশ্বর যখন মনোযোগপূর্ব্বক আমার একটা উপকার করিয়া দিলেন তখন সে উপকারটা স্বীকার না করিয়া বর্ব্বরের মত চলিয়া যাইতে পারি না। আমাদের দেবতাকে আমরা কৃতজ্ঞতা দিতে পারি না, কারণ, কৃতজ্ঞতা দিলে তাঁহাকে অল্প দেওয়া হয়, তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া হয়। তাঁহাকে বলা হয়, তোমার কাজ তুমি করিলে, আমার কর্ত্তব্যও আমি সারিয়া দিয়া গেলাম। বরঞ্চ স্নেহের একপ্রকার অকৃতজ্ঞতা আছে, কারণ, স্নেহের দাবীর অন্ত নাই। সেই স্নেহের অকৃতজ্ঞতাও স্বাতন্ত্র্যের কৃতজ্ঞতা অপেক্ষা গভীরতর মধুরতর। রামপ্রসাদের গান আছে—

> "তোমায় মা মা বলে' আর ডাকিব না,
> আমায় দিয়েছ দিতেছ কত যন্ত্রণা !"

এই উদার অকৃতজ্ঞতা কোন য়ুরোপীয় ভাষায় তর্জ্জমা হইতে পারে না।

ক্ষিতি কটাক্ষসহকারে কহিল, য়ুরোপীয়দের প্রতি আমাদের যে অকৃতজ্ঞতা, তাহারও বোধ হয় একটা গভীর এবং উদার কারণ কিছু থাকিতে পারে। জড়প্রকৃতির সহিত আত্মীয়সম্পর্ক স্থাপন সম্বন্ধে যে কথাগুলি হইল তাহা সম্ভবত অত্যন্ত সুন্দর; এবং গভীর যে, তাহার

আর সন্দেহ নাই, কারণ, এপর্য্যন্ত আমি সম্পূর্ণ তলাইয়া উঠিতে পারি নাই। সকলেই ত একে একে বলিলেন যে, আমরাই প্রকৃতির সহিত ভাবের সম্পর্ক পাতাইয়া বসিয়াছি আর য়ুরোপ তাহার সহিত দূরের লোকের মত ব্যবহার করে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যদি য়ুরোপীয় সাহিত্য ইংরাজি কাব্য আমাদের না জানা থাকিত তবে আজিকার সভায় এ আলোচনা কি সম্ভব হইত? এবং যিনি ইংরাজি কখনো পড়েন নাই তিনি কি শেষ পর্য্যন্ত ইহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিবেন?

আমি কহিলাম, তাহার একটু কারণ আছে। প্রকৃতির সহিত আমাদের যেন ভাইবোনের সম্পর্ক এবং ইংরাজ ভাবুকের যেন স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক। আমরা জন্মাবধিই আত্মীয়, আমরা স্বভাবতই এক। আর ইংরাজ, প্রকৃতির বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশ করিতেছে। সে প্রথমে প্রকৃতিকে জড় বলিয়া জানিত, হঠাৎ একদিন যেন যৌবনারম্ভে তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া তাহার অনির্ব্বচনীয় অপরিমেয় আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিয়াছে। আমরা আবিষ্কার করি নাই, কারণ আমরা সন্দেহও করি নাই, প্রশ্নও করি নাই।

আত্মা অন্য আত্মার সংঘর্ষে তবেই আপনাকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারে, তবেই সে মিলনের আধ্যাত্মিকতা পরিপূর্ণমাত্রায় মন্থিত হইয়া উঠে। একাকার হইয়া থাকা কিছু না থাকার ঠিক পরেই। কোন কবি লিখিয়াছেন, ঈশ্বর আপনারই পিতৃ-অংশ এবং মাতৃ-অংশকে স্ত্রীপুরুষরূপে পৃথিবীতে ভাগ করিয়া দিয়াছেন; সেই দুই বিচ্ছিন্ন অংশ এক হইবার জন্য পরস্পরের প্রতি এমন অনিবার্য্য আনন্দে আকৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু এই বিচ্ছেদটি না হইলে পরস্পরের মধ্যে এমন প্রগাঢ় পরিচয় হইত না। ঐক্য অপেক্ষা মিলনেই আধ্যাত্মিকতা অধিক।

আমরা পৃথিবীকে নদীকে মা বলি, আমরা ছায়াময় বট অশ্বত্থকে

পূজা করি, আমরা প্রস্তরপাষাণকে সজীব করিয়া দেখি, কিন্তু আত্মার মধ্যে তাহার আধ্যাত্মিকতা অনুভব করি না। আমরা তাহাতে মনঃকল্পিত মূর্ত্তি আরোপ করি, আমরা তাহার নিকট সুখসম্পদ সফলতা প্রার্থনা করি। কিন্তু আধ্যাত্মিক সম্পর্ক কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য কেবলমাত্র আনন্দের সম্পর্ক, তাহা সুবিধা অসুবিধা সঞ্চয় অপচয়ের সম্পর্ক নহে। স্নেহসৌন্দর্য্যপ্রবাহিনী জাহ্নবী যখন আত্মার আনন্দ দান করে তখনই সে আধ্যাত্মিক; কিন্তু যখনই তাহাকে মূর্ত্তিবিশেষে নিবদ্ধ করিয়া তাহার নিকট হইতে ইহকাল অথবা পরকালের কোন বিশেষ সুবিধা প্রার্থনা করি তখন তাহা সৌন্দর্য্যহীন মোহ, অন্ধ অজ্ঞানতা মাত্র। তখনি আমরা দেবতাকে পুত্তলিকা করিয়া দিই।

ইহকালের সম্পদ এবং পরকালের পুণ্য, হে জাহ্নবি, আমি তোমার নিকট চাহি না এবং চাহিলেও পাইব না, কিন্তু শৈশবকাল হইতে জীবনের কতদিন সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তে, কৃষ্ণপক্ষের অর্দ্ধচন্দ্রালোকে, ঘনবর্ষার মেঘশ্যামল মধ্যাহ্নে আমার অন্তরাত্মাকে যে এক অবর্ণনীয় অলৌকিক পুলকে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছ সেই আমার দুর্লভ জীবনের আনন্দসঞ্চয়-গুলি যেন জন্মজন্মান্তরে অক্ষয় হইয়া থাকে; পৃথিবী হইতে সমস্ত জীবন যে নিরুপম সৌন্দর্য্য চয়ন করিতে পারিয়াছি যাইবার সময় যেন একখানি পূর্ণশতদলের মত সেটি হাতে করিয়া লইয়া যাইতে পারি এবং যদি আমার প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ হয় তবে তাঁহার করপল্লবে সমর্পণ করিয়া দিয়া একটিবারের মানবজন্ম কৃতার্থ করিতে পারি।

নরনারী।

সমীর এক সমস্যা উত্থাপিত করিলেন, তিনি বলিলেন—ইংরাজি সাহিত্যে গদ্য অথবা পদ্য কাব্যে নায়ক এবং নায়িকা উভয়েরই মাহাত্ম্য পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়। ডেস্‌ডিমোনার নিকট ওথেলো এবং ইয়াগো

কিছুমাত্র হীনপ্রভ নহে, ক্লিয়োপাট্রা আপনার শ্যামল বঙ্কিম বন্ধনজালে অ্যাণ্টনিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি লতাপাশ-বিজড়িত ভগ্নজয়স্তম্ভের ন্যায় অ্যাণ্টনির উচ্চতা সর্ব্বসমক্ষে দৃশ্যমান রহিয়াছে। লামার্ম্মুরের নায়িকা আপনার সকরুণ, সরল সুকুমার সৌন্দর্য্যে যতই আমাদের মনোহরণ করুক না কেন, রেভ্‌ন্‌স্‌উডের বিষাদ-ঘনঘোর নায়কের নিকট হইতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে না। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় নায়িকারই প্রাধান্য। কুন্দনন্দিনী এবং সূর্য্যমুখীর নিকট নগেন্দ্র ম্লান হইয়া আছে, রোহিণী এবং ভ্রমরের নিকট গোবিন্দলাল অদৃশ্যপ্রায়, জ্যোতির্ম্ময়ী কপালকুণ্ডলার পার্শ্বে নবকুমার ক্ষীণতম উপগ্রহের ন্যায়। প্রাচীন বাংলা কাব্যেও দেখ।—বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে সজীব মূর্ত্তি যদি কাহারও থাকে তবে সে কেবল বিদ্যার ও মালিনীর, সুন্দর-চরিত্রে পদার্থের লেশমাত্র নাই। কবিকঙ্কণচণ্ডীর মধ্যে কেবল ফুল্লরা এবং খুল্লনা একটু নড়িয়া বেড়ায়, নতুবা ব্যাধটা একটা বিকৃত বৃহৎ স্থাণুমাত্র এবং ধনপতি ও তাহার পুত্র কোন কাজের নহে। বঙ্গসাহিত্যে পুরুষ মহাদেবের ন্যায় নিশ্চলভাবে ধূলিশয়ান এবং রমণী তাহার বক্ষের উপর জাগ্রত জীবন্তভাবে বিরাজমান। ইহার কারণ কি?

সমীরের এই প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জন্য স্রোতস্বিনী অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন এবং দীপ্তি নিতান্ত অমনোযোগের ভাণ করিয়া টেবিলের উপর একটা গ্রন্থ খুলিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

ক্ষিতি কহিলেন, তুমি বঙ্কিম বাবুর যে কয়েকখানি উপন্যাসের উল্লেখ করিয়াছ সবগুলিই মানসপ্রধান, কার্য্যপ্রধান নহে; মানসজগতে স্ত্রী-লোকের প্রভাব অধিক, কার্য্যজগতে পুরুষের প্রভুত্ব। যেখানে কেবল-মাত্র হৃদয়বৃত্তির কথা সেখানে পুরুষ স্ত্রীলোকের সহিত পারিয়া উঠিবে কেন? কার্য্যক্ষেত্রেই তাহার চরিত্রের যথার্থ বিকাশ হয়।

দীপ্তি আর থাকিতে পারিল না—গ্রন্থ ফেলিয়া এবং ঔদাসীন্যের ভাণ পরিহার করিয়া বলিয়া উঠিল—কেন? দুর্গেশনন্দিনীতে বিমলার চরিত্র কি কার্য্যেই বিকশিত হয় নাই? এমন নৈপুণ্য, এমন তৎপরতা, এমন অধ্যবসায় উক্ত উপন্যাসের কয়জন নায়ক দেখাইতে পারিয়াছে? আনন্দমঠ ত কার্য্যপ্রধান উপন্যাস। সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ভবানন্দ প্রভৃতি সন্তানসম্প্রদায় তাহাতে কাজ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা কবির বর্ণনা মাত্র, যদি কাহারও চরিত্রের মধ্যে যথার্থ কার্য্যকারিতা পরিস্ফুট হইয়া থাকে তাহা শান্তির। দেবীচৌধুরাণীতে কে কর্ত্রীত্বপদ লইয়াছে? রমণী। কিন্তু সে কি অন্তঃপুরের কর্ত্রীত্ব? নহে।

সমীর কহিলেন, ভাই ক্ষিতি, তর্কশাস্ত্রের সরল রেখার দ্বারা সমস্ত জিনিষকে পরিপাটিরূপে শ্রেণীবিভক্ত করা যায় না। সতরঞ্চ ফলকেই ঠিক লাল কাল রঙের সমান চক কাটিয়া ঘর আঁকিয়া দেওয়া যায়, কারণ, তাহা নির্জ্জীব কাষ্ঠমূর্ত্তির রঙ্গভূমি মাত্র; কিন্তু মনুষ্যচরিত্র বড় সিধা জিনিষ নহে; তুমি যুক্তিবলে ভাবপ্রধান কর্ম্মপ্রধান প্রভৃতি তাহার যেমনই অকাট্য সীমা নির্ণয় করিয়া দেও না কেন, বিপুল সংসারের বিচিত্র কার্য্যক্ষেত্রে সমস্তই উলটপালট হইয়া যায়। সমাজের লৌহকটাহের নিম্নে যদি জীবনের অগ্নি না জ্বলিত, তবে মনুষ্যের শ্রেণীবিভাগ ঠিক সমান অটলভাবে থাকিত। কিন্তু জীবনশিখা যখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তখন টগ্‌বগ্ করিয়া সমস্ত মানবচরিত্র ফুটিতে থাকে, তখন নবনব বিস্ময়জনক বৈচিত্র্যের আর সীমা থাকে না। সাহিত্য সেই পরিবর্ত্তমান জগতের চঞ্চল প্রতিবিম্ব। তাহাকে সমালোচনশাস্ত্রের বিশেষণ দিয়া বাঁধিবার চেষ্টা মিথ্যা। হৃদয়-বৃত্তিতে স্ত্রীলোকই শ্রেষ্ঠ এমন কেহ লিখিয়া পড়িয়া দিতে পারে না। ওথেলো ত মানসপ্রধান নাটক, কিন্তু তাহাতে নায়কের হৃদয়াবেগের প্রবলতা কি প্রচণ্ড! কিং লিয়ারে হৃদয়ের ঝটিকা কি ভয়ঙ্কর।

ব্যোম সহসা অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আহা, তোমরা বৃথা তর্ক করিতেছ। যদি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখ, তবে দেখিবে কার্য্যই স্ত্রীলোকের। কার্য্যক্ষেত্র ব্যতীত স্ত্রীলোকের অন্যত্র স্থান নাই। যথার্থ পুরুষ যোগী, উদাসীন, নির্জ্জনবাসী। ক্যাল্‌ডিয়ার মরুক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়া পড়িয়া মেষপাল পুরুষ যখন একাকী ঊর্দ্ধনেত্রে নিশীথগগণের গ্রহতারকার গতিবিধি নির্ণয় করিত, তখন সে কি সুখ পাইত। কোন্ নারী এমন অকাজে কালক্ষেপ করিতে পারে? যে জ্ঞান কোন কার্য্যে লাগিবে না কোন নারী তাহার জন্য জীবন ব্যয় করে? যে ধ্যান কেবলমাত্র সংসারনির্ম্মুক্ত আত্মার বিশুদ্ধ আনন্দজনক, কোন্ রমণীর কাছে তাহার মূল্য আছে? ক্ষিতির কথামত পুরুষ যদি যথার্থ কার্য্যশীল হইত, তবে মনুষ্য সমাজের এমন উন্নতি হইত না। তবে একটি নূতন তত্ত্ব একটি নূতন ভাব বাহির হইত না। নির্জ্জনের মধ্যে, অবসরের মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ, ভাবের আবির্ভাব। যথার্থ পুরুষ সর্ব্বদাই সেই নির্লিপ্ত নির্জ্জনতার মধ্যে থাকে। কার্য্যবীর নেপোলিয়ানও কখনই আপনার কার্য্যের মধ্যে সংলিপ্ত হইয়া থাকিতেন না; তিনি যখন যেখানেই থাকুন একটা মহা-নির্জ্জনে আপন ভাবাকাশের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকিতেন— তিনি সর্ব্বদাই আপনার একটা মস্ত আইডিয়ার দ্বারা পরিরক্ষিত হইয়া তুমুল কার্য্যক্ষেত্রের মাঝখানেও বিজনবাস যাপন করিতেন। ভীষ্ম ত কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের একজন নায়ক কিন্তু সেই ভীষণ জন-সংঘাতের মধ্যেও তাঁহার মত একক প্রাণী আর কে ছিল! তিনি কি কাজ করিতেছিলেন, না ধ্যান করিতেছিলেন? স্ত্রীলোকই যথার্থ কাজ করে। সে ও তাহার কাজের মাঝখানে কোন ব্যবধান নাই। সে একেবারে কাজের মধ্যে লিপ্ত জড়িত। সেই যথার্থ লোকালয়ে বাস করে, সংসার রক্ষা করে। স্ত্রীলোকই যথার্থ সম্পূর্ণরূপে সঙ্গদান করিতে পারে, তাহার যেন অব্যবহিত স্পর্শ পাওয়া যায়, সে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে না।

দীপ্তি কহিল, তোমার সমস্ত সৃষ্টিছাড়া কথা—কিছুই বুঝিবার জো নাই। মেয়েরা যে, কাজ করিতে পারে না এ কথা আমি বলি না, তোমরা তাহাদের কাজ করিতে দাও কই?

ব্যোম কহিলেন, স্ত্রীলোকেরা আপনার কর্ম্মবন্ধনে আপনি বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। জলন্ত অঙ্গার যেমন আপনার ভস্ম আপনি সঞ্চয় করে, নারী তেমনি আপনার স্তূপাকার কার্য্যাবশেষের দ্বারা আপনাকে নিহিত করিয়া ফেলে—সেই তাহার অন্তঃপুর—তাহার চারিদিকে কোন অবসর নাই। তাহাকে যদি ভস্মমুক্ত করিয়া বহিঃসংসারের কার্য্যরাশির মধ্যে নিক্ষেপ করা যায় তবে কি কম কাণ্ড হয়! পুরুষের সাধ্য কি তেমন দ্রুতবেগে তেমন তুমুল ব্যাপার করিয়া তুলিতে! পুরুষের কাজ করিতে বিলম্ব হয়; সে এবং তাহার কার্য্যের মাঝখানে একটা দীর্ঘ পথ থাকে, সে পথ বিস্তর চিন্তার দ্বারা আকীর্ণ। রমণী যদি একবার বহির্বিপ্লবে যোগ দেয়, নিমেষের মধ্যে সমস্ত ধূধূ করিয়া উঠে। এই প্রলয়কারিণী কার্য্যশক্তিকে সংসার বাঁধিয়া রাখিয়াছে, এই অগ্নিতে কেবল শয়নগৃহের সন্ধ্যাদীপ জ্বলিতেছে, শীতার্ত্ত প্রাণীর শীত নিবারণ ও ক্ষুধার্ত্ত প্রাণীর অন্ন প্রস্তুত হইতেছে। যদি আমাদের সাহিত্যে এই সুন্দরী বহ্নিশিখাগুলির তেজ দীপ্যমান হইয়া থাকে তবে তাহা লইয়া এত তর্ক কিসের জন্য!

আমি কহিলাম আমাদের সাহিত্যে স্ত্রীলোক যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের স্ত্রীলোক আমাদের দেশের পুরুষের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।

স্রোতস্বিনীর মুখ ঈষৎ রক্তিম এবং সহাস্য হইয়া উঠিল। দীপ্তি কহিল, এ আবার তোমার বাড়াবাড়ি।

বুঝিলাম দীপ্তির ইচ্ছা আমাকে প্রতিবাদ করিয়া স্বজাতির গুণগান বেশী করিয়া শুনিয়া লইবে। আমি তাহাকে সে কথা বলিলাম, এবং

কহিলাম স্ত্রীজাতি স্তুতিবাক্য শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসে। দীপ্তি সবলে মাথা নাড়িয়া কহিল, কখনই না।

স্রোতস্বিনী মৃদুভাবে কহিল—সে কথা সত্য। অপ্রিয় বাক্য আমাদের কাছে অত্যন্ত অধিক অপ্রিয় এবং প্রিয় বাক্য আমাদের কাছে বড় বেশী মধুর।

স্রোতস্বিনী রমণী হইলেও সত্য কথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

আমি কহিলাম, তাহার একটু কারণ আছে। গ্রন্থকারদের মধ্যে কবি এবং গুণীদের মধ্যে গায়কগণ বিশেষরূপে স্তুতি-মিষ্টান্নপ্রিয়। আসল কথা, মনোহরণ করা যাহাদের কাজ, প্রশংসাই তাহাদের কৃতকার্য্যতা পরিমাপের একমাত্র উপায়। অন্য সমস্ত কার্য্যফলের নানারূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে, স্তুতিবাদলাভ ছাড়া মনোরঞ্জনের আর কোন প্রমাণ নাই। সেই জন্য গায়ক প্রত্যেকবার সমের কাছে আসিয়া বাহবা প্রত্যাশা করে। সেই জন্য অনাদর গুণীমাত্রের কাছে এত অধিক অপ্রীতিকর।

সমীর কহিলেন—কেবল তাহাই নয়, নিরুৎসাহ মনোহরণকার্য্যের একটি প্রধান অন্তরায়। শ্রোতার মনকে অগ্রসর দেখিলে তবেই গায়কের মন আপনার সমস্ত ক্ষমতা বিকশিত করিতে পারে। অতএব, স্তুতিবাদ শুদ্ধ যে তাহার পুরস্কার তাহা নহে, তাহার কার্য্যসাধনের একটি প্রধান অঙ্গ।

আমি কহিলাম, স্ত্রীলোকেরও প্রধান কার্য্য আনন্দদান করা। তাহার সমস্ত অস্তিত্বকে সঙ্গীত ও কবিতার ন্যায় সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যময় করিয়া তুলিলে তবে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সেই জন্যই স্ত্রীলোক স্তুতিবাদে বিশেষ আনন্দলাভ করে। কেবল অহঙ্কারপরিতৃপ্তির জন্য নহে; তাহাতে সে আপনার জীবনের সার্থকতা অনুভব করে। ত্রুটি অসম্পূর্ণতা দেখাইলে একেবারে তাহাদের মর্ম্মের মূলে গিয়া আঘাত করে। এই জন্য লোকনিন্দা স্ত্রীলোকের নিকট বড় ভয়ানক।

ক্ষিতি কহিলেন—তুমি যাহা বলিলে দিব্য কবিত্ব করিয়া বলিলে, শুনিতে বেশ লাগিল, কিন্তু আসল কথাটা এই যে, স্ত্রীলোকের কার্য্যের পরিসর সঙ্কীর্ণ। বৃহৎ দেশে ও বৃহৎকালে তাহার স্থান নাই। উপস্থিত-মত স্বামী পুত্র আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীদিগকে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেই তাহার কর্ত্তব্য সাধিত হয়। যাহার জীবনের কার্য্যক্ষেত্র দূরদেশ ও দূরকালে বিস্তীর্ণ, যাহার কর্ম্মের ফলাফল সকল সময় আশু প্রত্যক্ষগোচর নহে, নিকটের লোকের ও বর্ত্তমান কালের নিন্দাস্তুতির উপর তাহার তেমন একান্ত নির্ভর নহে, সুদূর আশা ও বৃহৎ কল্পনা, অনাদর উপেক্ষা ও নিন্দার মধ্যেও তাহাকে অবিচলিত বল প্রদান করিতে পারে। লোকনিন্দা, লোকস্তুতি, সৌভাগ্যগর্ব্ব এবং মান-অভিমানে স্ত্রীলোককে যে এমন বিচলিত করিয়া তোলে তাহার প্রধান কারণ, জীবন লইয়া তাহাদের নগদ কারবার, তাহাদের সমুদায় লাভলোকসান বর্ত্তমানে, হাতে হাতে যে ফলপ্রাপ্ত হয় তাহাই তাহাদের একমাত্র পাওনা; এই জন্য তাহারা কিছু কষাকষি করিয়া আদায় করিতে চায়, এক কানাকড়ি ছাড়িতে চায় না।

দীপ্তি বিরক্ত হইয়া য়ুরোপ ও আমেরিকার বড় বড় বিশ্বহিতৈষিণী রমণীর দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। স্রোতস্বিনী কহিলেন, বৃহত্ত্ব ও মহত্ত্ব সকল সময়ে এক নহে। আমরা বৃহৎক্ষেত্রে কার্য্য করি না বলিয়া আমাদের কার্য্যের গৌরব অল্প এ কথা আমি কিছুতেই মনে করিতে পারি না। পেশী, স্নায়ু, অস্থিচর্ম্ম বৃহৎ স্থান অধিকার করে, মর্ম্মস্থানটুকু অতি ক্ষুদ্র এবং নিভৃত। আমরা সমস্ত মানবসমাজের সেই মর্ম্মকেন্দ্রে বিরাজ করি। পুরুষদেবতাগণ বৃষ মহিষ প্রভৃতি বলবান পশুবাহন আশ্রয় করিয়া ভ্রমণ করেন, স্ত্রীদেবীগণ হৃদয়-শতদলবাসিনী, তাঁহারা একটি বিকশিত ধ্রুব সৌন্দর্য্যের মাঝখানে পরিপূর্ণ মহিমায় সমাসীন। পৃথিবীতে যদি পুনর্জ্জন্মলাভ করি তবে আমি যেন পুনরায়

নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করি, যেন ভিখারি না হইয়া অন্নপূর্ণা হই। একবার ভাবিয়া দেখ, সমস্ত মানবসংসারের মধ্যে প্রতি দিবসের রোগশোক, ক্ষুধাশ্রান্তি কত বৃহৎ, প্রতিমুহূর্ত্তে কর্ম্মচক্রোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশি কত স্তূপাকার হইয়া উঠিতেছে; প্রতি গৃহের রক্ষাকার্য্য কত অসীমপ্রীতিসাধ্য; যদি কোন প্রসন্নমূর্ত্তি, প্রফুল্লমুখী, ধৈর্য্যময়ী লোকবৎসলা দেবী প্রতিদিবসের শিয়রে বাস করিয়া তাহার তপ্ত ললাটে স্নিগ্ধস্পর্শ দান করেন, আপনার কার্য্যকুশল সুন্দর হস্তের দ্বারা প্রত্যেক মুহূর্ত্ত হইতে তাহার মলিনতা দূর করেন এবং প্রত্যেক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া অশ্রান্ত স্নেহে তাহার কল্যাণ ও শান্তি বিধান করিতে থাকেন, তবে তাঁহার কার্য্যস্থল সঙ্কীর্ণ বলিয়া তাঁহার মহিমা কে অস্বীকার করিতে পারে? যদি সেই লক্ষ্মীমূর্ত্তির আদর্শখানি হৃদয়ের মধ্যে উজ্জ্বল করিয়া রাখি, তবে নারীজন্মের প্রতি আর অনাদর জন্মিতে পারে না।

ইহার পর আমরা সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। এই অকস্মাৎ নিস্তব্ধতায় স্রোতস্বিনী অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিয়া আমাকে বলিলেন, তুমি আমাদের দেশের স্ত্রীলোকের কথা কি বলিতেছিলে— মাঝে হইতে অন্য তর্ক আসিয়া সে কথা চাপা পড়িয়া গেল।

আমি কহিলাম—আমি বলিতেছিলাম, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা আমাদের পুরুষের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ।

ক্ষিতি কহিলেন, তাহার প্রমাণ?

আমি কহিলাম, প্রমাণ হাতে হাতে। প্রমাণ ঘরে ঘরে। প্রমাণ অন্তরের মধ্যে। পশ্চিমে ভ্রমণ করিবার সময় কোন কোন নদী দেখা যায়, যাহার অধিকাংশে তপ্ত শুষ্ক বালুকা ধূধূ করিতেছে—কেবল একপার্শ্ব দিয়া স্ফটিকস্বচ্ছসলিলা স্নিগ্ধ নদীটি অতি নম্রমধুর স্রোতে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। সেই দৃশ্য দেখিলে আমাদের সমাজ মনে

পড়ে। আমরা অকর্ম্মণ্য নিস্ফল নিশ্চল বালুকারাশি স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছি, প্রত্যেক সমীরশ্বাসে হুহু করিয়া উড়িয়া যাইতেছি এবং যে কোন কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিতেছি তাহাই দুই দিনে ধসিয়া ধসিয়া পড়িয়া যাইতেছে। আর আমাদের বামপার্শ্বে আমাদের রমণীগণ নিম্নপথ দিয়া বিনম্র সেবিকার মত আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া স্বচ্ছ সুধাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া চলিতেছে। তাহাদের এক মুহূর্ত্ত বিরাম নাই। তাহাদের গতি, তাহাদের প্রীতি, তাহাদের সমস্তজীবন এক ধ্রুব লক্ষ্য ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে। আমরা লক্ষ্যহীন, ঐক্যহীন, সহস্র পদতলে দলিত হইয়াও মিলিত হইতে অক্ষম। যে দিকে জলস্রোত, যে দিকে আমাদের নারীগণ, কেবল সেইদিকে সমস্ত শোভা, ছায়া এবং সফলতা, এবং যে দিকে আমরা, সেদিকে কেবল মরুচাকচিক্য, বিপুল শূন্যতা এবং দগ্ধ দাস্যবৃত্তি। সমীর তুমি কি বল?

সমীর স্রোতস্বিনী ও দীপ্তির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া হাসিয়া কহিলেন—অদ্যকার সভায় নিজেদের অসারতা স্বীকার করিবার দুইটি মূর্ত্তিমতী বাধা বর্ত্তমান। আমি তাঁহাদের নাম করিতে চাহি না। বিশ্বসংসারের মধ্যে বাঙালী পুরুষের আদর কেবল আপন অন্তঃপুরের মধ্যে। সেখানে তিনি কেবলমাত্র প্রভু নহেন, তিনি দেবতা। আমরা যে দেবতা নহি, তৃণ ও মৃত্তিকার পুত্তলিকামাত্র, সে কথা আমাদের উপাসকদের নিকট প্রকাশ করিবার প্রয়োজন কি ভাই? ঐ যে আমাদের মুগ্ধ বিশ্বস্ত ভক্তটি আপন হৃদয়কুঞ্জের সমুদয় বিকশিত সুন্দর পুষ্প সোনার থালে সাজাইয়া আমাদের চরণতলে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে, ও কোথায় ফিরাইয়া দিব? আমাদিগকে দেবসিংহাসনে বসাইয়া ঐ যে চিরব্রতধারিণী সেবিকাটি আপন নিভৃত নিত্য প্রেমের সন্ধ্যাদীপটি লইয়া আমাদের এই গৌরবহীন মুখের চতুর্দ্দিকে অনন্ত অতৃপ্তিভরে

শত সহস্রবার প্রদক্ষিণ করাইয়া আরতি করিতেছে, উহার কাছে যদি খুব উচ্চ হইয়া না বসিয়া রহিলাম, নীরবে পূজা না গ্রহণ করিলাম তবে উহাদেরই বা কোথায় সুখ আর আমাদেরই বা কোথায় সম্মান! যখন ছোট ছিল তখন মাটির পুতুল লইয়া এম্‌নিভাবে খেলা করিত যেন তাহার প্রাণ আছে, যখন বড় হইল তখন মানুষপুতুল লইয়া এম্‌নি ভাবে পূজা করিতে লাগিল যেন তাহার দেবত্ব আছে—তখন যদি কেহ তাহার খেলার পুতুল ভাঙিয়া দিত তবে কি বালিকা কাঁদিত না, এখন যদি কেহ ইহার পূজার পুতুল ভাঙিয়া দেয় তবে কি রমণী ব্যথিত হয় না? যেখানে মনুষ্যত্বের যথার্থ গৌরব আছে সেখানে মনুষ্যত্ব বিনা ছদ্মবেশে সম্মান আকর্ষণ করিতে পারে, যেখানে মনুষ্যত্বের অভাব সেখানে দেবত্বের আয়োজন করিতে হয়। পৃথিবীতে কোথাও যাহাদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা নাই তাহারা কি সামান্য মানবভাবে স্ত্রীর নিকট সম্মান প্রত্যাশা করিতে পারে? কিন্তু আমরা যে এক একটি দেবতা, সেইজন্য এমন সুন্দর সুকুমার হৃদয়গুলি লইয়া অসঙ্কোচে আপনার পঙ্কিল চরণের পাদপীঠ নির্ম্মাণ করিতে পারিয়াছি।

দীপ্তি কহিলেন, যাহার যথার্থ মনুষ্যত্ব আছে, সে মানুষ হইয়া দেবতার পূজা গ্রহণ করিতে লজ্জা অনুভব করে এবং যদি পূজা পায় তবে আপনাকে সেই পূজার যোগ্য করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বাংলা দেশে দেখা যায়, পুরুষসম্প্রদায় আপন দেবত্ব লইয়া নির্লজ্জভাবে আস্ফালন করে। যাহার যোগ্যতা যত অল্প তাহার আড়ম্বর তত বেশী। আজকাল স্ত্রীদিগকে পতিমাহাত্ম্য পতিপূজা শিখাইবার জন্য পুরুষগণ কায়মনোবাক্যে লাগিয়াছেন। আজকাল নৈবেদ্যের পরিমাণ কিঞ্চিৎ কমিয়া আসিতেছে বলিয়া তাঁহাদের আশঙ্কা জন্মিতেছে। কিন্তু পত্নীদিগকে পূজা করিতে শিখানো অপেক্ষা পতিদিগকে দেবতা হইতে শিখাইলে কাজে লাগিত। পতিদেবপূজা হ্রাস হইতেছে বলিয়া যাঁহারা আধুনিক স্ত্রীলোকদিগকে

পরিহাস করেন, তাঁহাদের যদি লেশমাত্র রসবোধ থাকিত তবে সে বিদ্রূপ ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাদের নিজেকে বিদ্ধ করিত! হায় হায়, বাঙালীর মেয়ে পূর্ব্বজন্মে কত পুণ্যই করিয়াছিল তাই এমন দেবলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে! কিবা দেবতার শ্রী! কিবা দেবতার মাহাত্ম্য।

স্রোতস্বিনীর পক্ষে ক্রমে অসহ্য হইয়া আসিল। তিনি মাথা নাড়িয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—তোমরা উত্তরোত্তর স্বর এম্‌নি নিখাদে চড়াইতেছ যে, আমাদের স্তবগানের মধ্যে যে মাধুর্য্যটুকু ছিল তাহা ক্রমেই চলিয়া যাইতেছে। এ কথা যদি বা সত্য হয় যে, আমরা তোমাদের যতটা বাড়াই তোমরা তাহার যোগ্য নহ, তোমরাও কি আমাদিগকে অযথারূপে বাড়াইয়া তুলিতেছ না? তোমরা যদি দেবতা না হও, আমরাও দেবী নহি। আমরা যদি উভয়েই আপোষের দেবদেবী হই, তবে আর ঝগড়া করিবার প্রয়োজন কি? তা'ছাড়া আমাদের ত সকল গুণ নাই—হৃদয়-মাহাত্ম্যে যদি আমরা শ্রেষ্ঠ হই, মনোমাহাত্ম্যে ত তোমরা বড়।

আমি কহিলাম—মধুর কণ্ঠস্বরে এই স্নিগ্ধ কথাগুলি বলিয়া তুমি বড় ভাল করিলে, নতুবা দীপ্তির বাক্যবাণবর্ষণের পর সত্যকথা বলা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। দেবি, তোমরা কেবল কবিতার মধ্যে দেবী, মন্দিরের মধ্যে আমরা দেবতা। দেবতার ভোগ যাহা কিছু সে আমাদের, আর তোমাদের জন্য কেবল মনুসংহিতা হইতে দুইখানি কিম্বা আড়াইখানি মাত্র মন্ত্র আছে। তোমরা আমাদের এমনি দেবতা যে, তোমরা যে সুখস্বাস্থ্যসম্পদের অধিকারী এ কথা মুখে উচ্চারণ করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। সমগ্র পৃথিবী আমাদের, অবশিষ্ট-ভাগ তোমাদের; আহারের বেলা আমরা, উচ্ছিষ্টের বেলা তোমরা। প্রকৃতির শোভা, মুক্ত বায়ু, স্বাস্থ্যকর ভ্রমণ আমাদের এবং দুর্লভ মানবজন্ম ধারণ করিয়া কেবল গৃহের কোণ, রোগের শয্যা এবং বাতায়নের প্রান্ত তোমাদের! আমরা দেবতা হইয়া সমস্ত পদসেবা পাই

এবং তোমরা দেবী হইয়া সমস্ত পদপীড়ন সহ্য কর—প্রণিধান করিয়া দেখিলে এ দুই দেবত্বের মধ্যে প্রভেদ লক্ষিত হইবে।

সমীরণ কহিলেন, বঙ্গসাহিত্যে স্ত্রীচরিত্রের প্রাধান্য, তাহার কারণ, বঙ্গসমাজে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য।

আমি কহিলাম, বঙ্গদেশে পুরুষের কোন কাজ নাই। এদেশে গার্হস্থ্য ছাড়া আর কিছু নাই, সেই গৃহগঠন এবং গৃহবিচ্ছেদ স্ত্রীলোকেই করিয়া থাকে। আমাদের দেশে ভাল মন্দ সমস্ত শক্তি স্ত্রীলোকের হাতে; আমাদের রমণীরা সেই শক্তি চিরকাল চালনা করিয়া আসিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র ছিপছিপে তকৃতকে ষ্টীমনৌকা যেমন বৃহৎ বোঝাইভরা গাধাবোটটাকে স্রোতের অনুকূলে ও প্রতিকূলে টানিয়া লইয়া চলে, তেমনি আমাদের দেশের গৃহিণী, লোকলৌকিকতা আত্মীয় কুটুম্বিতাপরিপূর্ণ বৃহৎসংসার এবং স্বামী নামক একটি চলৎশক্তিরহিত অনাবশ্যক বোঝা পশ্চাতে টানিয়া লইয়া আসিয়াছে। অন্যদেশে পুরুষেরা সন্ধি বিগ্রহ রাজ্যচালনা প্রভৃতি বড় বড় পুরুষোচিত কার্য্যে বহুকাল ব্যাপৃত থাকিয়া নারীদের হইতে স্বতন্ত্র একটি প্রকৃতি গঠিত করিয়া তোলে। আমাদের দেশে পুরুষেরা গৃহপালিত, মাতৃলালিত, পত্নীচালিত। কোন বৃহৎভাব, বৃহৎকার্য্য, বৃহৎক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদের জীবনের বিকাশ হয় নাই; অথচ স্বাধীনতার পীড়ন, দাসত্বের হীনতা, দুর্ব্বলতার লাঞ্ছনা তাহাদিগকে নতশিরে সহ্য করিতে হইয়াছে। তাহাদিগকে পুরুষের কোন কর্ত্তব্য করিতে হয় নাই এবং কাপুরুষের সমস্ত অপমান বহিতে হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে স্ত্রীলোককে কখনো বাহিরে গিয়া কর্ত্তব্য খুঁজিতে হয় না, তরুশাখায় ফলপুষ্পের মত কর্ত্তব্য তাহার হাতে আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। সে যখনি ভাল বাসিতে আরম্ভ করে, তখনি তাহার কর্ত্তব্য আরম্ভ হয়; তখনি তাহার চিন্তা, বিবেচনা, যুক্তি, কার্য্য, তাহার সমস্ত চিত্তবৃত্তি সজাগ হইয়া উঠে; তাহার সমস্ত চরিত্র

উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে থাকে। বাহিরের কোন রাষ্ট্রবিপ্লব তাহার কার্য্যের ব্যাঘাত করে না, তাহার গৌরবের হ্রাস করে না, জাতীয় অধীনতার মধ্যেও তাহার তেজ রক্ষিত হয়।

স্রোতস্বিনীর দিকে ফিরিয়া কহিলাম, আজ আমরা একটি নূতন শিক্ষা এবং বিদেশী ইতিহাস হইতে পুরুষকারের নূতন আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া বাহিরের কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হইতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু ভিজা কাষ্ঠ জলে না, মরিচা-ধরা চাকা চলেনা; যত জ্বলে তাহার চেয়ে ধোঁয়া বেশী হয়, যত চলে তার চেয়ে শব্দ বেশী করে। আমরা চিরদিন অকর্ম্মণ্যভাবে কেবল দলাদলি, কানাকানি করিয়াছি, তোমরা চিরকাল তোমাদের কাজ করিয়া আসিয়াছ। এইজন্য চরিত্র বলিয়া তোমাদের একটা নিজের জিনিষ আছে, একটা পাত্র আছে। নিজের জিনিষ না থাকিলে পরের জিনিষ গ্রহণ করা যায় না, এবং গ্রহণ করিয়া আপনার করা যায় না। এইজন্য এখনো আমাদের ভার তোমাদিগকে লইতে হইবে। আমাদিগকে কার্য্যে নিয়োগ করিতে, আমাদের বাহ্যাড়ম্বর দূর করিতে, আমাদের আতিশয্য হ্রাস করিতে, আমাদের মিথ্যা দর্প চূর্ণ করিতে, আমাদের বিশ্বাস সজীব রাখিতে এবং চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দেশকালের সহিত আমাদের সামঞ্জস্যসাধন করাইয়া দিতে হইবে। এক কথায়, দেশের সমুদায় গাধাবোটগুলিকে এখনো তোমাদের জিম্মায় লইতে হইবে। ইহারা একটু একটু বাক্যবায়ুর পাল উড়াইতে শিখিয়াছে বলিয়া যে মস্ত হইয়াছে তাহা মনে করিয়ো না—ইহাদের মধ্যে একটা আত্মশক্তি, একটা আত্মসম্মান, একটা সুনিয়মিত তেজের আবশ্যক। গলায় সাহেবী "টাই" এবং পৃষ্ঠে সাহেবের থাবড়া আমাদের পক্ষে সম্মানকর নহে, কখনো সুমিষ্ট কখনো তীব্রকণ্ঠে এই শিক্ষা তোমরা না দিলে আর উপায় দেখি না। এই পোষা পশুর গলার চক্‌চকে শিকলটি কাটিয়া দাও এবং ইহার দীর্ঘ কর্ণটি ধরিয়া

তন্মধ্যে এই মন্ত্রটি প্রবেশ করাইয়া দাও যে, অন্নব্যঞ্জন যেমন আহার করিবার পক্ষেই পবিত্র কিন্তু কপালে মাথায় লেপিয়া অন্নশালী বলিয়া পরিচয় দিবার পক্ষে অপবিত্র, শিক্ষা তেমনি গায়ে মাথায় মাখিবার নহে, জীর্ণ করিয়া মনের উন্নতিসাধন করিবার এবং কাজে খাটাইবার।

স্রোতস্বিনী আর কিছু না বলিয়া সকৃতজ্ঞ স্নেহদৃষ্টির দ্বারা আমার ললাট স্পর্শ করিয়া গৃহকার্য্যে চলিয়া গেল।

পল্লিগ্রামে।

এখন ভাদ্রমাসে চতুর্দ্দিক জলমগ্ন—কেবল ধান্যক্ষেত্রের মাথাগুলি অল্পই জাগিয়া আছে। বহুদূরে দূরে এক একখানি তরুবেষ্টিত গ্রাম উচ্চভূমিতে দ্বীপের মত দেখা যাইতেছে।

এখানকার মানুষগুলি এমনি অনুরক্ত ভক্তস্বভাব এমনি সরল বিশ্বাসপরায়ণ যে, মনে হয় আডাম ও ইভ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পূর্ব্বেই ইহাদের বংশের আদিপুরুষকে জন্মদান করিয়াছিলেন। সেইজন্য সয়তান যদি ইহাদের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করে তাহাকেও ইহারা শিশুর মত বিশ্বাস করে এবং মান্য অতিথির মত নিজের আহারের অংশ দিয়া সেবা করিয়া থাকে।

এই মানুষগুলির স্নিগ্ধ হৃদয়াশ্রমে যখন বাস করিতেছি এমন সময়ে আমাদের পঞ্চভূত-সভার কোন একটি সভ্য আমাকে কতকগুলি খবরের কাগজের টুকরা কাটিয়া পাঠাইয়া দিলেন। পৃথিবী যে ঘুরিতেছে স্থির হইয়া নাই তাহাই স্মরণ করাইয়া দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি লণ্ডন হইতে প্যারিস হইতে গুটিকতক সংবাদের ঘূর্ণাবাতাস সংগ্রহ করিয়া ডাকযোগে এই জলনিমগ্ন শ্যামসুকোমল ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

একপ্রকার ভালই করিয়াছেন। কাগজগুলি পড়িয়া আমার অনেক কথা মনে উদয় হইল, যাহা কলিকাতায় থাকিলে আমার ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম হইত না।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, এখানকার এই যে সমস্ত নিরক্ষর নির্ব্বোধ চাষাভুষার দল—থিওরিতে আমি ইহাদিগকে অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া অবজ্ঞা করি, কিন্তু কাছে আসিয়া প্রকৃতপক্ষে আমি ইহাদিগকে আত্মীয়ের মত ভালবাসি, এবং ইহাও দেখিয়াছি আমার অন্তঃকরণ গোপনে ইহাদের প্রতি একটি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে।

কিন্তু লণ্ডন প্যারিসের সহিত তুলনা করিলে ইহারা কোথায় গিয়া পড়ে! কোথায় সে শিল্প, কোথায় সে সাহিত্য, কোথায় সে রাজনীতি! দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া দূরে থাক্ দেশ কাহাকে বলে তাহাও ইহারা জানে না।

এ সমস্ত কথা সম্পূর্ণরূপে পর্য্যালোচনা করিয়াও আমার মনের মধ্যে একটি দৈববাণী ধ্বনিত হইতে লাগিল—তবু এই নির্ব্বোধ সরল মানুষগুলি কেবল ভালবাসা নহে, শ্রদ্ধার যোগ্য।

কেন আমি ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করি তাই ভাবিয়া দেখিতেছিলাম। দেখিলাম ইহাদের মধ্যে যে একটি সরল বিশ্বাসের ভাব আছে তাহা অত্যন্ত বহুমূল্য। এমন কি তাহাই মনুষ্যত্বের চিরসাধনার ধন। যদি মনের ভিতরকার কথা খুলিয়া বলিতে হয় তবে এ কথা স্বীকার করিব আমার কাছে তাহা অপেক্ষা মনোহর আর কিছু নাই।

সেই সরলতাটুকু চলিয়া গেলে সভ্যতার সমস্ত সৌন্দর্য্যটুকু চলিয়া যায়। কারণ স্বাস্থ্য চলিয়া যায়। সরলতাই মনুষ্য-প্রকৃতির স্বাস্থ্য।

যতটুকু আহার করা যায় ততটুকু পরিপাক হইলে শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। মসলা দেওয়া ঘৃতপক্ক সুস্বাদু চর্ব্যচোষ্যলেহ্য পদার্থকে স্বাস্থ্য বলে না।

সমস্ত জ্ঞান ও বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ পরিপাক করিয়া স্বভাবের সহিত একীভূত করিয়া লওয়ার অবস্থাকেই বলে সরলতা, তাহাই মানসিক স্বাস্থ্য। বিবিধ জ্ঞান ও বিচিত্র মতামতকে মনের স্বাস্থ্য বলে না।

এখানকার এই নির্ব্বোধ গ্রাম্য লোকেরা যে সকল জ্ঞান ও বিশ্বাস লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে সে সমস্তই ইহাদের প্রকৃতির সহিত এক হইয়া মিশিয়া গেছে। যেমন নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস রক্তচলাচল আমাদের হাতে নাই তেমনি এ সমস্ত মতামত রাখা না রাখা তাহাদের হাতে নাই। তাহারা যাহা কিছু জানে যাহা কিছু বিশ্বাস করে নিতান্তই সহজে জানে ও সহজে বিশ্বাস করে। সেই জন্য তাহাদের জ্ঞানের সহিত বিশ্বাসের সহিত কাজের সহিত মানুষের সহিত এক হইয়া গিয়াছে।

একটা উদাহরণ দিই। অতিথি ঘরে আসিলে ইহারা তাহাকে কিছুতেই ফিরায় না। আন্তরিক ভক্তির সহিত অক্ষুণ্ণ মনে তাহার সেবা করে। সে জন্য কোন ক্ষতিকে ক্ষতি কোন ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া তাহাদের মনে উদয় হয় না। আমিও আতিথ্যকে কিয়ৎপরিমাণে ধর্ম্ম বলিয়া জানি কিন্তু তাহাও জ্ঞানে জানি বিশ্বাসে জানি না। অতিথি দেখিবামাত্র আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তি তৎক্ষণাৎ তৎপর হইয়া আতিথ্যের দিকে ধাবমান হয় না। মনের মধ্যে নানারূপ তর্ক ও বিচার করিয়া থাকি। এ সম্বন্ধে কোন বিশ্বাস আমার প্রকৃতির সহিত এক হইয়া যায় নাই।

কিন্তু স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য ঐক্যই মনুষ্যত্বের চরম লক্ষ্য। নিম্নতম জীবশ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-ছেদন করিলেও, তাহাদিগকে দুই চারি অংশে বিভক্ত করিলেও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, কিন্তু জীবগণ যতই উন্নতিলাভ করিয়াছে ততই তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে।

মানবস্বভাবের মধ্যেও জ্ঞান বিশ্বাস ও কার্য্যের বিচ্ছিন্নতা উন্নতির নিম্নপর্য্যায়গত। তিনের মধ্যে অভেদ সংযোগই চরম উন্নতি।

কিন্তু যেখানে জ্ঞান বিশ্বাস কার্য্যের বৈচিত্র্য নাই সেখানে এই ঐক্য অপেক্ষাকৃত সুলভ। ফুলের পক্ষে সুন্দর হওয়া যত সহজ জীবশরীরের পক্ষে তত নহে। জীবদেহের বিবিধ কার্য্যোপযোগী বিচিত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সমাবেশের মধ্যে তেমন নিখুঁৎ সম্পূর্ণতা বড় দুর্লভ। জন্তুদের অপেক্ষা মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণতা আরো দুর্লভ। মানসিক প্রকৃতি সম্বন্ধেও এ কথা খাটে।

আমার এই ক্ষুদ্র গ্রামের চাষাদের প্রকৃতির মধ্যে যে একটি ঐক্য দেখা যায় তাহার মধ্যে বৃহত্ত্ব জটিলতা কিছুই নাই। এই ধরাপ্রান্তে ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে সামান্য গুটিকতক অভাব মোচন করিয়া জীবনধারণ করিতে অধিক দর্শন বিজ্ঞান সমাজতত্ত্বের প্রয়োজন হয় না। যে গুটিকয়েক আদিম পরিবার-নীতি গ্রাম-নীতি এবং প্রজানীতির আবশ্যক, সে কয়েকটি অতি সহজেই মানুষের জীবনের সহিত মিশিয়া অখণ্ড জীবন্তভাব ধারণ করিতে পারে।

তবু ক্ষুদ্র হইলেও ইহার মধ্যে যে একটি সৌন্দর্য্য আছে তাহা চিত্তকে আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারে না, এবং এই সৌন্দর্য্যটুকু অশিক্ষিত ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্য হইতে পদ্মের ন্যায় উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিয়া সমস্ত গর্ব্বিত সভ্যসমাজকে একটি আদর্শ দেখাইতেছে। সেই জন্য লণ্ডন প্যারিসের তুমুল সভ্যতা-কোলাহল দূর হইতে সংবাদপত্রযোগে কাণে আসিয়া বাজিলেও আমার গ্রামটি আমার হৃদয়ের মধ্যে অন্য প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে।

আমার নানাচিন্তাবিক্ষিপ্ত চিত্তের কাছে এই ছোট পল্লিটি তানপুরের সরল সুরের মত একটি নিত্য আদর্শ উপস্থিত করিয়াছে। সে বলিতেছে আমি মহৎ নহি বিস্ময়জনক নহি, কিন্তু আমি ছোটর মধ্যে সম্পূর্ণ সুতরাং অন্য সমস্ত অভাব সত্ত্বেও আমার যে একটি মাধুর্য্য আছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমি ছোট বলিয়া তুচ্ছ কিন্তু সম্পূর্ণ বলিয়া সুন্দর এবং এই সৌন্দর্য্য তোমাদের জীবনের আদর্শ।

অনেকে আমার কথায় হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না কিন্তু তবু আমার বলা উচিত এই মূঢ় চাষাদের সুষমাহীন মুখের মধ্যে আমি একটি সৌন্দর্য্য অনুভব করি যাহা রমণীর সৌন্দর্য্যের মত। আমি নিজেই তাহাতে বিস্মিত হইয়াছি এবং চিন্তা করিয়াছি এ সৌন্দর্য্য কিসের। আমার মনে তাহার একটা উত্তরও উদয় হইয়াছে।

যাহার প্রকৃতি কোন একটি বিশেষ স্থায়ী ভাবকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহার মুখে সেই ভাব ক্রমশঃ একটি স্থায়ী লাবণ্য অঙ্কিত করিয়া দেয়।

আমার এই গ্রাম্য লোকসকল জন্মাবধি কতকগুলি স্থিরভাবের প্রতি স্থির দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই কারণে সেই ভাবগুলি ইহাদের দৃষ্টিতে আপনাকে অঙ্কিত করিয়া দিবার সুদীর্ঘ অবসর পাইয়াছে। সেই জন্য ইহাদের দৃষ্টিতে একটি সকরুণ ধৈর্য্য ইহাদের মুখে একটি নির্ভর-পরায়ণ বৎসলভাব স্থিররূপে প্রকাশ পাইতেছে।

যাহারা সকল বিশ্বাসকেই প্রশ্ন করে এবং নানা বিপরীত ভাবকে পরখ করিয়া দেখে তাহাদের মুখে একটা বুদ্ধির তীব্রতা এবং সন্ধানপরতার পটুত্ব প্রকাশ পায় কিন্তু ভাবের গভীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য হইতে সে অনেক তফাৎ।

আমি যে ক্ষুদ্র নদীটিতে নৌকা লইয়া আছি ইহাতে স্রোত নাই বলিলেও হয়, সেই জন্য এই নদী কুমুদে কহ্লারে পদ্মে শৈবালে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে। সেইরূপ একটা স্থায়িত্বের অবলম্বন না পাইলে ভাব-সৌন্দর্য্যও গভীরভাবে বদ্ধমূল হইয়া আপনাকে বিকশিত করিবার অবসর পায় না।

প্রাচীন য়ুরোপ নব্য আমেরিকার প্রধান অভাব অনুভব করে সেই ভাবের। তাহার ঔজ্জ্বল্য আছে, চাঞ্চল্য আছে, কাঠিন্য আছে কিন্তু ভাবের গভীরতা নাই। সে বড়ই বেশিমাত্রায় নূতন, তাহাতে ভাব

জন্মাইবার সময় পায় নাই। এখনো সে সভ্যতা মানুষের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়া মানুষের হৃদয়ের দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে নাই। প্রাচীন য়ুরোপের ছিদ্রে ছিদ্রে কোণে কোণে অনেক শ্যামল পুরাতন ভাব অঙ্কুরিত হইয়া তাহাকে বিচিত্র লাবণ্যে মণ্ডিত করিয়াছে, অ্যামেরিকার সেই লাবণ্যটি নাই। বহুস্মৃতি জনপ্রবাদ বিশ্বাস ও সংস্কারের দ্বারা এখনো তাহাতে মানব জীবনের রঙ ধরিয়া যায় নাই।

আমার এই চাষাদের মুখে অন্তঃপ্রকৃতির সেই রঙ ধরিয়া গেছে। সারল্যের সেই পুরাতন শ্রীটুকু সকলকে দেখাইবার জন্য আমার বড় একটি আকাঙ্ক্ষা হইতেছে। কিন্তু সেই শ্রী এতই সুকুমার যে, কেহ যদি বলেন দেখিলাম না এবং কেহ যদি হাস্য করেন তবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আমার ক্ষমতার অতীত।

এই খবরের কাগজের টুক্‌রাগুলা পড়িতেছি আর আমার মনে হইতেছে, যে, বাইবেলে লেখা আছে, যে নম্র সেই পৃথিবীর অধিকার প্রাপ্ত হইবে। আমি যে নম্রতাটুকু এখানে দেখিতেছি ইহার একটি স্বর্গীয় অধিকার আছে। পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যের অপেক্ষা নম্র আর কিছু নাই—সে বলের দ্বারা কোন কাজ করিতে চায় না—একসময় পৃথিবী তাহারই হইবে। এই যে গ্রামবাসিনী সুন্দরী সরলতা আজ একটি নগরবাসী নবসভ্যতার পোষ্যপুত্রের মন অতর্কিতভাবে হরণ করিয়া লইতেছে এককালে সে এই সমস্ত সভ্যতার রাজরাণী হইয়া বসিবে। এখনো হয় ত তার অনেক বিলম্ব আছে কিন্তু অবশেষে সভ্যতা সরলতার সহিত যদি সম্মিলিত না হয় তবে সে আপনার পরিপূর্ণতার আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্থায়িত্বের উপর ভাবসৌন্দর্য্যের নির্ভর। পুরাতন স্মৃতির যে সৌন্দর্য্য তাহা কেবল অপ্রাপ্যতা নিবন্ধন নহে; হৃদয় বহুকাল তাহার উপর বাস করিতে পায় বলিয়া সহস্র সজীব কল্পনাসূত্র প্রসারিত করিয়া তাহাকে আপনার সহিত একীকৃত করিতে পারে, সেই কারণেই

তাহার মাধুর্য্য। পুরাতন গৃহ, পুরাতন দেবমন্দিরের প্রধান সৌন্দর্য্যের কারণ এই যে, বহুকালের স্থায়িত্ববশতঃ তাহারা মানুষের সহিত অত্যন্ত সংযুক্ত হইয়া গেছে, তাহারা অবিশ্রাম মানবহৃদয়ের সংস্রবে সর্ব্বাংশে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে - সমাজের সহিত তাহাদের সর্ব্বপ্রকার বিচ্ছেদ দূর হইয়া তাহারা সমাজের অঙ্গ হইয়া গেছে, এই ঐক্যেই তাহাদের সৌন্দর্য্য। মানবসমাজে স্ত্রীলোক সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন; পুরুষ নানা কার্য্য নানা অবস্থা নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে সর্ব্বদাই চঞ্চলভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে; স্ত্রীলোক স্থায়ীভাবে কেবলি জননী এবং পত্নীরূপে বিরাজ করিতেছে, কোন বিপ্লবেই তাহাকে বিক্ষিপ্ত করে নাই; এই জন্য সমাজের মর্ম্মের মধ্যে নারী এমন সুন্দররূপে সংহতরূপে মিশ্রিত হইয়া গেছে; কেবল তাহাই নহে, সেই জন্য সে তাহার ভাবের সহিত কাজের সহিত শক্তির সহিত সবসুদ্ধ এমন সম্পূর্ণ এক হইয়া গেছে— এই দুর্লভ সর্ব্বাঙ্গীন ঐক্যলাভ করিবার জন্য তাহার দীর্ঘ অবসর ছিল।

সেইরূপ যখন দীর্ঘকালের স্থায়িত্ব আশ্রয় করিয়া তর্ক যুক্তি জ্ঞান ক্রমশঃ সংস্কারে বিশ্বাসে আসিয়া পরিণত হয় তখনই তাহার সৌন্দর্য্য ফুটিতে থাকে। তখন সে স্থির হইয়া দাঁড়ায় এবং ভিতরে যে সকল জীবনের বীজ থাকে সেইগুলি মানুষের বহুদিনের আনন্দালোকে ও অশ্রু-জলবর্ষণে অঙ্কুরিত হইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

য়ুরোপে সম্প্রতি যে এক নবসভ্যতার যুগ আবির্ভূত হইয়াছে এ যুগে ক্রমাগতই নব নব জ্ঞান বিজ্ঞান মতামত স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে; যন্ত্রতন্ত্র উপকরণসামগ্রীতে একেবারে স্থানাভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবিশ্রাম চাঞ্চল্যে কিছুই পুরাতন হইতে পাইতেছে না।

কিন্তু দেখিতেছি এই সমস্ত আয়োজনের মধ্যে মানবহৃদয় কেবলই ক্রন্দন করিতেছে।

তাহার কারণ মানবহৃদয় যতক্ষণ এই বিপুল সভ্যতাস্তূপের মধ্যে

একটি সুন্দর ঐক্য স্থাপন করিতে না পারিবে ততক্ষণ কখনই ইহার মধ্যে আরামে ঘরকন্না পাতিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। ততক্ষণ সে কেবল অস্থির অশান্ত হইয়া বেড়াইবে। আর সমস্তই জড়' হইয়াছে, কেবল এখনো স্থায়ী সৌন্দর্য্য, এখনো নবসভ্যতার রাজলক্ষ্মী আসিয়া দাঁড়ান নাই। জ্ঞান বিশ্বাস ও কার্য্য পরস্পরকে কেবলি পীড়ন করিতেছে—ঐক্যলাভের জন্য নহে, জয়লাভের জন্য পরস্পরের মধ্যে সংগ্রাম বাধিয়া গিয়াছে।

কেবল যে প্রাচীন স্মৃতির মধ্যে সৌন্দর্য্য তাহা নহে, নবীন আশার মধ্যেও সৌন্দর্য্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে য়ুরোপের নূতন সভ্যতার মধ্যে এখনো আশার সঞ্চার হয় নাই। বৃদ্ধ য়ুরোপ অনেকবার অনেক আশায় প্রতারিত হইয়াছে; যে সকল উপায়ের উপর তাহার বড় বিশ্বাস ছিল সে সমস্ত একে একে ব্যর্থ হইতে দেখিয়াছে। ফরাসী বিপ্লবকে একটা বৃহৎ চেষ্টার বৃথা পরিণাম বলিয়া অনেকে মনে করে। এক সময় লোকে মনে করিয়াছিল আপামর সাধারণকে ভোট দিতে দিলেই পৃথিবীর অধিকাংশ অমঙ্গল দূর হইবে—এখন সকলে ভোট দিতেছে অথচ অধিকাংশ অমঙ্গল বিদায় লইবার জন্য কোনরূপ ব্যস্ততা দেখাইতেছে না। কখনো বা লোকে আশা করিয়াছিল ষ্টেটের দ্বারা মানুষের সকল দুর্দ্দশা মোচন হইতে পারে, এখন আবার পণ্ডিতেরা আশঙ্কা করিতেছেন ষ্টেটের দ্বারা দুর্দ্দশা মোচনের চেষ্টা করিলে হিতে বিপরীত হইবারই সম্ভাবনা। কয়লার খনি কাপড়ের কল এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপর কাহারও কাহারও কিছু কিছু বিশ্বাস হয় কিন্তু তাহাতেও দ্বিধা ঘোচে না; অনেক বড় বড় লোক বলিতেছেন কলের দ্বারা মানুষের পূর্ণতা সাধন হয় না। আধুনিক য়ুরোপ বলে, আশা করিয়ো না, বিশ্বাস করিয়ো না, কেবল পরীক্ষা কর।

নবীনা সভ্যতা যেন এক বৃদ্ধ পতিকে বিবাহ করিয়াছে, তাহার সমৃদ্ধি আছে কিন্তু যৌবন নাই, সে আপনার সহস্র পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা

জীর্ণ। উভয়ের মধ্যে ভালরূপ প্রণয় হইতেছে না—গৃহের মধ্যে কেবল অশান্তি।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া আমি এই পল্লীর ক্ষুদ্র সম্পূর্ণতার সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ আনন্দে সম্ভোগ করিতেছি।

তাই বলিয়া আমি এমন অন্ধ নহি, যে, য়ুরোপীয় সভ্যতার মর্য্যাদা বুঝি না। প্রভেদের মধ্যে ঐক্যই ঐক্যের পূর্ণ আদর্শ, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই সৌন্দর্য্যের প্রধান কারণ। সম্প্রতি য়ুরোপে সেই প্রভেদের যুগ পড়িয়াছে, তাই বিচ্ছেদ বৈষম্য। যখন ঐক্যের যুগ আসিবে তখন এই বৃহৎ স্তূপের মধ্যে অনেক ঝরিয়া গিয়া পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া একখানি সমগ্র সুন্দর সভ্যতা দাঁড়াইয়া যাইবে। ক্ষুদ্র পরিণামের মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করিয়া সন্তুষ্টভাবে থাকার মধ্যে একটি শান্তি সৌন্দর্য্য ও নির্ভয়তা আছে সন্দেহ নাই—আর, যাহারা মনুষ্যপ্রকৃতিকে ক্ষুদ্র ঐক্য হইতে মুক্তি দিয়া বিপুল বিস্তারের দিকে লইয়া যায় তাহারা অনেক অশান্তি অনেক বিঘ্ন-বিপদ সহ্য করে, বিপ্লবের রণক্ষেত্রের মধ্যে তাহাদিগকে অশ্রান্ত সংগ্রাম করিতে হয়—কিন্তু তাহারাই পৃথিবীর মধ্যে বীর এবং তাহারা যুদ্ধে পতিত হইলেও অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে। এই বীর্য্য এবং সৌন্দর্য্যের মিলনেই যথার্থ সম্পূর্ণতা। উভয়ের বিচ্ছেদে অর্দ্ধসভ্যতা।

আমি এই পল্লীপ্রান্তে বসিয়া আমার সাদাসিধা তানপুরার চারটি তারের গুটিচারেক সুন্দর সুরসম্মিশ্রণের সহিত মিলাইয়া য়ুরোপীয় সভ্যতাকে বলিতেছি, তোমার সুর এখনো ঠিক মিলিল না এবং তান-পুরাটিকেও বলিতে হয় তোমার ঐ গুটিকয়েক সুরের পুনঃ পুনঃ ঝঙ্কার-কেও পরিপূর্ণ সঙ্গীত জ্ঞান করিয়া সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। বরঞ্চ আজিকার ঐ বিচিত্র বিশৃঙ্খল স্বরসমষ্টি কাল প্রতিভার প্রভাবে মহা সঙ্গীতে পরিণত হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু হায়, তোমার ঐ কয়েকটি তারের মধ্যে হইতে মহৎ মূর্ত্তিমান সঙ্গীত বাহির করা দুঃসাধ্য!

মনুষ্য।

স্রোতস্বিনী প্রাতঃকালে আমার বৃহৎ খাতাটি হাতে করিয়া আনিয়া কহিল—এ সব তুমি কি লিখিয়াছ? আমি যে সকল কথা কস্মিনকালে বলি নাই তুমি আমার মুখে কেন বসাইয়াছ?

আমি কহিলাম, তাহাতে দোষ কি হইয়াছে?

স্রোতস্বিনী কহিল—এমন করিয়া আমি কখনও কথা কহি না এবং কহিতে পারি না। যদি তুমি আমার মুখে এমন কথা দিতে, যাহা আমি বলি বা না বলি আমার পক্ষে বলা সম্ভব, তাহা হইলে আমি এমন লজ্জিত হইতাম না। কিন্তু এ যেন তুমি একখানা বই লিখিয়া আমার নামে চালাইতেছ।

আমি কহিলাম—তুমি আমাদের কাছে কতটা বলিয়াছ তাহা তুমি কি করিয়া বুঝিবে? তুমি যতটা বল, তাহার সহিত, তোমাকে যতটা জানি দুই মিশিয়া অনেকখানি হইয়া উঠে। তোমার সমস্ত জীবনের দ্বারা তোমার কথাগুলি ভরিয়া উঠে। তোমার সেই অব্যক্ত উহ্য কথাগুলিত বাদ দিতে পারি না।

স্রোতস্বিনী চুপ করিয়া রহিল। জানি না, বুঝিল কি না বুঝিল। বোধ হয় বুঝিল, কিন্তু তথাপি আবার কহিলাম—তুমি জীবন্ত বর্ত্তমান, প্রতিক্ষণে নব নব ভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিতেছ—তুমি যে আছ, তুমি যে সত্য, তুমি যে সুন্দর, এ বিশ্বাস উদ্রেক করিবার জন্য তোমাকে কোন চেষ্টাই করিতে হইতেছে না—কিন্তু লেখায় সেই প্রথম সত্যটুকু প্রমাণ করিবার জন্য অনেক উপায় অবলম্বন এবং অনেক বাক্য ব্যয় করিতে হয়। নতুবা প্রত্যক্ষের সহিত অপ্রত্যক্ষ সমকক্ষতা রক্ষা করিতে পারিবে কেন? তুমি যে মনে করিতেছ আমি তোমাকে বেশি বলাইয়াছি তাহা ঠিক নহে —আমি বরং তোমাকে সংক্ষেপ করিয়া লইয়াছি—তোমার লক্ষ লক্ষ

কথা, লক্ষ লক্ষ কাজ, চিরবিচিত্র আকারইঙ্গিতের কেবল মাত্র সারসংগ্রহ করিয়া লইতে হইয়াছে। নহিলে তুমি যে কথাটি আমার কাছে বলিয়াছ ঠিক সেই কথাটি আমি আর কাহারো কর্ণগোচর করাইতে পারিতাম না, লোকে ঢের কম শুনিত এবং ভুল শুনিত।

স্রোতস্বিনী দক্ষিণ পার্শ্বে ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া একটা বহি খুলিয়া তাহার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কহিল—তুমি আমাকে স্নেহ কর বলিয়া আমাকে যতখানি দেখ আমিত বাস্তবিক ততখানি নহি।

আমি কহিলাম—আমার কি এত স্নেহ আছে যে, তুমি বাস্তবিক যতখানি আমি তোমাকে ততখানি দেখিতে পাইব? একটি মানুষের সমস্ত কে ইয়ত্তা করিতে পারে, ঈশ্বরের মত কাহার স্নেহ!

ক্ষিতি ত একবারে অস্থির হইয়া উঠিল, কহিল—এ আবার তুমি কি কথা তুলিলে? স্রোতস্বিনী তোমাকে এক ভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আর একভাবে তাহার উত্তর দিলে।

আমি কহিলাম, জানি। কিন্তু কথাবার্ত্তায় এমন অসংলগ্ন উত্তর প্রত্যুত্তর হইয়া থাকে। মন এমন একপ্রকার দাহ্য পদার্থ যে, ঠিক যেখানে প্রশ্নস্ফুলিঙ্গ পড়িল সেখানে কিছু না হইয়া হয় ত দশ হাত দূরে আর এক জায়গায় দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। নির্ব্বাচিত কমিটিতে বাহিরের লোকের প্রবেশ নিষেধ, কিন্তু বৃহৎ উৎসবের স্থলে যে আসে তাহাকেই ডাকিয়া বসানো যায়—আমাদের কথোপকথনসভা সেই উৎসব-সভা; সেখানে যদি একটা অসংলগ্ন কথা অনাহূত আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে আসুন মশায় বসুন বলিয়া আহ্বান করিয়া হাস্য-মুখে তাহার পরিচয় না লইলে উৎসবের উদারতা দূর হয়।

ক্ষিতি কহিল, ঘাট হইয়াছে, তবে তাই কর, কি বলিতেছিলে বল। ক উচ্চারণমাত্র কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া প্রহ্লাদ কাঁদিয়া উঠে, তাহার আর বর্ণমালা শেখা হয় না; একটা প্রশ্ন শুনিবামাত্র যদি আর একটা উত্তর

তোমার মনে উঠে তবে ত কোন কথাই এক পা অগ্রসর হয় না। কিন্তু প্রহ্লাদ-জাতীয় লোককে নিজের খেয়াল অনুসারে চলিতে দেওয়াই ভাল, যাহা মনে আসে বল।

আমি কহিলাম—আমি বলিতেছিলাম, যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমন কি, জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য্য সম্ভোগ। ইহা হইতে মনে পড়িল, সমস্ত বৈষ্ণব ধর্ম্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত রহিয়াছে।

ক্ষিতি মনে মনে ভাবিল—কি সর্ব্বনাশ! আবার তত্ত্বকথা কোথা হইতে আসিয়া পড়িল! স্রোতস্বিনী এবং দীপ্তিও যে, তত্ত্বকথা শুনিবার জন্য অতিশয় লালায়িত তাহা নহে—কিন্তু একটা কথা যখন মনের অন্ধ-কারের ভিতর হইতে হঠাৎ লাফাইয়া ওঠে তখন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শেষ পর্য্যন্ত ধাবিত হওয়া ভাব-শিকারীর একটা চিরাভ্যস্ত কাজ। নিজের কথা নিজের আয়ত্ত করিবার জন্য বকিয়া যাই, লোকে মনে করে অন্যকে তত্ত্বোপদেশ দিতে বসিয়াছি।

আমি কহিলাম—বৈষ্ণবধর্ম্ম পৃথিবীর সমস্ত প্রেম-সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে মা আপনার সন্তানের মধ্যে আনন্দের আর অবধি পায় না, সমস্ত হৃদয়খানি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাঁজে ভাঁজে খুলিয়া ঐ ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করিয়া শেষ করিতে পারে না, তখন আপনার সন্তানের মধ্যে আপনার ঈশ্বরকে উপাসনা করিয়াছে। যখন দেখিয়াছে প্রভুর জন্য দাস আপনার প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্য বন্ধু আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন করে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমা পরস্পরের নিকট আপনার সমস্ত আত্মাকে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে তখন এই সমস্ত পরমপ্রেমের মধ্যে একটা সীমাতীত লোকা-তীত ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়াছে।

ক্ষিতি কহিল, সীমার মধ্যে অসীম, প্রেমের মধ্যে অনন্ত এ সব কথা যতই বেশি শুনি ততই বেশি দুর্ব্বোধ হইয়া পড়ে। প্রথম প্রথম মনে হইত যেন কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছি বা, এখন দেখিতেছি অনন্ত অসীম প্রভৃতি শব্দগুলা স্তূপাকার হইয়া বুঝিবার পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমি কহিলাম, ভাষা ভূমির মত। তাহাতে একই শস্য ক্রমাগত বপন করিলে তাহার উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। "অনন্ত" এবং "অসীম" শব্দটা আজকাল সর্ব্বদা ব্যবহারে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, এই জন্য যথার্থ একটা কথা বলিবার না থাকিলে ও দুটা শব্দ ব্যবহার করা উচিত হয় না। মাতৃভাষার প্রতি একটু দয়ামায়া করা কর্ত্তব্য।

ক্ষিতি কহিল—ভাষার প্রতি তোমার ত যথেষ্ট সদয় আচরণ দেখা যাইতেছে না।

সমীর এতক্ষণ আমার খাতাটি পড়িতেছিল, শেষ করিয়া কহিল, এ কি করিয়াছ? তোমার ডায়ারির এই লোকগুলা কি মানুষ না যথার্থই ভূত? ইহারা দেখিতেছি কেবল বড় বড় ভাল ভাল কথাই বলে কিন্তু ইহাদের আকার আয়তন কোথায় গেল?

আমি বিষণ্ণমুখে কহিলাম—কেন বল দেখি?

সমীর কহিল—তুমি মনে করিয়াছ, আম্রের অপেক্ষা আমসত্ত ভাল—তাহাতে সমস্ত আঁঠি আঁশ আবরণ এবং জলীয় অংশ পরিহার করা যায়—কিন্তু তাহার সেই লোভন গন্ধ, সেই শোভন আকার কোথায়? তুমি কেবল আমার সারটুকু লোককে দিবে, আমার মানুষটুকু কোথায় গেল? আমার বেবাক্ বাজে কথাগুলো তুমি বাজেয়াপ্ত করিয়া যে একটি নিরেট মূর্ত্তি দাঁড় করাইয়াছ তাহতে দন্তস্ফুট করা দুঃসাধ্য। আমি কেবল দুই চারিটি চিন্তাশীল লোকের কাছে বাহবা পাইতে চাহি না, আমি সাধারণ লোকের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে চাহি।

আমি কহিলাম—সে জন্য কি করিতে হইবে?

সমীর কহিল—সে আমি কি জানি! আমি কেবল আপত্তি জানাইয়া রাখিলাম। আমার যেমন সার আছে তেমনি আমার স্বাদ আছে; সারাংশ মানুষের পক্ষে আবশ্যক হইতে পারে কিন্তু স্বাদ মানুষের নিকট প্রিয়। আমাকে উপলক্ষ করিয়া মানুষ কতকগুলো মত কিম্বা তর্ক আহরণ করিবে এমন ইচ্ছা করি না, আমি চাই মানুষ আমাকে আপনার লোক বলিয়া চিনিয়া লইবে। এই ভ্রমসঙ্কুল সাধের মানবজন্ম ত্যাগ করিয়া একটা মাসিক পত্রের নির্ভুল প্রবন্ধ আকারে জন্মগ্রহণ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমি দার্শনিক তত্ত্ব নই, আমি ছাপার বহি নই, তর্কের সুযুক্তি অথবা কুযুক্তি নই, আমার বন্ধুরা, আমার আত্মীয়েরা আমাকে সর্ব্বদা যাহা বলিয়া জানেন, আমি তাহাই।

ব্যোম এতক্ষণ একটা চৌকিতে ঠেসান দিয়া আর একটা চৌকির উপর পা দুটা তুলিয়া অটল প্রশান্তভাবে বসিয়া ছিল। সে হঠাৎ বলিল—তর্ক বল, তত্ত্ব বল, সিদ্ধান্ত এবং উপসংহারেই তাহাদের চরম গতি, সমাপ্তিতেই তাহাদের প্রধান গৌরব। কিন্তু মানুষ স্বতন্ত্রজাতীয় পদার্থ—অমরতা অসমাপ্তিই তাহার সর্ব্বপ্রধান যাথার্থ্য। বিশ্রামহীন গতিই তাহার প্রধান লক্ষণ। অমরতাকে কে সংক্ষিপ্ত করিবে, গতির সারাংশ কে দিতে পারে? ভাল ভাল পাকা কথাগুলি যদি অতি অনায়াসভাবে মানুষের মুখে বসাইয়া দাও তবে ভ্রম হয় তাহার মনের যেন একটা গতিবৃদ্ধি নাই—তাহার যতদূর হইবার শেষ হইয়া গেছে। চেষ্টা ভ্রম অসম্পূর্ণতা পুনরুক্তি যদিও আপাততঃ দারিদ্র্যের মত দেখিতে হয় কিন্তু মানুষের প্রধান ঐশ্বর্য্য তাহার দ্বারা প্রমাণ হয়। তাহার দ্বারা চিন্তার একটা গতি একটা জীবন নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। মানুষের কথাবার্ত্তা চরিত্রের মধ্যে কাঁচা রংটুকু, অসমাপ্তির কোমলতা দুর্ব্বলতাটুকু না রাখিয়া দিলে তাহাকে একেবারে সাঙ্গ করিয়া ছোট করিয়া ফেলা হয়। তাহার অনন্ত পর্ব্বের পালা একেবারে সূচিপত্রেই সারিয়া দেওয়া হয়।

সমীর কহিল—মানুষের ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা অতিশয় অল্প—এই জন্ম প্রকাশের সঙ্গে নির্দ্দেশ, ভাষার সঙ্গে ভঙ্গী, ভাবের সহিত ভাবনা যোগ করিয়া দিতে হয়। কেবল রথ নহে রথের মধ্যে তাহার গতি সঞ্চারিত করিয়া দিতে হয়; যদি একটা মানুষকে উপস্থিত কর তাহাকে খাড়া দাঁড় করাইয়া কতকগুলি কলে-ছাঁটা কথা কহাইয়া গেলেই হইবে না, তাহাকে চালাইতে হইবে, তাহাকে স্থান পরিবর্ত্তন করাইতে হইবে, তাহার অত্যন্ত বৃহত্ত্ব বুঝাইবার জন্ম তাহাকে অসমাপ্তভাবেই দেখাইতে হইবে।

আমি কহিলাম, সেইটাই ত কঠিন। কথা শেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে এখনো শেষ হয় নাই, কথার মধ্যে সেই উদ্যত ভঙ্গীটি দেওয়া বিষম ব্যাপার।

স্রোতস্বিনী কহিল—এই জন্মই সাহিত্যে বহুকাল ধরিয়া একটা তর্ক চলিয়া আসিতেছে যে, বলিবার বিষয়টা বেশি, না, বলিবার ভঙ্গীটা বেশি। আমি এ কথাটা লইয়া অনেকবার ভাবিয়াছি, ভাল বুঝিতে পারি না। আমার মনে হয় তর্কের খেয়াল অনুসারে যখন যেটাকে প্রাধান্য দেওয়া যায় তখন সেইটাই প্রধান হইয়া উঠে।

ব্যোম মাথাটা কড়িকাঠের দিকে তুলিয়া বলিতে লাগিল—সাহিত্যে বিষয়টা শ্রেষ্ঠ, না, ভঙ্গীটা শ্রেষ্ঠ ইহা বিচার করিতে হইলে আমি দেখি কোন্‌টা অধিক রহস্যময়। বিষয়টা দেহ, ভঙ্গীটা জীবন। দেহটা বর্ত্তমানেই সমাপ্ত, জীবনটা একটা চঞ্চল অসমাপ্তি তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে, তাহাকে বৃহৎ ভবিষ্যতের দিকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে, সে যতখানি দৃশ্যমান তাহা অতিক্রম করিয়াও তাহার সহিত অনেকখানি আশাপূর্ণ নব নব সম্ভাবনা জুড়িয়া রাখিয়াছে। যতটুকু বিষয়রূপে প্রকাশ করিলে ততটুকু জড় দেহ মাত্র, ততটুকু সীমাবদ্ধ, যতটুকু ভঙ্গীর দ্বারা তাহার মধ্যে সঞ্চার করিয়া দিলে তাহাই জীবন, তাহাতেই তাহার বৃদ্ধি-শক্তি তাহার চলৎশক্তি সূচনা করিয়া দেয়।

সমীর কহিল—সাহিত্যের বিষয়মাত্রই অতি পুরাতন, আকার গ্রহণ করিয়া সে নূতন হইয়া উঠে।

স্রোতস্বিনী কহিল—আমার মনে হয় মানুষের পক্ষেও ঐ একই কথা। এক একজন মানুষ এমন একটি মনের আকৃতি লইয়া প্রকাশ পায় যে, তাহার দিকে চাহিয়া আমরা পুরাতন মনুষ্যত্বের যেন একটা নূতন বিস্তার আবিষ্কার করি।

দীপ্তি কহিল—মনের এবং চরিত্রের সেই আকৃতিটাই আমাদের ষ্টাইল্। সেইটের দ্বারাই আমরা পরস্পরের নিকট প্রচলিত পরিচিত পরীক্ষিত হইতেছি। আমি এক একবার ভাবি আমার ষ্টাইলটা কি রকমের! সমালোচকেরা যাহাকে প্রাঞ্জল বলে তাহা নহে—

সমীর কহিল—কিন্তু ওজস্বী বটে। তুমি যে আকৃতির কথা কহিলে, যেটা বিশেষরূপে আমাদের আপনার, আমিও তাহারই কথা বলিতেছিলাম। চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে চেহারাখানা যাহাতে বজায় থাকে আমি সেই অনুরোধ করিতেছিলাম।

দীপ্তি ঈষৎ হাসিয়া কহিল—কিন্তু চেহারা সকলের সমান নহে, অতএব অনুরোধ করিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক। কোন চেহারায় বা প্রকাশ করে, কোন চেহারায় বা গোপন করে। হীরকের জ্যোতি হীরকের মধ্যে স্বতই প্রকাশমান, তাহার আলো বাহির করিবার জন্য তাহার চেহারা ভাঙিয়া ফেলিতে হয় না, কিন্তু তৃণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলে তবেই তাহার আলোটুকু বাহির হয়। আমাদের মত ক্ষুদ্রপ্রাণীর মুখে এ বিলাপ শোভা পায় না, যে, সাহিত্যে আমাদের চেহারা বজায় থাকিতেছে না। কেহ কেহ আছে কেবল যাহার অস্তিত্ব আমাদের কাছে একটি নূতন শিক্ষা, নূতন আনন্দ! সে যেমনটি তাহাকে তেমনি অবিকল রক্ষা করিতে পারিলেই যথেষ্ট। কেহ বা আছে যাহাকে ছাড়াইয়া ফেলিয়া ভিতর হইতে শাঁস বাহির করিতে হয়। শাঁসটুকু যদি বাহির

হয় তবে সেইজন্যই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কারণ, তাহাই বা কয়জন লোকের আছে এবং কয়জন বাহির করিয়া দিতে পারে!

সমীর হাস্যমুখে কহিল, মাপ করিবেন দীপ্তি, আমি যে তৃণ এমন দীনতা আমি কখনও স্বপ্নেও অনুভব করি না। বরঞ্চ অনেক সময় ভিতরদিকে চাহিলে আপনাকে খনির হীরক বলিয়া অনুমান হয়। এখন কেবল চিনিয়া লইতে পারে এমন একটা জহরীর প্রত্যাশায় বসিয়া আছি। ক্রমে যত দিন যাইতেছে তত আমার বিশ্বাস হইতেছে, পৃথিবীতে জহরের তত অভাব নাই যত জহরীর। তরুণ বয়সে সংসারে মানুষ চোখে পড়িত না—মনে হইত যথার্থ মানুষগুলা উপন্যাস নাটক এবং মহাকাব্যেই আশ্রয় লইয়াছে, সংসারে কেবল একটিমাত্র অবশিষ্ট আছে। এখন দেখিতে পাই লোকালয়ে মানুষ ঢের আছে কিন্তু "ভোলা মন, ও ভোলা মন, মানুষ কেন চিন্‌লি না!" ভোলা মন, এই সংসারের মাঝখানে একবার প্রবেশ করিয়া দেখ্‌, এই মানবহৃদয়ের ভীড়ের মধ্যে! সভাস্থলে যাহারা কথা কহিতে পারে না, সেখানে তাহারা কথা কহিবে, লোকসমাজে যাহারা এক প্রান্তে উপেক্ষিত হয় সেখানে তাহাদের এক নূতন গৌরব প্রকাশিত হইবে, পৃথিবীতে যাহাদিগকে অনাবশ্যক বোধ হয় সেখানে দেখিব তাহাদেরই সরল প্রেম, অবিশ্রাম সেবা, আত্মবিস্মৃত আত্মবিসর্জ্জনের উপরে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন মহাকাব্যের নায়ক, কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহাদের আত্মীয় স্বজাতি আছে, সেই আত্মীয়তা কোন্‌ নব দ্বৈপায়ন আবিষ্কার করিবে এবং প্রকাশ করিবে!

আমি কহিলাম—না করিলে কী এমন আসে যায়! মানুষ পরস্পরকে না যদি চিনিবে তবে পরস্পরকে এত ভালবাসে কি করিয়া! একটি যুবক তাহার জন্মস্থান ও আত্মীয়বর্গ হইতে বহুদূরে দু-দশ টাকা বেতনে ঠিকা মুহুরীগিরি করিত। আমি তাহার প্রভু ছিলাম, কিন্তু প্রায় তাহার

অস্তিত্বও অবগত ছিলাম না—সে এত সামান্য লোক ছিল! একদিন রাত্রে সহসা তাহার ওলাউঠা হইল। আমার শয়নগৃহ হইতে শুনিতে পাইলাম সে "পিসিমা" "পিসিমা" করিয়া কাতরস্বরে কাঁদিতেছে। তখন সহসা তাহার গৌরবহীন ক্ষুদ্র জীবনটি আমার নিকট কতখানি বৃহৎ হইয়া দেখা দিল! সেই যে একটা অজ্ঞাত অখ্যাত মূর্খ নির্ব্বোধ লোক বসিয়া বসিয়া ঈষৎ গ্রীবা হেলাইয়া কলম খাড়া করিয়া ধরিয়া এক মনে নকল করিয়া যাইত, তাহাকে তাহার পিসিমা আপন নিঃসন্তান বৈধব্যের সমস্ত সঞ্চিত স্নেহরাশি দিয়া মানুষ করিয়াছেন। সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্তদেহে শূন্য বাসায় ফিরিয়া যখন সে স্বহস্তে উনান ধরাইয়া পাক চড়াইত, যতক্ষণ অন্ন টগ্‌বগ্‌ করিয়া না ফুটিয়া উঠিত ততক্ষণ কম্পিত অগ্নিশিখার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া সে কি সেই দূরকুটীরবাসিনী স্নেহশালিনী কল্যাণময়ী পিসিমার কথা ভাবিত না? এক দিন যে তাহার নকলে ভুল হইল, ঠিকে মিল হইল না, তাহার উচ্চতন কর্ম্মচারীর নিকট সে লাঞ্ছিত হইল, সে দিন কি সকালের চিঠিতে তাহার পিসিমার পীড়ার সংবাদ পায় নাই? এই নগণ্য লোকটার প্রতিদিনের মঙ্গল-বার্ত্তার জন্য একটি স্নেহপরিপূর্ণ পবিত্র হৃদয়ে কি সামান্য উৎকণ্ঠা ছিল! এই দরিদ্র যুবকের প্রবাসবাসের সহিত কি কম করুণ কাতরতা উদ্বেগ জড়িত হইয়া ছিল! সহসা সেই রাত্রে এই নির্ব্বাণপ্রায় ক্ষুদ্র প্রাণশিখা এক অমূল্য মহিমায় আমার নিকটে দীপ্যমান হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিলাম কিন্তু পিসিমার ধনকে পিসিমার নিকট ফিরাইয়া দিতে পারিলামনা—আমার সেই ঠিকা মুহুরির মৃত্যু হইল। ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন খুব মহৎ তথাপি এই লোকটিরও মূল্য অল্প নহে। তাহার মূল্য কোন কবি অনুমান করে নাই, কোন পাঠক স্বীকার করে নাই, তাই বলিয়া সে মূল্য পৃথিবীতে অনাবিষ্কৃত ছিল না—একটি জীবন আপনাকে তাহার জন্য একান্ত উৎসর্গ করিয়াছিল—কিন্তু খোরাক-পোষাকসমেত

লোকটার বেতন ছিল আট টাকা, তাহাও বারোমাস নহে। মহত্ত্ব আপনার জ্যোতিতে আপনি প্রকাশিত হইয়া উঠে আর আমাদের মত দীপ্তিহীন ছোট ছোট লোকদিগকে বাহিরের প্রেমের আলোকে প্রকাশ করিতে হয়;—পিসিমার ভালবাসা দিয়া দেখিলে আমরা সহসা দীপ্যমান হইয়া উঠি। যেখানে অন্ধকারে কাহাকেও দেখা যাইতেছিল না, সেখানে প্রেমের আলোক ফেলিলে সহসা দেখা যায় মানুষে পরিপূর্ণ।

স্রোতস্বিনী দয়াস্নিগ্ধ মুখে কহিল—তোমার ঐ বিদেশী মুহুরির কথা তোমার কাছে পূর্ব্বে শুনিয়াছি। জানি না, উহার কথা শুনিয়া কেন আমাদের হিন্দুস্থানী বেহারা নীহরকে মনে পড়ে। সম্প্রতি দুটি শিশু-সন্তান রাখিয়া তাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে। এখন সে কাজ কর্ম্ম করে, দুপরবেলা বসিয়া পাখা টানে, কিন্তু এমন শুষ্ক শীর্ণ ভগ্ন লক্ষ্মীছাড়ার মত হইয়া গেছে! তাহাকে যখনই দেখি কষ্ট হয়—কিন্তু সে কষ্ট যেন ইহার একলার জন্য নহে—আমি ঠিক বুঝাইতে পারি না, কিন্তু মনে হয় যেন সমস্ত মানবের জন্য একটা বেদনা অনুভূত হইতে থাকে।

আমি কহিলাম—তাহার কারণ, সমস্ত মানুষই ভালবাসে এবং বিরহ বিচ্ছেদ মৃত্যুর দ্বারা পীড়িত ও ভীত। তোমার ঐ পাখাওয়ালা বিষণ্নমুখে ভৃত্যের আনন্দহারা সমস্ত পৃথিবীবাসী মানুষের বিষাদ অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

স্রোতস্বিনী কহিল—কেবল তাহাই নয়। মনে হয়, পৃথিবীতে যত দুঃখ তত দয়া কোথায় আছে? কত দুঃখ আছে যেখানে মানুষের সান্ত্বনা কোনকালে প্রবেশও করে না, অথচ কত জায়গা আছে যেখানে ভালবাসার অনাবশ্যক অতিবৃষ্টি হইয়া যায়। যখন দেখি আমার ঐ বেহারা ধৈর্য্যসহকারে মূকভাবে পাখা টানিয়া যাইতেছে, ছেলে দুটো উঠানে গড়াইতেছে, পড়িয়া গিয়া চীৎকারপূর্ব্বক কাঁদিয়া উঠিতেছে, বাপ মুখ ফিরাইয়া কারণ জানিবার চেষ্টা করিতেছে, পাখা ছাড়িয়া

উঠিয়া যাইতে পারিতেছে না ; জীবনে আনন্দ অল্প অথচ পেটের জ্বালা কম নহে, জীবনে যত বড় দুর্ঘটনা ঘটুক দুই মুষ্টি অন্নের জন্য নিয়মিত কাজ চালাইতেই হইবে, কোন ত্রুটি হইলে কেহ মাপ করিবে না—যথন ভাবিয়া দেখি এমন অসংখ্য লোক আছে যাহাদের দুঃখ কষ্ট যাহাদের মনুষ্যত্ব আমাদের কাছে যেন অনাবিষ্কৃত ; যাহাদিগকে আমরা কেবল ব্যবহারে লাগাই এবং বেতন দিই, স্নেহ দিই না, সান্ত্বনা দিই না, শ্রদ্ধা দিই না তথন বাস্তবিকই মনে হয় পৃথিবীর অনেকখানি যেন নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, আমাদের দৃষ্টির একেবারে অগোচর। কিন্তু সেই অজ্ঞাতনামা দীপ্তিহীন দেশের লোকেরাও ভালবাসে এবং ভালবাসার যোগ্য। আমার মনে হয়, যাহাদের মহিমা নাই, যাহারা একটা অস্বচ্ছ আবরণের মধ্যে বদ্ধ হইয়া আপনাকে ভালরূপ ব্যক্ত করিতে পারে না, এমন কি, নিজেকেও ভালরূপ চেনে না, মূকমুগ্ধভাবে সুখদুঃখবেদনা সহ্য করে, তাহাদিগকে মানবরূপে প্রকাশ করা, তাহাদিগকে আমাদের আত্মীয়রূপে পরিচিত করাইয়া দেওয়া, তাহাদের উপরে কাব্যের আলোক নিক্ষেপ করা আমাদের এথনকার কবিদের কর্ত্তব্য।

ক্ষিতি কহিল—পূর্ব্বকালে এক সময়ে সকল বিষয়ে প্রবলতার আদর কিছু অধিক ছিল। তথন মনুষ্যসমাজ অনেকটা অসহায় অরক্ষিত ছিল ; যে প্রতিভাশালী, যে ক্ষমতাশালী সেইই তথনকার সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া লইত। এথন সভ্যতার সুশাসনে সুশৃঙ্খলায় বিঘ্নবিপদ দূর হইয়া প্রবলতার অত্যধিক মর্য্যাদা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। এথন অকৃতি অক্ষমেরাও সংসারের খুব একটা বৃহৎ অংশের শরিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এথনকার কাব্য উপন্যাসও ভীষ্মদ্রোণকে ছাড়িয়া এই সমস্ত মূকজাতির ভাষা এই সমস্ত ভস্মাচ্ছন্ন অঙ্গারের আলোক প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সমীর কহিল, নবোদিত সাহিত্যসূর্য্যের আলোক প্রথমে অত্যুচ্চ

পর্ব্বতশিখরের উপরেই পতিত হইয়াছিল, এখন ক্রমে নিম্নবর্ত্তী উপত্যকার মধ্যে প্রসারিত হইয়া ক্ষুদ্র দরিদ্র কুটীরগুলিকেও প্রকাশমান করিয়া তুলিতেছে।

মন।

এই যে মধ্যাহ্ন কালে নদীর ধারে পাড়াগাঁয়ের একটি একতালা ঘরে বসিয়া আছি; টিকটিকি ঘরের কোণে টিকটিক্ করিতেছে; দেয়ালে পাখা টানিবার ছিদ্রের মধ্যে এক যোড়া চড়ুই পাখী বাসা তৈরি করিবার অভিপ্রায়ে বাহির হইতে কুটা সংগ্রহ করিয়া কিচ্‌মিচ্‌ শব্দে মহাব্যস্তভাবে ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে; নদীর মধ্যে নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে—উচ্চতটের অন্তরালে নীলাকাশে তাহাদের মাস্তুল এবং স্ফীত পালের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে; বাতাসটি স্নিগ্ধ, আকাশটি পরিষ্কার, পরপারের অতি দূরতীররেখা হইতে আর আমার বারান্দার সম্মুখবর্ত্তী বেড়া দেওয়া ছোট বাগানটি পর্য্যন্ত উজ্জ্বল রৌদ্রে একখণ্ড ছবির মত দেখাইতেছে;—এইত বেশ আছি; মায়ের কোলের মধ্যে সন্তান যেমন একটি উত্তাপ, একটি আরাম, একটি স্নেহ পায়, তেমনি এই পুরাতন প্রকৃতির কোল ঘেঁসিয়া বসিয়া একটি জীবনপূর্ণ আদরপূর্ণ মৃদু উত্তাপ চতুর্দ্দিক হইতে আমার সর্ব্বাঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। তবে এই ভাবে থাকিয়া গেলে ক্ষতি কি? কাগজ কলম লইয়া বসিবার জন্য কে তোমাকে খোঁচাইতেছিল? কোন বিষয়ে তোমার কি মত, কিসে তোমার সম্মতি বা অসম্মতি সে কথা লইয়া হঠাৎ ধুমধাম করিয়া কোমর বাঁধিয়া বসিবার কি দরকার ছিল? ঐ দেখ, মাঠের মাঝখানে, কোথাও কিছু নাই, একটা ঘূর্ণা বাতাস খানিকটা ধূলা এবং শুক্‌নো পাতার ওড়না উড়াইয়া কেমন চমৎকার ভাবে ঘুরিয়া নাচিয়া গেল! পদাঙ্গুলি-মাত্রের উপর ভর করিয়া দীর্ঘ সরল হইয়া কেমন ভঙ্গীটি করিয়া মুহূর্ত্ত-

কাল দাঁড়াইল, তাহার পর হৃদ্‌হাস্ করিয়া সমস্ত উড়াইয়া ছড়াইয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গেল তাহার ঠিকানা নাই। সম্বল ত ভারি! গোটাকতক খড়কুটা ধুলাবালি সুবিধামত যাহা হাতের কাছে আসে তাহাই লইয়া বেশ একটু ভাবভঙ্গী করিয়া কেমন একটি খেলা খেলিয়া লইল! এমনি করিয়া জনহীন মধ্যাহ্নে সমস্ত মাঠময় নাচিয়া বেড়ায়। না আছে তাহার কোন উদ্দেশ্য, না আছে তাহার কেহ দর্শক! না আছে তাহার মত, না আছে তাহার তত্ত্ব; না আছে সমাজ এবং ইতিহাস সম্বন্ধে অতি সমীচীন উপদেশ! পৃথিবীতে যাহা কিছু সর্ব্বাপেক্ষা অনাবশ্যক, সেই সমস্ত বিস্মৃত পরিত্যক্ত পদার্থগুলির মধ্যে একটি উত্তপ্ত ফুৎকার দিয়া তাহাদিগকে মুহূর্ত্তকালের জন্য জীবিত জাগ্রত সুন্দর করিয়া তোলে!

অম্‌নি যদি অত্যন্ত সহজে এক নিঃশ্বাসে কতকগুলা যাহাতাহা খাড়া করিয়া সুন্দর করিয়া ঘুরাইয়া উড়াইয়া লাঠিম খেলাইয়া চলিয়া যাইতে পারিতাম! অমনি অবলীলাক্রমে সৃজন করিতাম, অমনি ফুঁদিয়া ভাঙিয়া ফেলিতাম! চিন্তা নাই, চেষ্টা নাই, লক্ষ্য নাই; শুধু একটা নৃত্যের আনন্দ, শুধু একটা সৌন্দর্য্যের আবেগ, শুধু একটা জীবনের ঘূর্ণা! অবারিত প্রান্তর, অনাবৃত আকাশ, পরিব্যাপ্ত সূর্য্যালোক,—তাহারই মাঝখানে মুঠা মুঠা ধূলি লইয়া ইন্দ্রজাল নির্ম্মাণ করা, সে কেবল ক্ষ্যাপা হৃদয়ের উদার উল্লাসে।

এ হইলে ত বুঝা যায়। কিন্তু বসিয়া বসিয়া পাথরের উপর পাথর চাপাইয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া কতকগুলা নিশ্চল মতামত উচ্চ করিয়া তোলা! তাহার মধ্যে না আছে গতি, না আছে প্রীতি, না আছে প্রাণ! কেবল একটা কঠিন কীর্ত্তি। তাহাকে কেহ বা হাঁ করিয়া দেখে, কেহ বা পা দিয়া ঠেলে—যোগ্যতা যেমনি থাক্!

কিন্তু ইচ্ছা করিলেও এ কাজে ক্ষান্ত হইতে পারি কই! সভ্যতার খাতিরে মানুষ মন নামক আপনার এক অংশকে অপরিমিত প্রশ্রয়

দিয়া অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছে, এখন, তুমি যদি তাহাকে ছাড়িতে চাও সে তোমাকে ছাড়ে না।

লিখিতে লিখিতে আমি বাহিরে চাহিয়া দেখিতেছি ঐ একটি লোক রৌদ্র নিবারণের জন্য মাথায় একটি চাদর চাপাইয়া দক্ষিণ হস্তে শাল-পাতের ঠোঙায় খানিকটা দহি লইয়া রন্ধনশালা অভিমুখে চলিয়াছে। ওটি আমার ভৃত্য, নাম, নারায়ণ সিং। দিব্য হৃষ্টপুষ্ট, নিশ্চিন্ত, প্রফুল্ল-চিত্ত। উপযুক্ত সারপ্রাপ্ত পর্য্যাপ্ত-পল্লবপূর্ণ মসৃণ চিক্কণ কাঁঠাল-গাছটির মত। এইরূপ মানুষ এই বহিঃপ্রকৃতির সহিত ঠিক মিশ খায়। প্রকৃতি এবং ইহার মাঝখানে বড় একটা বিচ্ছেদচিহ্ন নাই। এই জীবধাত্রী শস্যশালিনী বৃহৎ বসুন্ধরার অঙ্গসংলগ্ন হইয়া এ লোকটি বেশ সহজে বাস করিতেছে, ইহার নিজের মধ্যে নিজের তিলমাত্র বিরোধ বিসম্বাদ নাই। ঐ গাছটি যেমন শিকড় হইতে পল্লবাগ্র পর্য্যন্ত কেবল একটি আতাগাছ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার আর কিছুব জন্য কোন মাথাব্যথা নাই, আমার হৃষ্টপুষ্ট নারায়ণ সিংটি তেমনি আদ্যোপান্ত কেবলমাত্র একখানি আস্ত নারায়ণ সিং।

কোন কৌতুকপ্রিয় শিশু-দেবতা যদি দুষ্টামি করিয়া ঐ আতা-গাছটির মাঝখানে কেবল একটি ফোঁটা মন ফেলিয়া দেয়! তবে ঐ সরস শ্যামল দারু-জীবনের মধ্যে কি এক বিষম উপদ্রব বাধিয়া যায়! তবে চিন্তায় উহার চিকণ সবুজ পাতাগুলি ভূর্জ্জপত্রের মত পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়, এবং গুঁড়ি হইতে প্রশাখা পর্য্যন্ত বৃদ্ধের ললাটের মত কুঞ্চিত হইয়া আসে। তখন বসন্তকালে আর কি অমন দুই চারিদিনের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ কচিপাতায় পুলকিত হইয়া উঠে, বর্ষাশেষে ঐ গুটি-আঁকা গোল গোল গুচ্ছ গুচ্ছ ফলে প্রত্যেক শাখা ভরিয়া যায়। তখন সমস্ত দিন একপায়ের উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে থাকে আমার কেবল কতকগুলা পাতা হইল কেন, পাখা হইল না কেন? প্রাণপণে সিধা হইয়া এত উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া

আছি, তবু কেন যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাইতেছি না? ঐ দিগন্তের পরপারে কি আছে? ঐ আকাশের তারাগুলি যে গাছের শাখায় ফুটিয়া আছে সে গাছে কেমন করিয়া নাগাল পাইব? আমি কোথা হইতে আসিলাম, কোথায় যাইব, এ কথা যতক্ষণ না স্থির হইবে ততক্ষণ আমি পাতা ঝরাইয়া, ডাল শুকাইয়া, কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া ধ্যান করিতে থাকিব। আমি আছি অথবা আমি নাই, অথবা আমি আছিও বটে নাইও বটে, এ প্রশ্নের যতক্ষণ মীমাংসা না হয় ততক্ষণ আমার জীবনে কোন সুখ নাই। দীর্ঘ বর্ষার পর যে দিন প্রাতঃকালে প্রথম সূর্য্য ওঠে, সে দিন আমার মজ্জার মধ্যে যে একটি পুলক সঞ্চার হয় সেটা আমি ঠিক কেমন করিয়া প্রকাশ করিব, এবং শীতান্তে ফাল্গুনের মাঝামাঝি যে দিন হঠাৎ সায়ংকালে একটা দক্ষিণের বাতাস উঠে, সে দিন ইচ্ছা করে—কি ইচ্ছা করে কে আমাকে বুঝাইয়া দিবে!

এই সমস্ত কাণ্ড! গেল বেচারার ফুল ফোটানো, রসশস্যপূর্ণ আতাফল পাকানো। যাহা আছে তাহা অপেক্ষা বেশি হইবার চেষ্টা করিয়া, যে রকম আছে আর একরকম হইবার ইচ্ছা করিয়া, না হয় এদিক, না হয় ওদিক। অবশেষে একদিন হঠাৎ অন্তর্বেদনায় গুঁড়ি হইতে অগ্রশাখা পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া বাহির হয়, একটা সাময়িক পত্রের প্রবন্ধ, একটা সমালোচনা, আরণ্যসমাজ সম্বন্ধে একটা অসাময়িক তত্ত্বোপদেশ। তাহার মধ্যে না থাকে সেই পল্লবমর্ম্মর, না থাকে সেই ছায়া, না থাকে সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্ত সরস সম্পূর্ণতা।

যদি কোন প্রবল সয়তান সরীসৃপের মত লুকাইয়া মাটির নীচে প্রবেশ করিয়া, শত লক্ষ আঁকা-বাঁকা শিকড়ের ভিতর দিয়া পৃথিবীর সমস্ত তরুলতা তৃণগুল্মের মধ্যে মনঃসঞ্চার করিয়া দেয় তাহা হইলে পৃথিবীতে কোথায় জুড়াইবার স্থান থাকে! ভাগ্যে বাগানে আসিয়া পাখীর গানের মধ্যে কোন অর্থ পাওয়া যায় না এবং অক্ষরহীন সবুজ পত্রের পরিবর্ত্তে

শাখায় শাখায় শুষ্ক শ্বেতবর্ণ মাসিকপত্র,' সংবাদপত্র এবং বিজ্ঞাপন ঝুলিতে দেখা যায় না!

ভাগ্যে গাছেদের মধ্যে চিন্তাশীলতা নাই! ভাগ্যে ধুতুরাগাছ কামিনীগাছকে সমালোচনা করিয়া বলে না, তোমার ফুলের কোমলতা আছে, কিন্তু ওজস্বিতা নাই এবং কুলফল কাঁঠালকে বলে না, তুমি আপনাকে বড় মনে কর কিন্তু আমি তোমা অপেক্ষা কুষ্মাণ্ডকে ঢের উচ্চ আসন দিই! কদলি বলে না, আমি সর্ব্বাপেক্ষা অল্পমূল্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎপত্র প্রচার করি, এবং কচু তাহার প্রতিযোগিতা করিয়া তদপেক্ষা সুলভ মূল্যে তদপেক্ষা বৃহৎপত্রেব আয়োজন করে না!

তর্কতাড়িত চিন্তাতাপিত বক্তৃতাশ্রান্ত মানুষ উদার উন্মুক্ত আকাশের চিন্তা-রেখাহীন জ্যোতির্ম্ময় প্রশস্ত ললাট দেখিয়া, অরণ্যের ভাষাহীন মর্ম্মর ও তরঙ্গের অর্থহীন কলধ্বনি শুনিয়া, এই মনোবিহীন অগাধ প্রশান্ত প্রকৃতির মধ্যে অবগাহন করিয়া তবে কতকটা স্নিগ্ধ ও সংযত হইয়া আছে। ঐ একটুখানি মনঃস্ফুলিঙ্গের দাহ নিবৃত্ত করিবার জন্য এই অনন্ত প্রসারিত অমনঃসমুদ্রের প্রশান্ত নীলাম্বুরাশির আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আসল কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের ভিতরকার সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া আমাদের মনটা অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে কোথাও আর কুলাইয়া উঠিতেছে না। খাইবার, পরিবার, জীবনধারণ করিবার, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার পক্ষে যতখানি আবশ্যক, মনটা তাহার অপেক্ষা ঢের বেশি বড় হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য, প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ সারিয়া ফেলিয়াও চতুর্দ্দিকে অনেকখানি মন বাকি থাকে। কাজেই সে বসিয়া বসিয়া ডায়ারি লেখে, তর্ক করে, সংবাদপত্রের সংবাদদাতা হয়, যাহাকে সহজে বোঝা যায় তাহাকে কঠিন করিয়া তুলে, যাহাকে এক-ভাবে বোঝা উচিত তাহাকে আর একভাবে দাঁড় করায়, যাহা কোন কালে

কিছুতেই বোঝা যায় না, অন্য সমস্ত ফেলিয়া তাহা লইয়াই লাগিয়া থাকে, এমন কি, এ সকল অপেক্ষাও অনেক গুরুতর গর্হিত কার্য্য করে।

কিন্তু আমার ঐ অনতিসভ্য নারায়ণ সিংহের মনটি উহার শরীরের মাপে ; উহার আবশ্যকের গায়ে গায়ে ঠিক ফিট্ করিয়া লাগিয়া আছে। উহার মনটি উহার জীবনকে শীতাতপ, অসুখ অস্বাস্থ্য এবং লজ্জা হইতে রক্ষা করে কিন্তু যখন-তখন উনপঞ্চাশ বায়ুবেগে চতুর্দ্দিকে উড়ু উড়ু করে না। এক আধটা বোতামের ছিদ্র দিয়া বাহিরের চোরা-হাওয়া উহার মানস আবরণের ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে যে কখনও একটু আধটু স্ফীত করিয়া তোলে না তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ততটুকু মনশ্চাঞ্চল্য তাহার জীবনের স্বাস্থ্যের পক্ষেই বিশেষ আবশ্যক।

অখণ্ডতা।

দীপ্তি কহিল, সত্য কথা বলিতেছি আমার ত মনে হয় আজকাল প্রকৃতির স্তব লইয়া তোমরা সকলে কিছু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছ।

আমি কহিলাম, দেবি, আর কাহারো স্তব বুঝি তোমাদের গায়ে সহে না।

দীপ্তি কহিল, যখন স্তব ছাড়া আর বেশী কিছু পাওয়া যায় না তখন ওটার অপব্যয় দেখিতে পারি না।

সমীর অত্যন্ত বিনম্রমনোহর হাস্যে গ্রীবা আনমিত করিয়া কহিল, ভগবতি, প্রকৃতির স্তব এবং তোমাদের স্তবে বড় একটা প্রভেদ নাই। ইহা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবে, যাহারা প্রকৃতির স্তব গান রচনা করিয়া থাকে তাহারা তোমাদেরই মন্দিরের প্রধান পূজারী।

দীপ্তি অভিমানভরে কহিল, অর্থাৎ যাহারা জড়ের উপাসনা করে তাহারাই আমাদের ভক্ত।

সমীর কহিল, এতবড় ভুলটা বুঝিলে কাজেই একটা সুদীর্ঘ কৈফিয়ত্ত দিতে হয়। আমাদের ভূত-সভার বর্ত্তমান সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বাবু তাঁর ডায়ারিতে মন নামক একটা দুরন্ত পদার্থের উপদ্রবের কথা বর্ণনা করিয়া যে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সে তোমরা সকলেই পাঠ করিয়াছ। আমি তাহার নিচেই গুটিকতক কথা লিখিয়া রাখিয়াছি, যদি সভ্যগণ অনুমতি করেন তবে পাঠ করি—আমার মনের ভাবটা তাহাতে পরিষ্কার হইবে।

ক্ষিতি করজোড়ে কহিল, দেখ ভাই সমীরণ, লেখক এবং পাঠকে যে সম্পর্ক সেইটেই স্বাভাবিক সম্পর্ক—তুমি ইচ্ছা করিয়া লিখিলে আমি ইচ্ছা করিয়া পড়িলাম, কোন পক্ষে কিছু বলিবার রহিল না! যেন খাপের সহিত তরবারী মিলিয়া গেল। কিন্তু তরবারি যদি অনিচ্ছুক অস্থিচর্ম্মের মধ্যে সেই প্রকার সুগভীর আত্মীয়তা স্থাপনে প্রবৃত্ত হয় তবে সেটা তেমন বেশ স্বাভাবিক এবং মনোহররূপে সম্পন্ন হয় না। লেখক এবং শ্রোতার সম্পর্কটাও সেইরূপ অস্বাভাবিক অসদৃশ। হে চতুরানন, পাপের যেমন শাস্তিই বিধান কর যেন আরজন্মে ডাক্তারের ঘোড়া, মাতালের স্ত্রী এবং প্রবন্ধলেখকের বন্ধু হইয়া জন্মগ্রহণ না করি!

ব্যোম একটা পরিহাস করিতে চেষ্টা করিল, কহিল, একে ত বন্ধু অর্থেই বন্ধন তাহার উপরে প্রবন্ধ-বন্ধন হইলে ফাঁসের উপর ফাঁস হয় গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকং।

দীপ্তি কহিল, হাসিবার জন্য দুইটি বৎসর সময় প্রার্থনা করি; ইতি-মধ্যে পাণিনি, অমরকোষ এবং ধাতুপাঠ আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে।

শুনিয়া ব্যোম অত্যন্ত কৌতুক লাভ করিল। হাসিতে হাসিতে কহিল বড় চমৎকার বলিয়াছ; আমার একটা গল্প মনে পড়িতেছে;—

স্রোতস্বিনী কহিল, তোমরা সমীরের লেখাটা আজ আর শুনিতে দি না দেখিতেছি। সমীর, তুমি পড়, উহাদের কথায় কর্ণপাত করিও না!

স্রোতস্বিনীর আদেশের বিরুদ্ধে কেহ আর আপত্তি করিল না। এমন কি, স্বয়ং ক্ষিতি শেল্‌ফের উপর হইতে ডায়ারির খাতাটি পাড়িয়া আনিল এবং নিতান্ত নিরীহ নিরুপায়ের মত সংযত হইয়া বসিয়া রহিল।

সমীর পড়িতে লাগিল—মানুষকে বাধ্য হইয়া পদে পদে মনের সাহায্য লইতে হয় এইজন্য ভিতরে ভিতরে আমরা সেটাকে দেখিতে পারি না। মন আমাদের অনেক উপকার করে কিন্তু তাহার স্বভাব এমনই যে, আমাদের সঙ্গে কিছুতেই সে সম্পূর্ণ মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে না। সর্ব্বদা খিট্‌খিট্‌ করে, পরামর্শ দেয়, উপদেশ দিতে আসে, সকল কাজেই হস্তক্ষেপ করে। সে যেন একজন বাহিরের লোক ঘরের হইয়া পড়িয়াছে—তাহাকে ত্যাগ করাও কঠিন, তাহাকে ভালবাসাও দুঃসাধ্য।

সে যেন অনেকটা বাঙালির দেশে ইংরাজের গবর্ণমেণ্টের মত। আমাদের সরল দিশি রকমের ভাব, আর তাহার জটিল বিদেশী রকমের আইন। উপকার করে কিন্তু আত্মীয় মনে করে না। সেও আমাদের বুঝিতে পারে না, আমরাও তাহাকে বুঝিতে পারি না। আমাদের যে-সকল স্বাভাবিক সহজ ক্ষমতা ছিল তাহার শিক্ষায় সে গুলি নষ্ট হইয়া গেছে এখন উঠিতে বসিতে তাহার সাহায্য ব্যতীত আর চলে না।

ইংরাজের সহিত আমাদের মনের আরও কতকগুলি মিল। এতকাল সে আমাদের মধ্যে বাস করিতেছে তবু সে বাসন্দা হইল না, তবু সে সর্ব্বদা উড়ু উড়ু করে। যেন কোন সুযোগে একটা ফর্লো পাইলেই মহাসমুদ্রপারে তাহার জন্মভূমিতে পাড়ি দিতে পারিলেই বাঁচে। সব চেয়ে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য এই যে, তুমি যতই তাহার কাছে নরম হইবে, যতই "যো হুজুর খোদাবন্দ" বলিয়া হাত জোড় করিবে ততই তাহার প্রতাপ বাড়িয়া উঠিবে, আর তুমি যদি ফস্ করিয়া হাতের আস্তিন গুটাইয়া ঘুষি উঁচাইতে পার, খৃষ্টান শাস্ত্রের অনুশাসন অগ্রাহ্য করিয়া চড়টার পরিবর্ত্তে চাপড়টা প্রয়োগ করিতে পার তবে সে জল হইয়া যাইবে।

মনের উপর আমাদের বিদ্বেষ এতই গভীর যে, যে কাজে তাহার হাত কম দেখা যায় তাহাকেই আমরা সব চেয়ে অধিক প্রশংসা করি। নীতিগ্রন্থে হঠকারিতার নিন্দা আছে বটে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার প্রতি আমাদের আন্তরিক অনুরাগ দেখিতে পাই। যে ব্যক্তি অত্যন্ত বিবেচনা-পূর্ব্বক অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া অতি সতর্কভাবে কাজ করে, তাহাকে আমরা ভালবাসি না কিন্তু যে ব্যক্তি সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত, অম্লান বদনে বেফাঁস কথা বলিয়া বসে এবং অবলীলাক্রমে বেয়াড়া কাজ করিয়া ফেলে লোকে তাহাকে ভালবাসে। যে ব্যক্তি ভবিষ্যতের হিসাব করিয়া বড় সাবধানে অর্থসঞ্চয় করে, লোকে ঋণের আবশ্যক হইলে তাহার নিকট গমন করে এবং তাহাকে মনে মনে অপরাধী করে, আর, যে নির্ব্বোধ নিজের ও পরিবারের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ গণনা মাত্র না করিয়া যাহা পায় তৎক্ষণাৎ মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়া বসে, লোকে অগ্রসর হইয়া তাহাকে ঋণদান করে এবং সকল সময় পরিশোধের প্রত্যাশা রাখে না। অনেক সময় অবিবেচনা অর্থাৎ মনোবিহীনতাকেই আমরা উদারতা বলি এবং যে মনস্বী হিতাহিত জ্ঞানের অনুদেশক্রমে যুক্তির লণ্ঠন হাতে লইয়া অত্যন্ত কঠিন সংকল্পের সহিত নিয়মের চুলচেরা পথ ধরিয়া চলে তাহাকে লোকে হিসাবী, বিষয়ী, সঙ্কীর্ণমনা প্রভৃতি অপবাদসূচক কথা বলিয়া থাকে।

মনটা যে আছে এইটুকু যে ভুলাইতে পারে তাহাকেই বলি মনোহর। মনের বোঝাটা যে অবস্থায় অনুভব করি না, সেই অবস্থাটাকে বলি আনন্দ। নেশা করিয়া বরং পশুর মত হইয়া যাই, নিজের সর্ব্বনাশ করি সেও স্বীকার তবু কিছু ক্ষণের জন্যে থানার মধ্যে পড়িয়াও সে উল্লাস সম্বরণ করিতে পারি না। মন যদি যথার্থ আমাদের আত্মীয় হইত এবং আত্মীয়ের মত ব্যবহার করিত তবে কি এমন উপকারী লোকটার প্রতি এতটা দূর অকৃতজ্ঞতার উদয় হইত?

বুদ্ধির অপেক্ষা প্রতিভাকে আমরা উচ্চাসন কেন দিই? বুদ্ধি প্রতি-

দিন প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের সহস্র কাজ করিয়া দিতেছে, সে না হইলে আমাদের জীবন রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইত, আর প্রতিভা কালেভদ্রে আমাদের কাজে আসে এবং অনেক সময় অকাজেও আসে। কিন্তু বুদ্ধিটা হইল মনের, তাহাকে পদক্ষেপ গণনা করিয়া চলিতে হয়, আর প্রতিভা মনের নিয়মাবলী রক্ষা না করিয়া হাওয়ার মত আসে, কাহারো আহ্বানও মানে না, নিষেধও অগ্রাহ্য করে।

প্রকৃতির মধ্যে সেই মন নাই এইজন্য প্রকৃতি আমাদের কাছে এমন মনোহর। প্রকৃতিতে একটার ভিতরে আরএকটা নাই। আরসোলার স্কন্ধে কাঁচপোকা বসিয়া শুষিয়া খাইতেছে না। মৃত্তিকা হইতে আর ঐ জ্যোতিঃসিঞ্চিত আকাশ পর্য্যন্ত তাহার এই প্রকাণ্ড ঘরকন্নার মধ্যে একটা ভিন্নদেশী পরের ছেলে প্রবেশ লাভ করিয়া দৌরাত্ম্য করিতেছে না।

সে একাকী, অখণ্ডসম্পূর্ণ, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন। তাহার অসীমনীল ললাটে বুদ্ধির রেখামাত্র নাই, কেবল প্রতিভার জ্যোতি চিরদীপ্যমান। যেমন অনায়াসে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পুষ্পমঞ্জরী বিকশিত হইয়া উঠিতেছে তেমনি অবহেলে একটা দুর্দ্দান্ত ঝড় আসিয়া সুখস্বপ্নের মত সমস্ত ভাঙিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সকলি যেন ইচ্ছায় হইতেছে, চেষ্টায় হইতেছে না। সে ইচ্ছা কখনও আদর করে, কখনও আঘাত করে। কখনো প্রেয়সী অপ্সরীর মত গান করে, কখনো ক্ষুধিত রাক্ষসীর ন্যায় গর্জ্জন করে।

চিন্তাপীড়িত সংশয়াপন্ন মানুষের কাছে এই দ্বিধাশূন্য অব্যবস্থিত ইচ্ছা-শক্তির বড় একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে। রাজভক্তি প্রভুভক্তি তাহার একটা নিদর্শন। যে রাজা ইচ্ছা করিলেই প্রাণ দিতে এবং প্রাণ লইতে পারে তাহার জন্য যত লোক ইচ্ছা করিয়া প্রাণ দিয়াছে, বর্ত্তমান যুগের নিয়মপাশবদ্ধ রাজার জন্য এত লোক স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আত্মবিসর্জ্জনে উদ্যত হয় না।

যাহারা মনুষ্যজাতির নেতা হইয়া জন্মিয়াছে তাহাদের মন দেখা যায় না। তাহারা কেন, কি ভাবিয়া, কি যুক্তি অনুসারে কি কাজ করিতেছে তৎক্ষণাৎ তাহা কিছুই বুঝা যায় না এবং মানুষ নিজের সংশয়-তিমিরাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র গহ্বর হইতে বাহির হইয়া পতঙ্গের মত ঝাঁকে ঝাঁকে তাহাদের মহত্বশিখার মধ্যে আত্মঘাতী হইয়া ঝাঁপ দেয়।

রমণীও প্রকৃতির মত। মন আসিয়া তাহাকে মাঝখান হইতে দুই ভাগ করিয়া দেয় নাই। সে পুষ্পের মত আগাগোড়া একখানি। এই জন্য তাহার গতিবিধি আচার-ব্যবহার এমন সহজসম্পূর্ণ। এইজন্য দ্বিধান্দোলিত পুরুষের পক্ষে রমণী "মরণং ধ্রুবং"।

প্রকৃতির ন্যায় রমণীরও কেবল ইচ্ছাশক্তি—তাহার মধ্যে যুক্তিতর্ক বিচার আলোচনা কেন-কি-বৃত্তান্ত নাই। কখনো সে চারিহস্তে অন্ন বিতরণ করে, কখনো সে প্রলয়মূর্ত্তিতে সংহার করিতে উদ্যত হয়। ভক্তেরা করজোড়ে বলে, তুমি মহামায়া, তুমি ইচ্ছাময়ী, তুমি প্রকৃতি, তুমি শক্তি।

সমীর হাঁপ ছাড়িবার জন্য একটু থামিবামাত্র ক্ষিতি গম্ভীর মুখ করিয়া কহিল—বাঃ চমৎকার! কিন্তু তোমার গা ছুঁইয়া বলিতেছি এক বর্ণ যদি বুঝিয়া থাকি! বোধ করি তুমি যাহাকে মন ও বুদ্ধি বলিতেছ প্রকৃতির মত আমার মধ্যেও সে জিনিষটার অভাব আছে কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে প্রতিভার জন্যও কাহারও নিকট হইতে প্রশংসা পাই নাই এবং আকর্ষণশক্তিও যে অধিক আছে তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

স্রোতস্বিনী চিন্তান্বিতভাবে কহিল, মন এবং বুদ্ধি শব্দটা যদি তুমি একই অর্থে ব্যবহার কর আর যদি বল আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত, তবে তোমার সহিত মতের মিল হইল না।

সমীর কহিল—আমি যে কথাটা বলিয়াছি তাহা রীতিমত তর্কের যোগ্য নহে। প্রথম বর্ষায় পদ্মা যে চরটা গড়িয়া দিয়া গেল তাহা বালি, তাহার উপরে লাঙল লইয়া পড়িয়া তাহাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিলে কোন

ফল পাওয়া যায় না ; ক্রমে ক্রমে দুই তিন বর্ষায় স্তরে স্তরে যখন তাহার উপর মাটি পড়িবে তখন সে কর্ষণ সহিবে। আমিও তেমনি চলিতে চলিতে স্রোতোবেগে একটা কথাকে কেবল প্রথম দাঁড় করাইলাম মাত্র। হয় ত দ্বিতীয় স্রোতে একেবারে ভাঙিতেও পারে অথবা পলি পড়িয়া উর্ব্বরা হইতেও আটক নাই। যাহা হউক আসামীর সমস্ত কথাটা শুনিয়া তার পর বিচার করা হউক।

মানুষের অন্তঃকরণের দুই অংশ আছে। একটা অচেতন, বৃহৎ গুপ্ত এবং নিশ্চেষ্ট, আর একটা সচেতন সক্রিয় চঞ্চল পরিবর্ত্তনশীল। যেমন মহাদেশ এবং সমুদ্র। সমুদ্র চঞ্চলভাবে যাহা কিছু সঞ্চয় করিতেছে ত্যাগ করিতেছে গোপনতলদেশে তাহাই দৃঢ় নিশ্চল আকারে উত্তরোত্তর রাশীকৃত হইয়া উঠিতেছে। সেইরূপ আমাদের চেতনা প্রতিদিন যাহা কিছু আনিতেছে ফেলিতেছে সেই সমস্ত ক্রমে সংস্কার স্মৃতি অভ্যাস আকারে একটি বৃহৎ গোপন আধারে অচেতনভাবে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। তাহাই আমাদের জীবনের ও চরিত্রের স্থায়ী ভিত্তি। সম্পূর্ণ তলাইয়া তাহার সমস্ত স্তরপর্য্যায় কেহ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। উপর হইতে যতটা দৃশ্যমান হইয়া উঠে, অথবা আকস্মিক ভূমিকম্পবেগে যে নিগূঢ় অংশ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয় তাহাই আমরা দেখিতে পাই।

এই মহাদেশেই শস্য পুষ্প ফল, সৌন্দর্য্য ও জীবন অতি সহজে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। ইহা দৃশ্যতঃ স্থির ও নিষ্ক্রিয়, কিন্তু ইহার ভিতরে একটি অনায়াসনৈপুণ্য একটি গোপন জীবনীশক্তি নিগূঢ়ভাবে কাজ করিতেছে। সমুদ্র কেবল ফুলিতেছে এবং দুলিতেছে, বাণিজ্যতরী ভাসাইতেছে এবং ডুবাইতেছে, অনেক আহরণ এবং সংহরণ করিতেছে, তাহার বলের সীমা নাই, কিন্তু তাহার মধ্যে জীবনীশক্তি ও ধারণীশক্তি নাই, সে কিছুই জন্ম দিতে ও পালন করিতে পারে না!

রূপকে যদি কাহারো আপত্তি না থাকে তবে আমি বলি আমাদের

এই চঞ্চল বহিরংশ পুরুষ, এবং এই বৃহৎ গোপন অচেতন অন্তরংশ নারী।

এই স্থিতি এবং গতি সমাজে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে ভাগ হইয়া গিয়াছে। সমাজের সমস্ত আহরণ, উপার্জ্জন, জ্ঞান ও শিক্ষা স্ত্রীলোকের মধ্যে গিয়া নিশ্চল স্থিতি লাভ করিতেছে। এইজন্য তাহার এমন সহজ বুদ্ধি সহজ শোভা অশিক্ষিত পটুতা। মনুষ্যসমাজে স্ত্রীলোক বহুকালের রচিত; এইজন্য তাহার সংস্কারগুলি এমন দৃঢ় ও পুরাতন, তাহার সকল কর্ত্তব্য এমন চিরাভ্যস্ত সহজসাধ্যের মত হইয়া চলিতেছে; পুরুষ উপ-স্থিত আবশ্যকের সন্ধানে সময়স্রোতে অনুক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিতেছে; কিন্তু সেই সমুদয় চঞ্চল প্রাচীন পরিবর্ত্তনের ইতিহাস স্ত্রীলোকের মধ্যে স্তরে স্তরে নিত্যভাবে সঞ্চিত হইতেছে।

পুরুষ আংশিক, বিচ্ছিন্ন, সামঞ্জস্যবিহীন। আর স্ত্রীলোক এমন একটি সঙ্গীত যাহা সমে আসিয়া সুন্দর সুগোলভাবে সম্পূর্ণ হইতেছে; তাহাতে উত্তরোত্তর যতই পদ সংযোগ ও নব নব তান যোজনা কর না কেন, সেই সমটি আসিয়া সমস্তটিকে একটি সুগোল সম্পূর্ণ গণ্ডী দিয়া ঘিরিয়া লয়। মাঝখানে একটি স্থির কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া আবর্ত্ত আপনার পরিধিবিস্তার করে, সেই জন্য হাতের কাছে যাহা আছে তাহা সে এমন সুনিপুণ সুন্দরভাবে টানিয়া আপনার করিয়া লইতে পাবে।

এই যে কেন্দ্রটি ইহা বুদ্ধি নহে, ইহা একটি সহজ আকর্ষণ-শক্তি। ইহা একটি ঐক্যবিন্দু। মনঃপদার্থটি যেখানে আসিয়া উঁকি মারেন সেখানে এই সুন্দর ঐক্য শতধা বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়।

ব্যোম অধীরের মত হইয়া হঠাৎ আরম্ভ করিয়া দিল—তুমি যাহাকে ঐক্য বলিতেছ আমি তাহাকে আত্মা বলি; তাহার ধর্ম্মই এই, সে পাঁচটা বস্তুকে আপনার চারিদিকে টানিয়া আনিয়া একটা গঠন দিয়া গড়িয়া তোলে; আর যাহাকে মন বলিতেছ সে পাঁচটা বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া

আপনাকে এবং তাহাদিগকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ফেলে। সেই জন্য আত্ম-যোগের প্রধান সোপান হইতেছে মনটাকে অবরুদ্ধ করা।

যোগের সকল তথ্য জানি না, কিন্তু শুনা যায় যোগবলে যোগীরা সৃষ্টি করিতে পারিতেন। প্রতিভার সৃষ্টিও সেইরূপ। কবিরা সহজ ক্ষমতা-বলে মনটাকে নিরস্ত করিয়া দিয়া অর্দ্ধ অচেতনভাবে যেন একটা আত্মার আকর্ষণে ভাব-রস-দৃশ্য-বর্ণ ধ্বনি কেমন করিয়া সঞ্চিত করিয়া পুঞ্জিত করিয়া জীবনে সুগঠনে মণ্ডিত করিয়া খাড়া করিয়া তুলেন।

বড় বড় লোকেরা যে বড় বড় কাজ করেন সেও এই ভাবে। যেখান-কার যেটি সে যেন একটি দৈবশক্তি প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া রেখায় রেখায় বর্ণে বর্ণে মিলিয়া যায়, একটি সুসম্পন্ন সুসম্পূর্ণ কায়ারূপে দাঁড়াইয়া যায়। প্রকৃতির সর্ব্বকনিষ্ঠজাত মন নামক দুরন্ত বালকটি যে একেবারে তিরস্কৃত বহিষ্কৃত হয় তাহা নহে, কিন্তু সে তদপেক্ষা উচ্চতর মহত্তর প্রতিভার অমোঘ মায়ামন্ত্রবলে মুগ্ধের মত কাজ করিয়া যায়, মনে হয় সমস্তই যেন যাদুতে হইতেছে, যেন সমস্ত ঘটনা, যেন বাহ্য অবস্থাগুলিও যোগবলে যথেচ্ছামত যথাস্থানে বিন্যস্ত হইয়া যাইতেছে। গারিবাল্ডি এমনি করিয়া ভাঙাচোরা ইটালিকে নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, ওয়াশিংটন অরণ্যপর্ব্বতবিক্ষিপ্ত আমেরিকাকে আপনার চারিদিকে টানিয়া আনিয়া একটি সাম্রাজ্যরূপে গড়িয়া দিয়া যান।

এই সমস্ত কার্য্য এক একটি যোগসাধন।

কবি যেমন কাব্য গঠন করেন, তানসেন যেমন তান লয় ছন্দে এক একটি গান সৃষ্টি করিতেন, রমণী তেমনি আপনার জীবনটি রচনা করিয়া তোলে। তেমনি অচেতনভাবে, তেমনি মায়ামন্ত্রবলে। পিতা পুত্র ভ্রাতা ভগ্নী অতিথি অভ্যাগতকে সুন্দর বন্ধনে বাঁধিয়া সে আপনার চারিদিকে গঠিত সজ্জিত করিয়া তোলে;—বিচিত্র উপাদান লইয়া বড় সুনিপুণ হস্তে একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করে; কেবল গৃহ কেন, রমণী যেখানে

যায় আপনার চারিদিককে একটি সৌন্দর্য্যসংযমে বাঁধিয়া আনে। নিজের চলাফেরা বেশভূষা কথাবার্ত্তা আকার ইঙ্গিতকে একটি অনির্ব্বচনীয় গঠন দান করে। তাহাকে বলে শ্রী। ইহা ত বুদ্ধির কাজ নহে, অনির্দ্দেশ্য প্রতিভার কাজ, মনের শক্তি নহে, আত্মার অভ্রান্ত নিগূঢ় শক্তি। এই যে ঠিক সুরটি ঠিক্ জায়গায় গিয়া লাগে, ঠিক কথাটি ঠিক জায়গায় আসিয়া বসে, ঠিক কাজটি ঠিক সময়ে নিষ্পন্ন হয়, ইহা একটি মহারহস্যময় নিখিল জগৎকেন্দ্রভূমি হইতে স্বাভাবিক স্ফটিকধারার ন্যায় উচ্ছ্বসিত উৎস। সেই কেন্দ্রভূমিটিকে অচেতন না বলিয়া অতিচেতন নাম দেওয়া উচিত।

প্রকৃতিতে যাহা সৌন্দর্য্য, মহৎ ও গুণী লোকে তাহাই প্রতিভা, এবং নারীতে তাহাই শ্রী, তাহাই নারীত্ব। ইহা কেবল পাত্রভেদে ভিন্ন বিকাশ।

অতঃপর ব্যোম সমীরের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,; তার পরে? তোমার লেখাটা শেষ করিয়া ফেল।

সমীর কহিল, আর আবশ্যক কি? আমি যাহা আরম্ভ করিয়াছি তুমি ত তাহার একপ্রকার উপসংহার করিয়া দিয়াছ।

ক্ষিতি কহিল, কবিরাজ মহাশয় সুরু করিয়াছিলেন, ডাক্তার মহাশয় সাঙ্গ করিয়া গেলেন, এখন আমরা হরি হরি বলিয়া বিদায় হই। মন কি, বুদ্ধি কি, আত্মা কি, সৌন্দর্য্য কি এবং প্রতিভাই বা কাহাকে বলে, এ সকল তত্ত্ব কস্মিন্‌কালে বুঝি নাই, কিন্তু বুঝিবার আশা ছিল, আজ সেটুকুও জলাঞ্জলি দিয়া গেলাম।

পশমের গুটিতে জটা পাকাইয়া গেলে যেমন নতমুখে সতর্ক অঙ্গুলিতে ধীরে ধীরে খুলিতে হয়, স্রোতস্বিনী চুপ করিয়া বসিয়া যেন তেমনি ভাবে মনে মনে কথাগুলিকে বহুযত্নে ছাড়াইতে লাগিল।

দীপ্তিও মৌনভাবে ছিল; সমীর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবিতেছ?

দীপ্তি কহিল, বাঙালীর মেয়েদের প্রতিভাবলে বাঙালীর ছেলেদের মত এমন অপরূপ সৃষ্টি কি করিয়া হইল তাই ভাবিতেছি।

আমি কহিলাম মাটির গুণে সকল সময়ে শিব গড়িতে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না।

গদ্য ও পদ্য।

আমি বলিতেছিলাম—বাঁশির শব্দে, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায়,—

—শ্রীযুক্ত ক্ষিতি আমার এই আকস্মিক ভাবোচ্ছ্বাসে হাস্যসম্বরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন—ভ্রাতঃ, করিতেছ কি! এইবেলা সময় থাকিতে ক্ষান্ত হও। কবিতা ছন্দে শুনিতেই ভাল লাগে—তাহাও সকল সময়ে নহে। কিন্তু সরল গদ্যের মধ্যে যদি তোমরা পাঁচজনে পড়িয়া কবিতা মিশাইতে থাক, তবে, তাহা প্রতিদিনের ব্যবহারের পক্ষে অযোগ্য হইয়া উঠে। বরং দুধে জল মিশাইলে চলে, কিন্তু জলে দুধ মিশাইলে তাহাতে প্রাত্যহিক স্নান পান চলে না। কবিতার মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে গদ্য মিশ্রিত করিলে আমাদের মত গদ্যজীবী লোকের পরিপাকের পক্ষে সহজ হয়—কিন্তু গদ্যের মধ্যে কবিত্ব একেবারে অচল।—

—বাস্! মনের কথা আর নহে। আমার শরৎ-প্রভাতের নবীন ভাবাঙ্কুরটি প্রিয় বন্ধু ক্ষিতি তাঁহার তীক্ষ্ণ নিড়ানীর একটি খোঁচায় একেবারে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিলেন। একটা তর্কের কথায় সহসা বিরুদ্ধ মত শুনিলে মানুষ তেমন অসহায় হইয়া পড়ে না, কিন্তু ভাবের কথায় কেহ মাঝখানে ব্যাঘাত করিলে বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে হয়। কারণ, ভাবের কথায় শ্রোতার সহানুভূতির প্রতিই একমাত্র নির্ভর। শ্রোতা যদি বলিয়া উঠে, কি পাগ্‌লামি করিতেছ, তবে কোন যুক্তিশাস্ত্রে তাহার কোন উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

এইজন্য ভাবের কথা পাড়িতে হইলে প্রাচীন গুণীরা শ্রোতাদের হাতে-পায়ে ধরিয়া কাজ আরম্ভ করিতেন। বলিতেন, "সুধীগণ মরালের মত নীর পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীর গ্রহণ করেন। নিজের ক্ষমতা স্বীকার করিয়া সভাস্থ লোকের গুণগ্রাহিতার প্রতি একান্ত নির্ভর প্রকাশ করিতেন। কখনো বা ভবভূতির ন্যায় সুমহৎ দম্ভের দ্বারা আরম্ভ হইতেই সকলকে অভিভূত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেন। এবং এত করিয়াও ঘরে ফিরিয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়া বলিতেন, যে দেশে কাচ এবং মাণিকের এক দর, সে দেশকে নমস্কার। দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতেন "হে চতুর্ম্মুখ, পাপের ফল আর যেমনই দাও সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু অরসিকের কাছে রসের কথা বলা এ কপালে লিখিয়ো না, লিখিয়ো না, লিখিয়ো না!" বাস্তবিক, এমন শাস্তি আর নাই। জগতে অরসিক না থাকুক, এত বড় প্রার্থনা দেবতার কাছে করা যায় না, কারণ তাহা হইলে জগতে জনসংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া যায়। অরসিকের দ্বারাই পৃথিবীর অধিকাংশ কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাঁহারা জনসমাজের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; তাঁহারা না থাকিলে সভা বন্ধ, কমিটি অচল, সংবাদপত্র নীরব, সমালোচনার কোটা একেবারে শূন্য; এজন্য, তাঁহাদের প্রতি আমার যথেষ্ট সম্মান আছে। কিন্তু ঘানিযন্ত্রে শর্ষপ ফেলিলে অজস্রধারে তৈল বাহির হয় বলিয়া তাহার মধ্যে ফুল ফেলিয়া কেহ মধুর প্রত্যাশা করিতে পারে না—অতএব হে চতুর্ম্মুখ, ঘানিতে চিরদিন সংসারে রক্ষা করিও, কিন্তু তাহার মধ্যে ফুল ফেলিয়ো না এবং গুণীজনের হৃৎপিণ্ড নিক্ষেপ করিয়ো না!

শ্রীমতী স্রোতস্বিনীর কোমল হৃদয় সর্ব্বদাই আর্ত্তের পক্ষে। তিনি আমার দুরবস্থায় কিঞ্চিৎ কাতর হইয়া কহিলেন "কেন, গদ্যে পদ্যে এতই কি বিচ্ছেদ!"

আমি কহিলাম—পদ্য অন্তঃপুর, গদ্য বহির্ভবন। উভয়ের ভিন্ন স্থান

নির্দ্দিষ্ট আছে। অবলা বাহিরে বিচরণ করিলে তাহার বিপদ ঘটিবেই এমন কোন কথা নাই। কিন্তু যদি কোন রূঢ়স্বভাব ব্যক্তি তাহাকে অপমান করে, তবে ক্রন্দন ছাড়া তাহার আর কোন অস্ত্র নাই। এইজন্য অন্তঃপুর তাহার পক্ষে নিরাপদ দুর্গ। পদ্য কবিতার সেই অন্তঃপুর। ছন্দের প্রাচীরের মধ্যে সহসা কেহ তাহাকে আক্রমণ করে না। প্রত্যহের এবং প্রত্যেকের ভাষা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া সে আপনার জন্য একটি দুরূহ অথচ সুন্দর সীমা রচনা করিয়া রাখিয়াছে। আমার হৃদয়ের ভাবটিকে যদি সেই সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতাম, তবে ক্ষিতি কেন, কোন ক্ষিতিপতির সাধ্য ছিল না তাহাকে সহসা আসিয়া পরিহাস করিয়া যায়!

ব্যোম গুড়গুড়ির নল মুখ হইতে নামাইয়া নিমীলিতনেত্রে কহিলেন — আমি ঐক্যবাদী। একা গদ্যের দ্বারাই আমাদের সকল আবশ্যক সুসম্পন্ন হইতে পারিত, মাঝে হইতে পদ্য আসিয়া মানুষের মনোরাজ্যে একটা অনাবশ্যক বিচ্ছেদ আনয়ন করিয়াছে; কবি নামক একটা স্বতন্ত্র-জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। সম্প্রদায়বিশেষের হস্তে যখন সাধারণের সম্পত্তি অর্পিত হয়, তখন তাহার স্বার্থ হয় যাহাতে সেটা অন্যের অনায়ত্ত হইয়া উঠে। কবিরাও ভাবের চতুর্দ্দিকে কঠিন বাধা নির্ম্মাণ করিয়া কবিত্ব নামক একটা কৃত্রিম পদার্থ গড়িয়া তুলিয়াছে। কৌশল-বিমুগ্ধ জনসাধারণ বিস্ময় রাখিবার স্থান পায় না। এমনি তাহাদের অভ্যাস বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে ছন্দ ও মিল আসিয়া ক্রমাগত হাতুড়ি না পিটাইলে তাহাদের হৃদয়ের চৈতন্য হয় না, স্বাভাবিক সরল ভাব ত্যাগ করিয়া ভাবকে প্যাঁচরঙা ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হয়। ভাবের পক্ষে এমন হীনতা আর কিছুই হইতে পারে না। পদ্যটা না কি আধুনিক সৃষ্টি, সেইজন্যে, সে হঠাৎ-নবাবের মত সর্ব্বদাই পেখম তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়ায়, আমি তাহাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারি না। এই বলিয়া ব্যোম পুনর্ব্বার গুড়গুড়ি মুখে দিয়া টানিতে লাগিলেন।

শ্রীমতী দীপ্তি ব্যোমের প্রতি অবজ্ঞাকটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন—বিজ্ঞানে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বলিয়া একটা তত্ত্ব বাহির হইয়াছে। সেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়ম কেবল জন্তুদের মধ্যে নহে, মানুষের রচনার মধ্যেও খাটে। সেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রভাবেই ময়ূরীর কলাপের আবশ্যক হয় নাই, ময়ূরের পেখম ক্রমে প্রসারিত হইয়াছে। কবিতার পেখমও সেই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল, কবিদিগের ষড়যন্ত্র নহে। অসভ্য হইতে সভ্য এমন কোন দেশ আছে যেখানে কবিত্ব স্বভাবতই ছন্দের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠে নাই!

শ্রীযুক্ত সমীর এতক্ষণ মৃদুহাস্যমুখে চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। দীপ্তি যখন আমাদের আলোচনায় যোগ দিলেন, তখন তাঁহার মাথায় একটা ভাবের উদয় হইল। তিনি একটা সৃষ্টিছাড়া কথার অবতারণা করিলেন। তিনি বলিলেন, কৃত্রিমতাই মনুষ্যের সর্ব্বপ্রধান গৌরব। মানুষ ছাড়া আর কাহারো কৃত্রিম হইবার অধিকার নাই। গাছকে আপনার পল্লব প্রস্তুত করিতে হয় না, আকাশকে আপনার নীলিমা নির্ম্মাণ করিতে হয় না, ময়ূরের পুচ্ছ প্রকৃতি স্বহস্তে চিত্রিত করিয়া দেন। কেবল মানুষকেই বিধাতা আপনার সৃজন-কার্য্যের অ্যাপ্রেণ্টিস্ করিয়া দিয়াছেন, তাহার প্রতি ছোটখাটো সৃষ্টির ভার দিয়াছেন। সেই কার্য্যে যে যত দক্ষতা দেখাইয়াছে, সে তত আদর পাইয়াছে। পদ্য গদ্য অপেক্ষা অধিক কৃত্রিম বটে; তাহাতে মানুষের সৃষ্টি বেশী আছে; তাহাতে বেশী রং ফলাইতে হইয়াছে, বেশী যত্ন করিতে হইয়াছে। আমাদের মনের মধ্যে যে বিশ্বকর্ম্মা আছেন, যিনি আমাদের অন্তরের নিভৃত সৃজনকক্ষে বসিয়া নানা গঠন, নানা বিন্যাস, নানা প্রয়াস, নানা প্রকাশ-চেষ্টায় সর্ব্বদা নিযুক্ত আছেন, পদ্যে তাঁহারই নিপুণ হস্তের কারুকার্য্য অধিক আছে। সেই তাহার প্রধান গৌরব। অকৃত্রিম ভাষা জলকল্লোলের, অকৃত্রিম ভাষা পল্লব-মর্ম্মরের, কিন্তু মন যেখানে আছে সেখানে বহুযত্নরচিত কৃত্রিম ভাষা।

স্রোতস্বিনী অবহিত ছাত্রীর মত সমীরের সমস্ত কথা শুনিলেন। তাঁহার সুন্দর নম্র মুখের উপর একটা যেন নূতন আলোক আসিয়া পড়িল। অন্যদিন নিজের একটা মত বলিতে যেরূপ ইতস্ততঃ করিতেন, আজ সেরূপ না করিয়া একেবারে আরম্ভ করিলেন, সমীরের কথায় আমার মনে একটা ভাবের উদয় হইয়াছে—আমি ঠিক পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিব কি না জানি না। সৃষ্টির যে অংশের সহিত আমাদের হৃদয়ের যোগ—অর্থাৎ, সৃষ্টির যে অংশ শুদ্ধমাত্র আমাদের মনে জ্ঞানসঞ্চার করে না, হৃদয়ে ভাবসঞ্চার করে, যেমন ফুলের সৌন্দর্য্য, পর্ব্বতের মহত্ত্ব,—সেই অংশে কতই নৈপুণ্য খেলাইতে, কতই রঙ ফলাইতে, কত আয়োজন করিতে হইয়াছে; ফুলের প্রত্যেক পাপড়িটিকে কত যত্নে সুগোল সুডোল করিতে হইয়াছে, তাহাকে বৃন্তের উপর কেমন সুন্দর বঙ্কিম ভঙ্গীতে দাঁড় করাইতে হইয়াছে, পর্ব্বতের মাথায় চিরতুষারমুকুট পরাইয়া তাহাকে নীলাকাশের মধ্যে কেমন মহিমার সহিত আসীন করা হইয়াছে, পশ্চিম সমুদ্রতীরের সূর্য্যাস্তপটের উপর কত রঙের কত তুলি পড়িয়াছে। ভূতল হইতে নভস্তল পর্য্যন্ত কত সাজসজ্জা, কত রংচং, কত ভাবভঙ্গী, তবে আমাদের এই ক্ষুদ্র মানুষের মন ভুলিয়াছে! ঈশ্বর তাঁহার রচনায় যেখানে প্রেম, সৌন্দর্য্য, মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহাকেও গুণপনা করিতে হইয়াছে। সেখানে তাঁহাকেও ধ্বনি এবং ছন্দ, বর্ণ এবং গন্ধ বহুযত্নে বিন্যাস করিতে হইয়াছে। অরণ্যের মধ্যে যে ফুল ফুটাইয়াছেন, তাহাতে কত পাপড়ির অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়াছেন এবং আকাশপটে একটিমাত্র জ্যোতিঃপাত করিতে তাঁহাকে যে কেমন সুনির্দ্দিষ্ট সুসংযত ছন্দ রচনা করিতে হইয়াছে —বিজ্ঞান তাহার পদ ও অক্ষর গণনা করিতেছে। ভাবপ্রকাশ করিতে মানুষকেও নানা নৈপুণ্য অবলম্বন করিতে হয়। শব্দের মধ্যে সঙ্গীত আনিতে হয়, সৌন্দর্য্য আনিতে হয়, তবে মনের কথা মনের মধ্যে গিয়া

প্রবেশ করে। ইহাকে যদি কৃত্রিমতা বল, তবে সমস্ত বিশ্বরচনা কৃত্রিম।

এই বলিয়া স্রোতস্বিনী আমার মুখের দিকে চাহিয়া যেন সাহায্য প্রার্থনা করিল—তাহার চোখের ভাবটা এই, আমি কি কতকগুলা বকিয়া গেলাম তাহার ঠিক নাই, তুমি ঐটেকে যদি পার একটু পরিষ্কার করিয়া বল না। এমন সময় ব্যোম হঠাৎ বলিয়া উঠিল, সমস্ত বিশ্বরচনা যে কৃত্রিম এমন মতও আছে। স্রোতস্বিনী যেটাকে ভাবের প্রকাশ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন, অর্থাৎ দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ ইত্যাদি, সেটা যে মায়ামাত্র, অর্থাৎ আমাদের মনের কৃত্রিম রচনা একথা অপ্রমাণ করা বড় কঠিন।

ক্ষিতি মহা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন - তোমরা সকলে মিলিয়া ধান ভানিতে শিবের গান তুলিয়াছ। কথাটা ছিল এই, ভাব প্রকাশের জন্য পদ্যের কোন আবশ্যক আছে কি না। তোমরা তাহা হইতে একেবারে সমুদ্র পার হইয়া সৃষ্টিতত্ব, লয়তত্ব, মায়াবাদ প্রভৃতি চোরা-বালির মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছ। আমার বিশ্বাস, ভাবপ্রকাশের জন্য ছন্দের সৃষ্টি হয় নাই। ছোট ছেলেরা যেমন ছড়া ভালবাসে, তাহার ভাবমাধুর্য্যের জন্য নহে—কেবল তাহার ছন্দোবদ্ধ ধ্বনির জন্য, তেমনি অসভ্য অবস্থায় অর্থহীন কথার ঝঙ্কারমাত্রই কানে ভাল লাগিত। এই জন্য অর্থহীন ছড়াই মানুষের সর্ব্বপ্রথম কবিত্ব। মানুষের এবং জাতির বয়স ক্রমে যত বাড়িতে থাকে, ততই ছন্দের সঙ্গে অর্থ সংযোগ না করিলে তাহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হয় না। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও অনেক সময়ে মানুষের মধ্যে দুই একটা গোপন ছায়াময় স্থানে বালক-অংশ থাকিয়া যায়; ধ্বনিপ্রিয়তা, ছন্দপ্রিয়তা সেই গুপ্ত বালকের স্বভাব। আমাদের বয়ঃপ্রাপ্ত অংশ অর্থ চাহে, ভাব চাহে; আমাদের অপরিণত অংশ ধ্বনি চাহে, ছন্দ চাহে।

দীপ্তি গ্রীবা বক্র করিয়া কহিলেন—ভাগ্যে আমাদের সমস্ত অংশ

বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ওঠে না! মানুষের নাবালক অংশটিকে আমি অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিই, তাহারই কল্যাণে জগতে যা' কিছু মিষ্টত্ব আছে।

সমীর কহিলেন—যে ব্যক্তি একেবারে পুরোপুরি পাকিয়া গিয়াছে—সেই জগতের জ্যাঠা ছেলে। কোন রকমের খেলা, কোন রকমের ছেলেমানুষী তাহার পছন্দসই নহে। আমাদের আধুনিক হিন্দুজাতটা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জ্যাঠা জাত, অত্যন্ত বেশীমাত্রায় পাকামি করিয়া থাকে, অথচ নানান্ বিষয়ে কাঁচা। জ্যাঠা ছেলের এবং জ্যাঠা জাতির উন্নতি হওয়া বড় দুরূহ, কারণ, তাহার মনের মধ্যে নম্রতা নাই। আমার এ কথাটা প্রাইভেট্। কোথাও যেন প্রকাশ না হয়। আজকাল লোকের মেজাজ ভাল নয়।

আমি কহিলাম—যখন কলের জাঁতা চালাইয়া সহরের রাস্তা মেরামত হয়, তখন কাষ্ঠফলকে লেখা থাকে—কল চলিতেছে সাবধান! আমি ক্ষিতিকে পূর্ব্বে হইতে সাবধান করিয়া দিতেছি আমি কল চালাইব। বাষ্পযানকে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করেন কিন্তু সেই কল্পনা-বাষ্পযোগে গতিবিধিই আমার সহজসাধ্য বোধ হয়। গদ্যপদ্যের প্রসঙ্গে আমি আর একবার শিবের গান গাহিব। ইচ্ছা হয় শোন।—

গতির মধ্যে খুব একটা পরিমাণ-করা নিয়ম আছে। পেণ্ডুলম নিয়মিত তালে দুলিয়া থাকে। চলিবার সময় মানুষের পা মাত্রা রক্ষা করিয়া উঠে পড়ে; এবং সেই সঙ্গে তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমান তাল ফেলিয়া গতির সামঞ্জস্য বিধান করিতে থাকে। সমুদ্র-তরঙ্গের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড লয় আছে। এবং পৃথিবী এক মহাছন্দে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে—

ব্যোমচন্দ্র অকস্মাৎ আমাকে কথার মাঝখানে থামাইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—স্থিতিই যথার্থ স্বাধীন, সে আপনার অটল গাম্ভীর্য্যে বিরাজ করে—কিন্তু গতিকে প্রতিপদে আপনাকে নিয়মে বাঁধিয়া চলিতে

হয়। অথচ সাধারণের মধ্যে একটা ভ্রান্তসংস্কার আছে যে, গতিই স্বাধীনতার যথার্থ স্বরূপ, এবং স্থিতিই বন্ধন। তাহার কারণ, ইচ্ছাই মনের একমাত্র গতি এবং ইচ্ছা অনুসারে চলাকেই মূঢ় লোকে স্বাধীনতা বলে। কিন্তু আমাদের পণ্ডিতেরা জানিতেন, ইচ্ছাই আমাদের সকল গতির কারণ, সকল বন্ধনের মূল; এই জন্য মুক্তি, অর্থাৎ চরমস্থিতি লাভ করিতে হইলে ঐ ইচ্ছাটাকে গোড়া-ঘেঁষিয়া কাটিয়া ফেলিতে তাঁহারা বিধান দেন, দেহমনের সর্ব্বপ্রকার গতিরোধ করাই যোগসাধন।

সমীর ব্যোমের পৃষ্ঠে হাত দিয়া সহাস্যে কহিলেন, একটা মানুষ যখন একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছে, তখন মাঝখানে তাহার গতিরোধ করার নাম গোলযোগসাধন।

আমি কহিলাম, বৈজ্ঞানিক ক্ষিতির নিকট অবিদিত নাই যে, গতির সহিত গতির, এক কম্পনের সহিত অন্য কম্পনের ভারী একটা কুটুম্বিতা আছে। সা সুরের তার বাজিয়া উঠিলে মা সুরের তার কাঁপিয়া উঠে। আলোক-তরঙ্গ, উত্তাপ-তরঙ্গ, ধ্বনি-তরঙ্গ, স্নায়ু-তরঙ্গ, প্রভৃতি সকলপ্রকার তরঙ্গের মধ্যে এইরূপ একটা আত্মীয়তার বন্ধন আছে। আমাদের চেতনাও একটা তরঙ্গিত কম্পিত অবস্থা। এইজন্য বিশ্বসংসারের বিচিত্র কম্পনের সহিত তাহার যোগ আছে। ধ্বনি আসিয়া তাহার স্নায়ুদোলায় দোল দিয়া যায়, আলোক-রশ্মি আসিয়া তাহার স্নায়ুতন্ত্রীতে অলৌকিক অঙ্গুলি আঘাত করে। তাহার চিরকম্পিত স্নায়ুজাল তাহাকে জগতের সমুদায় স্পন্দনের ছন্দে নানাসূত্রে বাঁধিয়া জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে।

হৃদয়ের বৃত্তি, ইংরাজিতে যাহাকে ইমোশন্ বলে, তাহা আমাদের হৃদয়ের আবেগ, অর্থাৎ গতি; তাহার সহিতও অন্যান্য বিশ্বকম্পনের একটা মহা ঐক্য আছে। আলোকের সহিত, বর্ণের সহিত, ধ্বনির সহিত তাহার একটা স্পন্দনের যোগ, একটা সুরের মিল আছে।

এইজন্য সঙ্গীত এমন অব্যবহিতভাবে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে উভয়ের মধ্যে মিলন হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। ঝড়ে এবং সমুদ্রে যেমন মাতামাতি হয়, গানে এবং প্রাণে তেমনি একটি নিবিড় সংঘর্ষ হইতে থাকে।

কারণ সঙ্গীত আপনার কম্পন সঞ্চার করিয়া আমাদের সমস্ত অন্তরকে চঞ্চল করিয়া তোলে। একটা অনির্দ্দেশ্য আবেগে আমাদের প্রাণকে পূর্ণ করিয়া দেয়। মন উদাস হইয়া যায়। অনেক কবি এই অপরূপ ভাবকে অনন্তের জন্য আকাঙ্ক্ষা বলিয়া নাম দিয়া থাকেন। আমিও কখনো কখনো এমনতর ভাব অনুভব করিয়াছি এবং এমনতর ভাষাও প্রয়োগ করিয়া থাকিব। কেবল সঙ্গীত কেন, সন্ধ্যাকাশের সূর্য্যাস্তছটাও কতবার আমার অন্তরের মধ্যে অনন্ত বিশ্বজগতের হৃৎ-স্পন্দন সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে; যে একটি অনির্ব্বচনীয় বৃহৎ সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়াছে, তাহার সহিত আমার প্রতিদিনের সুখদুঃখের কোন যোগ নাই, তাহা বিশ্বেশ্বরের মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নিখিল চরাচরের সামগান। কেবল সঙ্গীত এবং সূর্য্যাস্ত কেন, যখন কোন প্রেম আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে বিচলিত করিয়া তোলে, তখন তাহাও আমাদিগকে সংসারের ক্ষুদ্র বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অনন্তের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। তাহা একটা বৃহৎ উপাসনার আকার কারণ করে, দেশকালের শিলামুখ বিদীর্ণ করিয়া উৎসের মত অনন্তের দিকে উৎসারিত হইতে থাকে।

এইরূপে প্রবল স্পন্দনে আমাদিগকে বিশ্বস্পন্দনের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। বৃহৎ সৈন্য যেমন পরস্পরের নিকট হইতে ভাবের উন্মত্ততা আকর্ষণ করিয়া লইয়া একপ্রাণ হইয়া উঠে, তেমনি বিশ্বের কম্পন সৌন্দর্য্যযোগে যখন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তখন আমরা সমস্ত জগতের সহিত একতালে পা ফেলিতে থাকি, নিখিলের প্রত্যেক

কম্পমান পরমাণুর সহিত একতালে মিলিয়া অনিবার্য্য আবেগে অনন্তের দিকে ধাবিত হই।

এই ভাবকে কবিরা কত ভাষায় কত উপায়ে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং কত লোকে তাহা কিছুই বুঝিতে পারে নাই—মনে করিয়াছে উহা কবিদের কাব্যকুয়াশা মাত্র।

কারণ, ভাষার ত হৃদয়ের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ নাই, তাহাকে মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। সে দূতমাত্র, হৃদয়ের খাস্‌মহলে তাহার অধিকার নাই, আম্ দরবারে আসিয়া সে আপনার বার্ত্তা জানাইয়া যায় মাত্র। তাহাকে বুঝিতে, অর্থ করিতে অনেকটা সময় যায়। কিন্তু সঙ্গীত একেবারে এক ইঙ্গিতেই হৃদয়কে আলিঙ্গন করিয়া ধরে।

এইজন্য কবিরা ভাষার সঙ্গে সঙ্গে একটা সঙ্গীত নিযুক্ত করিয়া দেন। সে আপন মায়াস্পর্শে হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করিয়া দেয়। ছন্দে এবং ধ্বনিতে যখন হৃদয় স্বতই বিচলিত হইয়া উঠে, তখন ভাষার কার্য্য অনেক সহজ হইয়া আসে। দূরে যখন বাঁশি বাজিতেছে, পুষ্পকানন যখন চোখের সম্মুখে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন প্রেমের কথার অর্থ কত সহজে বোঝা যায়। সৌন্দর্য্য যেমন মুহূর্ত্তের মধ্যে হৃদয়ের সহিত ভাবের পরিচয় সাধন করিতে পারে এমন আর কেহ নয়।

সুর এবং তাল, ছন্দ এবং ধ্বনি, সঙ্গীতের দুই অংশ। গ্রীকরা "জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সঙ্গীত" বলিয়া একটা কথা বলিয়া গিয়াছেন, সেক্স্‌পিয়রেও তাহার উল্লেখ আছে। তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, একটা গতির সঙ্গে আর একটা গতির বড় নিকট-সম্বন্ধ। অনন্ত আকাশ জুড়িয়া চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারা তালে তালে নৃত্য করিয়া চলিয়াছে। তাহার বিশ্বব্যাপী মহা সঙ্গীতটি যেন কানে শোনা যায় না, চোখে দেখা যায়। ছন্দ সঙ্গীতের একটা রূপ। কবিতায় সেই ছন্দ এবং ধ্বনি দুই মিলিয়া ভাবকে কম্পান্বিত এবং সজীব করিয়া তোলে, বাহিরের ভাষাকেও হৃদ-

য়ের ধন করিয়া দেয়। যদি কৃত্রিম কিছু হয় ত ভাষাই কৃত্রিম, সৌন্দর্য্য কৃত্রিম নহে। ভাষা মানুষের, সৌন্দর্য্য সমস্ত জগতের এবং জগতের সৃষ্টিকর্ত্তার।

শ্রীমতী স্রোতস্বিনী আনন্দোজ্জ্বলমুখে কহিলেন—নাট্যাভিনয়ে আমাদের হৃদয় বিচলিত করিবার অনেকগুলি উপকরণ একত্রে বর্ত্তমান থাকে। সঙ্গীত, আলোক, দৃশ্যপট, সুন্দর সাজসজ্জা সকলে মিলিয়া নানা দিক হইতে আমাদের চিত্তকে আঘাত করিয়া চঞ্চল করে, তাহার মধ্যে একটা অবিশ্রাম ভাবস্রোত নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানা কার্য্যরূপে প্রবাহিত হইয়া চলে—আমাদের মনটা নাট্যপ্রবাহের মধ্যে একেবারে নিরুপায় হইয়া আত্মবিসর্জ্জন করে এবং দ্রুতবেগে ভাসিয়া চলিয়া যায়। অভিনয়-স্থলে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন আর্টের মধ্যে কতটা সহযোগিতা আছে, সেখানে সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রবিদ্যা এবং নাট্যকলা এক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সম্মিলিত হয়, বোধ হয় এমন আর কোথাও দেখা যায় না।

কাব্যের তাৎপর্য্য।

স্রোতস্বিনী আমাকে কহিলেন, কচ-দেবযানীসংবাদ সম্বন্ধে তুমি যে কবিতা লিখিয়াছ তাহা তোমার মুখে শুনিতে ইচ্ছা করি।

শুনিয়া আমি মনে মনে কিঞ্চিৎ গর্ব্ব অনুভব করিলাম, কিন্তু দর্পহারী মধুসূদন তখন সজাগ ছিলেন তাই দীপ্তি অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, তুমি রাগ করিয়ো না, সে কবিতাটার কোন তাৎপর্য্য কিম্বা উদ্দেশ্য আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ও লেখাটা ভাল হয় নাই।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। মনে মনে কহিলাম, আর একটু বিনয়ের সহিত মত প্রকাশ করিলে সংসারের বিশেষ ক্ষতি অথবা সত্যের বিশেষ অপলাপ হইত না, কারণ, লেখার দোষ থাকাও যেমন আশ্চর্য্য

নহে তেমনি পাঠকের কাব্যবোধশক্তির খর্ব্বতাও নিতান্তই অসম্ভব বলিতে পারি না। মুখে বলিলাম, যদিও নিজের রচনা সম্বন্ধে লেখকের মনে অনেক সময়ে অসন্দিগ্ধ মত থাকে তথাপি তাহা যে ভ্রান্ত হইতে পারে ইতিহাসে এমন অনেক প্রমাণ আছে—অপর পক্ষে সমালোচক সম্প্রদায়ও যে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নহে ইতিহাসে সে প্রমাণেরও কিছুমাত্র অসদ্ভাব নাই। অতএব কেবল এইটুকু নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, আমার এ লেখা ঠিক তোমার মনের মত হয় নাই; সে নিশ্চয় আমার দুর্ভাগ্য—হয়ত তোমার দুর্ভাগ্যও হইতে পারে।

দীপ্তি গম্ভীরমুখে অত্যন্ত সংক্ষেপে কহিলেন, তা' হইবে!—বলিয়া একখানা বই টানিয়া লইয়া পড়িতে লাগিলেন।

ইহার পরে স্রোতস্বিনী আমাকে সেই কবিতা পড়িবার জন্য আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিলেন না।

ব্যোম জানালার বাহিরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া যেন সুদূর আকাশ-তলবর্ত্তী কোন এক কাল্পনিক পুরুষকে সম্বোধন করিয়া কহিল, যদি তাৎপর্য্যের কথা বল, তোমার এবারকার কবিতার আমি একটা তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছি।

ক্ষিতি কহিল, আগে বিষয়টা কি বল দেখি? কবিতাটা পড়া হয় নাই সে কথাটা কবিবরের ভয়ে এতক্ষণ গোপন করিয়াছিলাম, এখন ফাঁস করিতে হইল।

ব্যোম কহিল, শুক্রাচার্য্যের নিকট হইতে সঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত বৃহস্পতির পুত্র কচকে দেবতারা দৈত্যগুরুর আশ্রমে প্রেরণ করেন। সেখানে কচ সহস্রবর্ষ নৃত্যগীতবাদ্যদ্বারা শুক্রতনয়া দেবযানীর মনোরঞ্জন করিয়া সঞ্জীবনী বিদ্যালাভ করিলেন। অবশেষে যখন বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল তখন দেবযানী তাঁহাকে প্রেম জানাইয়া আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন। দেবযানীর প্রতি অন্তরের আসক্তি-

সত্ত্বেও কচ নিষেধ না মানিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। গল্পটুকু এই। মহাভারতের সহিত একটুকুখানি অনৈক্য আছে কিন্তু সে সামান্য।

ক্ষিতি কিঞ্চিৎ কাতর মুখে কহিল—গল্পটি বারোহাত কাঁকুড়ের অপেক্ষা বড় হইবে না কিন্তু আশঙ্কা করিতেছি ইহা হইতে তেরো হাত পরিমাণের তাৎপর্য্য বাহির হইয়া পড়িবে।

ব্যোম ক্ষিতির কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া গেল—কথাটা দেহ এবং আত্মা লইয়া।

শুনিয়া সকলেই সশঙ্ক হইয়া উঠিল।

ক্ষিতি কহিল, আমি এইবেলা আমার দেহ এবং আত্মা লইয়া মানে মানে বিদায় হইলাম।

সমীর দুইহাতে তাহার জামা ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া কহিল, সঙ্কটের সময় আমাদিগকে একলা ফেলিয়া যাও কোথায়?

ব্যোম কহিল, জীব স্বর্গ হইতে এই সংসারাশ্রমে আসিয়াছে। সে এখানকার সুখ দুঃখ বিপদ সম্পদ হইতে শিক্ষা লাভ করে। যতদিন ছাত্র অবস্থায় থাকে, ততদিন তাহাকে এই আশ্রমকন্যা দেহটার মন জোগাইয়া চলিতে হয়। মন যোগাইবার অপূর্ব্ব বিদ্যা সে জানে। দেহের ইন্দ্রিয়-বীণায় সে এমন স্বর্গীয় সঙ্গীত বাজাইতে থাকে, যে, ধরাতলে সৌন্দর্য্যের নন্দনমরীচিকা বিস্তারিত হইয়া যায় এবং সমুদয় শব্দ গন্ধ স্পর্শ আপন জড়শক্তির যন্ত্রনিয়ম পরিহারপূর্ব্বক অপরূপ স্বর্গীয় নৃত্যে স্পন্দিত হইতে থাকে।

বলিতে বলিতে স্বপ্নাবিষ্ট শূন্যদৃষ্টি ব্যোম উৎফুল্ল হইয়া উঠিল,—চৌকিতে সরল হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল—যদি এমনভাবে দেখ, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা অনন্তকালীন প্রেমাভিনয় দেখিতে পাইবে। জীব তাহার মূঢ় অবোধ নির্ভরপরায়ণা সঙ্গিনীটিকে কেমন করিয়া পাগল করিতেছে দেখ! দেহের প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে এমন একটি আকাঙ্ক্ষার

সঞ্চার করিয়া দিতেছে, দেহধর্ম্মের দ্বারা যে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নাই। তাহার চক্ষে যে সৌন্দর্য্য আনিয়া দিতেছে দৃষ্টিশক্তির দ্বারা তাহার সীমা পাওয়া যায় না—তাই সে বলিতেছে "জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল;"—তাহার কর্ণে যে সঙ্গীত আনিয়া দিতেছে শ্রবণশক্তির দ্বারা তাহা আয়ত্ত হইতে পারে না, তাই সে ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে,—"সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ শ্রুতিপথে পরশ না গেল!" আবার এই প্রাণপ্রদীপ্ত মূঢ় সঙ্গিনীটিও লতার ন্যায় সহস্র শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া প্রেমপ্রতপ্ত সুকোমল আলিঙ্গনপাশে জীবকে আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন করিয়া ধরে, অল্পে অল্পে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া আনে, অশ্রান্ত যত্নে ছায়ার মত সঙ্গে থাকিয়া বিবিধ উপচারে তাহার সেবা করে, প্রবাসকে যাহাতে প্রবাস জ্ঞান না হয় যাহাতে আতিথ্যের ত্রুটি না হইতে পারে সে জন্য সর্ব্বদাই সে তাহার চক্ষু কর্ণ হস্ত পদকে সতর্ক করিয়া রাখে। এত ভালবাসার পরে তবু একদিন জীব এই চিরানুগতা অনন্যাসক্তা দেহলতাকে ধূলিশায়িনী করিয়া দিয়া চলিয়া যায়! বলে, প্রিয়ে, তোমাকে আমি আত্মনির্ব্বিশেষে ভালবাসি, তবু আমি কেবল একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসমাত্র ফেলিয়া তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব! কায়া তখন তাহার চরণ জড়াইয়া বলে "বন্ধু, অবশেষে আজ যদি আমাকে ধূলিতলে ধূলিমুষ্টির মত ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইবে, তবে এতদিন তোমার প্রেমে কেন আমাকে এমন মহিমাশালিনী করিয়া তুলিয়াছিলে? হায়, আমি তোমার যোগ্য নই—কিন্তু তুমি কেন আমার এই প্রাণপ্রদীপদীপ্ত নিভৃত সোনার মন্দিরে একদা রহস্যান্ধকারনিশীথে অনন্ত সমুদ্র পার হইয়া অভিসারে আসিয়াছিলে? আমার কোন্ গুণে তোমাকে মুগ্ধ করিয়াছিলাম?" এই করুণ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া এই বিদেশী কোথায় চলিয়া যায় তাহা কেহ জানে না। সেই আজন্মমিলনবন্ধনের অবসান, সেই মাথুরযাত্রার বিদায়ের দিন, সেই কায়ার সহিত কায়াধিরাজের শেষ সম্ভাষণ

—তাহার মত এমন শোচনীয় বিরহ দৃশ্য কোন্ প্রেমকাব্যে বর্ণিত আছে।

ক্ষিতির মুখভাব হইতে একটা আসন্ন পরিহাসের আশঙ্কা করিয়া ব্যোম কহিল—তোমরা ইহাকে প্রেম বলিয়া মনে কর না; মনে করিতেছ আমি কেবল রূপক অবলম্বনে কথা কহিতেছি! তাহা নহে। জগতে ইহাই সর্ব্বপ্রথম প্রেম, এবং জীবনের সর্ব্বপ্রথম প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা যেমন প্রবল হইয়া থাকে জগতের সর্ব্বপ্রথম প্রেমও সেইরূপ সরল অথচ সেইরূপ প্রবল। এই আদি প্রেম এই দেহের ভালবাসা যখন সংসারে দেখা দিয়াছিল তখনও পৃথিবীতে জলে স্থলে বিভাগ হয় নাই—সে দিন কোন কবি উপস্থিত ছিল না, কোন ঐতিহাসিক জন্মগ্রহণ করে নাই—কিন্তু সেই দিন এই জলময় পঙ্কময় অপরিণত ধরাতলে প্রথম ঘোষিত হইল, যে, এ জগৎ যন্ত্রজগৎমাত্র নহে;—প্রেম নামক এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দময় বেদনাময় ইচ্ছাশক্তি পঙ্কের মধ্য হইতে পঙ্কজবন জাগ্রত করিয়া তুলিতেছেন—এবং সেই পঙ্কজবনের উপরে আজ ভক্তের চক্ষে সৌন্দর্য্যরূপা লক্ষ্মী এবং ভাবরূপা সরস্বতীর অধিষ্ঠান হইয়াছে।

ক্ষিতি কহিল—আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে, যে, এমন একটা বৃহৎ কাব্যকাণ্ড চলিতেছে শুনিয়া পুলকিত হইলাম—কিন্তু সরলা কায়াটির প্রতি চঞ্চলস্বভাব আত্মাটার ব্যবহার সন্তোষজনক নহে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমি একান্ত মনে আশা করি যেন আমার জীবাত্মা এরূপ চপলতা প্রকাশ না করিয়া অন্ততঃ কিছু দীর্ঘকাল দেহ-দেবযানীর আশ্রমে স্থায়ীভাবে বাস করে! তোমরাও সেই আশীর্ব্বাদ কর।

সমীর কহিল—ভ্রাতঃ ব্যোম্, তোমার মুখে ত কখনও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কথা শুনি নাই। তুমি কেন আজ এমন খৃষ্টানের মত কথা কহিলে? জীবাত্মা স্বর্গ হইতে সংসারাশ্রমে প্রেরিত হইয়া দেহের সঙ্গ লাভ করিয়া

সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া পরিণতি প্রাপ্ত হইতেছে, এ সকল মত ত তোমার পূর্ব্বমতের সহিত মিলিতেছে না।

ব্যোম কহিল—এ সকল কথায় মতের মিল করিবার চেষ্টা করিও না। এ সকল গোড়াকার কথা লইয়া আমি কোন মতের সহিতই বিবাদ করি না। জীবনযাত্রার ব্যবসায়ে প্রত্যেক জাতিই নিজরাজ্য-প্রচলিত মুদ্রা লইয়া মূলধন সংগ্রহ করে—কথাটা এই দেখিতে হইবে, ব্যবসা চলে কি না। জীব সুখদুঃখবিপদসম্পদের মধ্যে শিক্ষালাভ করিবার জন্য সংসার-শিক্ষাশালায় প্রেরিত হইয়াছে এই মতটিকে মূলধন করিয়া লইয়া জীবনযাত্রা সুচারুরূপে চলে, অতএব আমার মতে এ মুদ্রাটি মেকি নহে। আবার যখন প্রসঙ্গক্রমে অবসর উপস্থিত হইবে, তখন দেখাইয়া দিব, যে, আমি যে ব্যাঙ্কনোটটি লইয়া জীবন-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, বিশ্ববিধাতার ব্যাঙ্কে সে নোটও গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

ক্ষিতি করুণস্বরে কহিল—দোহাই ভাই, তোমার মুখে প্রেমের কথাই যথেষ্ট কঠিন বোধ হয়—অতঃপর বাণিজ্যের কথা যদি অবতারণ কর তবে আমাকেও এখান হইতে অবতারণ করিতে হইবে আমি অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করিতেছি। যদি অবসর পাই তবে আমিও একটা তাৎপর্য্য শুনাইতে পারি।

ব্যোম চৌকিতে ঠেসান্ দিয়া বসিয়া জান্‌লার উপর দুই পা তুলিয়া দিল। ক্ষিতি কহিল, আমি দেখিতেছি এভোল্যুশন থিয়রি অর্থাৎ অভি-ব্যক্তিবাদের মোট কথাটা এই কবিতার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। সঞ্জীবনী বিদ্যাটার অর্থ, বাঁচিয়া থাকিবার বিদ্যা। সংসারে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে একটা লোক সেই বিদ্যাটা অহরহ অভ্যাস করিতেছে—সহস্র বৎসর কেন, লক্ষ সহস্র বৎসর ধরিয়া। কিন্তু যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে সেই বিদ্যা অভ্যাস করিতেছে সেই প্রাণীবংশের প্রতি তাহার কেবল ক্ষণিক প্রেম দেখা যায়। যেই একটা পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইয়া যায় অমনি

নিষ্ঠুর প্রেমিক চঞ্চল অতিথি তাহাকে অকাতরে ধ্বংসের মুখে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যায়। পৃথিবীর স্তরে স্তরে এই নির্দ্দয় বিদায়ের বিলাপগান প্রস্তরপটে অঙ্কিত রহিয়াছে;—

দীপ্তি ক্ষিতির কথা শেষ না হইতে হইতেই বিরক্ত হইয়া কহিল—তোমরা এমন করিয়া যদি তাৎপর্য্য বাহির করিতে থাক তাহা হইলে তাৎপর্য্যের সীমা থাকে না। কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়া দিয়া অগ্নির বিদায় গ্রহণ, গুটি কাটিয়া ফেলিয়া প্রজাপতির পলায়ন, ফুলকে বিশীর্ণ করিয়া ফলের বহিরাগমন, বীজকে বিদীর্ণ করিয়া অঙ্কুরের উদ্গম, এমন রাশি রাশি তাৎপর্য্য স্তূপাকার করা যাইতে পারে।

ব্যোম গম্ভীরভাবে কহিতে লাগিল, ঠিক বটে। ও গুলা তাৎপর্য্য নহে, দৃষ্টান্ত মাত্র। উহাদের ভিতরকার আসল কথাটা এই, সংসারে আমরা অন্ততঃ দুই পা ব্যবহার না করিয়া চলিতে পারি না। বাম পদ যখন পশ্চাতে আবদ্ধ থাকে দক্ষিণপদ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যায়, আবার দক্ষিণ পদ সম্মুখে আবদ্ধ হইলে পর বাম পদ আপন বন্ধন ছেদন করিয়া অগ্রে ধাবিত হয়। আমরা একবার করিয়া আপনাকে বাঁধি, আবার পরক্ষণেই সেই বন্ধন ছেদন করি। আমাদিগকে ভাল বাসিতেও হইবে এবং সে ভালবাসা কাটিতেও হইবে;—সংসারের এই মহত্তম দুঃখ, এবং এই মহৎ দুঃখের মধ্য দিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হয়। সমাজ সম্বন্ধেও এ কথা খাটে;—নূতন নিয়ম যখন কালক্রমে প্রাচীন প্রথারূপে আমাদিগকে একস্থানে আবদ্ধ করে তখন সমাজবিপ্লব আসিয়া তাহাকে উৎপাটনপূর্ব্বক আমাদিগকে মুক্তি দান করে। যে পা ফেলি সে পা পরক্ষণে তুলিয়া লইতে হয় নতুবা চলা হয় না—অতএব অগ্রসর হওয়ার মধ্যে পদে পদে বিচ্ছেদবেদনা—ইহা বিধাতার বিধান।

সমীর কহিল—গল্পটার সর্ব্বশেষে যে একটি অভিশাপ আছে তোমরা কেহ সেটার উল্লেখ কর নাই। কচ যখন বিদ্যা লাভ করিয়া দেবযানীর

প্রেমবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া যাত্রা করেন তখন দেবযানী তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন, যে, তুমি যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে সে বিদ্যা অন্যকে শিক্ষা দিতে পারিবে কিন্তু নিজে ব্যবহার করিতে পারিবে না; আমি সেই অভিশাপ-সমেত একটা তাৎপর্য্য বাহির করিয়াছি যদি ধৈর্য্য থাকে ত বলি।

ক্ষিতি কহিল, ধৈর্য্য থাকিবে কি না পূর্ব্বে হইতে বলিতে পারি না। প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া শেষে প্রতিজ্ঞা রক্ষা না হইতেও পারে। তুমিত আরম্ভ করিয়া দাও শেষে যদি অবস্থা বুঝিয়া তোমার দয়ার সঞ্চার হয় থামিয়া গেলেই হইবে।

সমীর কহিল—ভাল করিয়া জীবন ধারণ করিবার বিদ্যাকে সঞ্জীবনী বিদ্যা বলা যাক। মনে করা যাক্ কোন কবি সেই বিদ্যা নিজে শিখিয়া অন্যকে দান করিবার জন্য জগতে আসিয়াছে। সে তাহার সহজ স্বর্গীয় ক্ষমতায় সংসারকে বিমুগ্ধ করিয়া সংসারের কাছ হইতে সেই বিদ্যা উদ্ধার করিয়া লইল। সে যে সংসারকে ভাল বাসিল না তাহা নহে কিন্তু সংসার যখন তাহাকে বলিল তুমি আমার বন্ধনে ধরা দাও, সে কহিল, ধরা যদি দিই, তোমার আবর্ত্তের মধ্যে যদি আকৃষ্ট হই তাহা হইলে এ সঞ্জীবনী বিদ্যা আমি শিখাইতে পারিব না; সংসারে সকলের মধ্যে থাকিয়াও আপনাকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে। তখন সংসার তাহাকে অভিশাপ দিল, তুমি যে বিদ্যা আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ সে বিদ্যা অন্যকে দান করিতে পারিবে কিন্তু নিজে ব্যবহার করিতে পারিবে না।—সংসারের এই অভিশাপ থাকাতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে, গুরুর শিক্ষা ছাত্রের কাজে লাগিতেছে কিন্তু সংসারজ্ঞান নিজের জীবনে ব্যবহার করিতে তিনি বালকের ন্যায় অপটু। তাহার কারণ, নির্লিপ্তভাবে বাহির হইতে বিদ্যা শিখিলে বিদ্যাটা ভাল করিয়া পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বদা কাজের মধ্যে লিপ্ত হইয়া না থাকিলে তাহার প্রয়োগ শিক্ষা হয় না। সেই জন্য পুরাকালে ব্রাহ্মণ

ছিলেন মন্ত্রী, কিন্তু ক্ষত্রিয় রাজা তাঁহার মন্ত্রণা কাজে প্রয়োগ করিতেন।

তোমরা যে সকল কথা তুলিয়াছিলে সে গুলা বড় বেশি সাধারণ কথা। মনে কর যদি বলা যায়, রামায়ণের তাৎপর্য্য এই যে, রাজার গৃহে জন্মিয়াও অনেকে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, অথবা শকুন্তলার তাৎপর্য্য এই যে, উপযুক্ত অবসরে স্ত্রী পুরুষের চিত্তে পরস্পরের প্রতি প্রেমের সঞ্চার হওয়া অসম্ভব নহে তবে সেটাকে একটা নূতন শিক্ষা বা বিশেষ বার্ত্তা বলা যায় না।

স্রোতস্বিনী কিঞ্চিৎ ইতস্তত করিয়া কহিল—আমার ত মনে হয় সেই সকল সাধারণ কথাই কবিতার কথা। রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও সর্ব্ব প্রকার সুখের সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমৃত্যুকাল অসীম দুঃখ রাম ও সীতাকে সঙ্কট হইতে সঙ্কটান্তরে ব্যাধের ন্যায় অনুসরণ করিয়া ফিরিয়াছে; সংসারের এই অত্যন্ত সম্ভবপর, মানবাদৃষ্টের এই অত্যন্ত পুরাতন দুঃখ-কাহিনীতেই পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট এবং আর্দ্র হইয়াছে। শকুন্তলার প্রেমদৃশ্যের মধ্যে বাস্তবিকই কোন নূতন শিক্ষা বা বিশেষ বার্ত্তা নাই কেবল এই নিরতিশয় প্রাচীন এবং সাধারণ কথাটি আছে যে, শুভ অথবা অশুভ অবসরে প্রেম অলক্ষিতে অনিবার্য্যবেগে আসিয়া দৃঢ়বন্ধনে স্ত্রী পুরুষের হৃদয় এক করিয়া দেয়। এই অত্যন্ত সাধারণ কথা থাকাতেই সর্ব্বসাধারণে উহার রসভোগ করিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের বিশেষ অর্থ এই যে, মৃত্যু এই জীবজন্তু-তরুলতাতৃণাচ্ছাদিত বসুমতীর বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছে কিন্তু বিধাতার আশীর্ব্বাদে কোনকালে তাহার বসনাঞ্চলের অন্ত হইতেছে না, চিরদিনই সে প্রাণময় সৌন্দর্য্যময় নববস্ত্রে ভূষিত থাকিতেছে। কিন্তু সভাপর্ব্বে যেখানে আমাদের হৃৎপিণ্ডের রক্ত তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং অবশেষে সঙ্কটাপন্ন ভক্তের প্রতি দেবতার কৃপায় দুই চক্ষু অশ্রুজলে

প্লাবিত হইয়াছিল সে কি এই নূতন এবং বিশেষ অর্থ গ্রহণ করিয়া? না, অত্যাচারপীড়িত রমণীর লজ্জা ও সেই লজ্জানিবারণ নামক অত্যন্ত সাধারণ স্বাভাবিক এবং পুরাতন কথায়? কচদেবযানীসংবাদেও মানব-হৃদয়ের এক অতি চিরন্তন এবং সাধারণ বিষাদকাহিনী বিবৃত আছে সেটাকে যাঁহারা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন এবং বিশেষ তত্ত্বকেই প্রাধান্য দেন তাঁহারা কাব্যরসের অধিকারী নহেন।

সমীর হাসিয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—শ্রীমতী স্রোতস্বিনী আমাদিগকে কাব্যরসের অধিকারসীমা হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন এক্ষণে স্বয়ং কবি কি বিচার করেন একবার শুনা যাক্।

স্রোতস্বিনী অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া বারম্বার এই অপবাদের প্রতিবাদ করিলেন।

আমি কহিলাম,—এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যখন কবিতাটা লিখিতে বসিয়াছিলাম তখন কোন অর্থই মাথায় ছিল না, তোমাদের কল্যাণে এখন দেখিতেছি লেখাটা বড় নিরর্থক হয় নাই—অর্থ অভিধানে কুলাইয়া উঠিতেছে না। কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির রচনাশক্তি পাঠকের রচনাশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়; তখন স্ব স্ব প্রকৃতিঅনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য্য, কেহবা নীতি, কেহবা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন। এ যেন আতসবাজীতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া—কাব্য সেই অগ্নিশিখা, পাঠকদের মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আতসবাজি। আগুন ধরিবামাত্র কেহবা হাউইয়ের মত একেবারে আকাশে উড়িয়া যায়, কেহবা তুবড়ির মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কেহবা বোমার মত আওয়াজ করিতে থাকে। তথাপি মোটের উপর শ্রীমতী স্রোতস্বিনীর সহিত আমার মতবিরোধ দেখিতেছি না। অনেকে বলেন, আঁঠিই ফলের প্রধান অংশ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা তাহার প্রমাণ করাও যায়। কিন্তু তথাপি

অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তি ফলের শস্যটি খাইয়া তাহার আঁঠি ফেলিয়া দেন। তেমনি কোন কাব্যের মধ্যে যদিবা কোন বিশেষ শিক্ষা থাকে তথাপি কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি তাহার সম্পূর্ণ কাব্যাংশটুকু লইয়া শিক্ষাংশটুকু ফেলিয়া দিলে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা আগ্রহ সহকারে কেবল ঐ শিক্ষাংশটুকুই বাহির করিতে চাহেন আশীর্ব্বাদ করি তাঁহারাও সফল হউন এবং সুখে থাকুন। আনন্দ কাহাকেও বলপূর্ব্বক দেওয়া যায় না। কুসুমফুল হইতে কেহবা তাহার রং বাহির করে, কেহবা তৈলের জন্য তাহার বীজ বাহির করে, কেহ বা মুগ্ধনেত্রে তাহার শোভা দেখে। কাব্য হইতে কেহবা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহবা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহবা নীতি, কেহবা বিষয় জ্ঞান উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকেন—আবার কেহবা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না—যিনি যাহা পাইলেন তাহাই লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিতে পারেন—কাহারও সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখি না—বিরোধে ফলও নাই!

প্রাঞ্জলতা।

স্রোতস্বিনী কোন এক বিখ্যাত ইংরাজ কবির উল্লেখ করিয়া বলিলেন, কে জানে, তাঁহার রচনা আমার কাছে ভাল লাগে না।

দীপ্তি আরো প্রবলতরভাবে স্রোতস্বিনীর মত সমর্থন করিলেন।

সমীর কখন পারতপক্ষে মেয়েদের কোন কথার স্পষ্ট প্রতিবাদ করে না। তাই সে একটু হাসিয়া ইতস্তত করিয়া কহিল, কিন্তু অনেক বড় বড় সমালোচক তাঁহাকে খুব উচ্চ আসন দিয়া থাকেন।

দীপ্তি কহিলেন, আগুন যে পোড়ায় তাহা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য কোন সমালোচকের সাহায্য আবশ্যক করে না—তাহা নিজের বাম হস্তের

কড়ে আঙুলের ডগার দ্বারাও বোঝা যায়—ভাল কবিতার ভালত্ব যদি তেমনি অবহেলে না বুঝিতে পারি তবে আমি তাহার সমালোচনা পড়া আবশ্যক বোধ করি না।

আগুনের যে পোড়াইবার ক্ষমতা আছে সমীর তাহা জানিত, এই জন্য সে চুপ করিয়া রহিল; কিন্তু ব্যোম বেচারার সে সকল বিষয়ে কোনরূপ কাণ্ডজ্ঞান ছিল না এই জন্য সে উচ্চস্বরে আপন স্বগত-উক্তি আরম্ভ করিয়া দিল।

সে বলিল—মানুষের মন মানুষকে ছাড়াইয়া চলে, অনেক সময়ে তাহাকে নাগাল পাওয়া যায় না;——

ক্ষিতি তাহাকে বাধা দিয়া কহিল—ত্রেতাযুগে হনুমানের শত যোজন লাঙ্গুল শ্রীমান্ হনুমানজীউকে ছাড়াইয়া বহুদূর গিয়া পৌছিত;—লাঙ্গুলের ডগাটুকুতে যদি উকুন বসিত তবে তাহা চুলকাইয়া আসিবার জন্য ঘোড়ার ডাক বসাইতে হইত। মানুষের মন হনুমানের লাঙ্গুলের অপেক্ষাও সুদীর্ঘ, সেই জন্য এক এক সময়ে মন যেখানে গিয়া পৌছায়, সমালোচকের ঘোড়ার ডাক ব্যতীত সেখানে হাত পৌছে না। ল্যাজের সঙ্গে মনের প্রভেদ এই যে, মনটা আগে আগে চলে এবং ল্যাজটা পশ্চাতে পড়িয়া থাকে—এই জন্যই জগতে ল্যাজের এত লাঞ্ছনা এবং মনের এত মাহাত্ম্য।

ক্ষিতির কথা শেষ হইলে ব্যোম পুনশ্চ আরম্ভ করিল—বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য জানা, এবং দর্শনের উদ্দেশ্য বোঝা, কিন্তু কাণ্ডটি এমনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, বিজ্ঞানটি জানা এবং দর্শনটি বোঝাই অন্য সকল জানা এবং অন্য সকল বোঝার অপেক্ষা শক্ত হইয়া উঠিয়াছে; ইহার জন্য কত ইস্কুল, কত কেতাব, কত আয়োজন আবশ্যক হইয়াছে! সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা, সেই আনন্দটি গ্রহণ করাও নিতান্ত সহজ নহে—তাহার জন্যও বিবিধ প্রকার শিক্ষা এবং সাহায্যের প্রয়োজন। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, দেখিতে দেখিতে মন এতটা অগ্রসর হইয়া যায়, যে,

তাহার নাগাল পাইবার জন্য সিঁড়ি লাগাইতে হয়। যদি কেহ অভিমান করিয়া বলেন, যাহা বিনা শিক্ষায় না জানা যায় তাহা বিজ্ঞান নহে, যাহা বিনা চেষ্টায় না বোঝা যায় তাহা দর্শন নহে এবং যাহা বিনা সাধনায় আনন্দ দান না করে তাহা সাহিত্য নহে, তবে কেবল খনার বচন, প্রবাদ বাক্য এবং পাঁচালি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে।

সমীর কহিল, মানুষের হাতে সব জিনিষই ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠে। অসভ্যেরা যেমন-তেমন চীৎকার করিয়াই উত্তেজনা অনুভব করে, অথচ আমাদের এমনি গ্রহ, যে, বিশেষ অভ্যাসসাধ্য শিক্ষাসাধ্য সঙ্গীত ব্যতীত আমাদের সুখ নাই; আরো গ্রহ এই, যে, ভাল গান করাও তেমনি শিক্ষাসাধ্য। তাহার ফল হয় এই, যে, এক সময়ে যাহা সাধারণের ছিল, ক্রমেই তাহা সাধকের হইয়া আসে। চীৎকার সকলেই করিতে পারে, এবং চীৎকার করিয়া অসভ্য সাধারণে সকলেই উত্তেজনাসুখ অনুভব করে —কিন্তু গান সকলে করিতে পারে না এবং গানে সকলে সুখও পায় না। কাজেই, সমাজ যতই অগ্রসর হয় ততই অধিকারী এবং অনধিকারী, রসিক এবং অরসিক এই দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইতে থাকে।

ক্ষিতি কহিল, মানুষ বেচারাকে এমনি করিয়া গড়া হইয়াছে, যে, সে যতই সহজ উপায় অবলম্বন করিতে চায় ততই দুরূহতার মধ্যে জড়ীভূত হইয়া পড়ে। সে সহজে কাজ করিবার জন্য কল তৈরি করে কিন্তু কল জিনিষটা নিজে এক বিষম দুরূহ ব্যাপার; সে সহজে সমস্ত প্রাকৃতজ্ঞানকে বিধিবদ্ধ করিবার জন্য বিজ্ঞান সৃষ্টি করে কিন্তু সেই বিজ্ঞানটাই আয়ত্ত করা কঠিন কাজ; সুবিচার করিবার সহজ প্রণালী বাহির করিতে গিয়া আইন বাহির হইল, শেষকালে আইনটা ভাল করিয়া বুঝিতেই দীর্ঘজীবী লোকের বারো আনা জীবনদান করা আবশ্যক হইয়া পড়ে; সহজে আদান-প্রদান চালাইবার জন্য টাকার সৃষ্টি হইল, শেষকালে টাকার

সমস্যা এমনি এক সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে, যে, মীমাংসা করে কাহার সাধ্য! সমস্ত সহজ করিতে হইবে এই চেষ্টায় মানুষের জানা শোনা খাওয়া দাওয়া আমোদ প্রমোদ সমস্তই অসম্ভব শক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

স্রোতস্বিনী কহিলেন—সেই হিসাবে কবিতাও শক্ত হইয়া উঠিয়াছে; এখন মানুষ খুব স্পষ্টতঃ দুইভাগ হইয়া গিয়াছে; এখন অল্প লোক ধনী এবং অনেকে নির্দ্ধন, অল্প লোকে গুণী এবং অনেক নির্গুণ; এখন কবিতাও সর্ব্বসাধারণের নহে, তাহা বিশেষ লোকের; সকলি বুঝিলাম। কিন্তু কথাটা এই যে, আমরা যে বিশেষ কবিতার প্রসঙ্গে এই কথাটা তুলিয়াছি, সে কবিতাটা কোন অংশেই শক্ত নহে; তাহার মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা আমাদের মত লোকও বুঝিতে না পারে—তাহা নিতান্তই সরল, অতএব তাহা যদি ভাল না লাগে তবে সে আমাদের বুঝিবার দোষে নহে।

ক্ষিতি এবং সমীর ইহার পরে আর কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করিল না। কিন্তু ব্যোম অম্লান মুখে বলিতে লাগিল—যাহা সরল তাহাই যে সহজ এমন কোন কথা নাই। অনেক সময় তাহাই অত্যন্ত কঠিন, কারণ, সে নিজেকে বুঝাইবার জন্য কোনপ্রকার বাজে উপায় অবলম্বন করে না,—সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, তাহাকে না বুঝিয়া চলিয়া গেলে সে কোনরূপ কৌশল করিয়া ফিরিয়া ডাকে না। প্রাঞ্জলতার প্রধান গুণ এই যে, সে একেবারে অব্যবহিত ভাবে মনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে—তাহার কোন মধ্যস্থ নাই। কিন্তু যে সকল মন মধ্যস্থের সাহায্য ব্যতীত কিছু গ্রহণ করিতে পারে না, যাহাদিগকে ভুলাইয়া আকর্ষণ করিতে হয়, প্রাঞ্জলতা তাহাদের নিকট বড়ই দুর্ব্বোধ। কৃষ্ণনগরের কারীগরের রচিত ভিস্তি তাহার সমস্ত রং চং রশক্ এবং অঙ্গভঙ্গী দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয় এবং অভ্যাসের সাহায্যে চট্ করিয়া আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে—কিন্তু গ্রীক্ প্রস্তরমূর্ত্তিতে রং চং রকম সকম্

নাই—তাহা প্রাঞ্জল এবং সর্ব্বপ্রকার প্রয়াসবিহীন। কিন্তু তাহা বলিয়া সহজ নহে। সে কোনপ্রকার তুচ্ছ বাহ্যকৌশল অবলম্বন করে না বলিয়াই ভাবসম্পদ তাহার অধিক থাকা চাই।

দীপ্তি বিশেষ একটু বিরক্ত হইয়া কহিল—তোমার গ্রীক্ প্রস্তরমূর্ত্তির কথা ছাড়িয়া দাও! ও সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি এবং বাঁচিয়া থাকিলে আরও অনেক কথা শুনিতে হইবে। ভাল জিনিষের দোষ এই, যে, তাহাকে সর্ব্বদাই পৃথিবীর চোখের সাম্‌নে থাকিতে হয়, সকলেই তাহার সম্বন্ধে কথা কহে, তাহার আর পর্দ্দা নাই, আব্রু নাই; তাহাকে আর কাহারও আবিষ্কার করিতে হয় না, বুঝিতে হয় না, ভাল করিয়া চোখ মেলিয়া তাহার প্রতি তাকাইতেও হয় না, কেবল তাহার সম্বন্ধে বাঁধি গৎ শুনিতে এবং বলিতে হয়। সূর্য্যের যেমন মাঝে মাঝে মেঘগ্রস্ত থাকা উচিত, নতুবা মেঘমুক্ত সূর্য্যের গৌরব বুঝা যায় না, আমার বোধ হয় পৃথিবীর বড় বড় খ্যাতির উপরে মাঝে মাঝে সেইরূপ অবহেলার আড়াল পড়া উচিত—মাঝে মাঝে গ্রীক্ মূর্ত্তির নিন্দা করা ফেশান্ হওয়া ভাল, মাঝে মাঝে সর্ব্বলোকের নিকট প্রমাণ হওয়া উচিত যে, কালিদাস অপেক্ষা চাণক্য বড় কবি। নতুবা আর সহ্য হয় না। যাহা হউক্ ওটা একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা। আমার বক্তব্য এই, যে, অনেক সময়ে ভাবের দারিদ্র্যকে আচারের বর্ব্বরতাকে সরলতা বলিয়া ভ্রম হয়, অনেক সময় প্রকাশক্ষমতার অভাবকে ভাবাধিক্যের পরিচয় বলিয়া কল্পনা করা হয়—সে কথাটাও মনে রাখা কর্ত্তব্য।

আমি কহিলাম, কলাবিদ্যায় সরলতা উচ্চ অঙ্গের মানসিক উন্নতির সহচর। বর্ব্বরতা সরলতা নহে। বর্ব্বরতার আড়ম্বর আয়োজন অত্যন্ত বেশী। সভ্যতা অপেক্ষাকৃত নিরলঙ্কার। অধিক অলঙ্কার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; কিন্তু মনকে প্রতিহত করিয়া দেয়। আমাদের বাংলা ভাষায় কি খবরের কাগজে, কি উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যে সরলতা এবং অপ্রমত্ততার

অভাব দেখা যায়;—সকলেই অধিক করিয়া, চীৎকার করিয়া, এবং ভঙ্গিমা করিয়া বলিতে ভালবাসে; বিনা আড়ম্বরে সত্য কথাটি পরিষ্কার করিয়া বলিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না; কারণ, সত্য প্রাঞ্জল বেশে আসিলে তাহার গভীরতা এবং অসামান্যতা আমরা দেখিতে পাই না, ভাবের সৌন্দর্য্য কৃত্রিম ভূষণে এবং সর্ব্বপ্রকার আতিশয্যে ভারাক্রান্ত হইয়া না আসিলে আমাদের নিকট তাহাদের মর্য্যাদা নষ্ট হয়।

সমীর কহিল—সংযম ভদ্রতার একটি প্রধান লক্ষণ। ভদ্রলোকেরা কোন প্রকার গায়ে পড়া আতিশয্য দ্বারা আপন অস্তিত্ব উৎকটভাবে প্রচার করে না;—বিনয় এবং সংযমের দ্বারা তাহারা আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকে। অনেক সময়ে সাধারণ লোকের নিকট সংযত সুসমাহিত ভদ্রতার অপেক্ষা আড়ম্বর এবং আতিশয্যের ভঙ্গিমা অধিকতর আকর্ষণজনক হয় কিন্তু সেটা ভদ্রতার দুর্ভাগ্য নহে সে সাধারণের ভাগ্যদোষ। সাহিত্যে সংযম এবং আচারব্যবহারের সংযম উন্নতির লক্ষণ—আতিশয্যের দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাই বর্ব্বরতা।

আমি কহিলাম—তরঙ্গভঙ্গের অভাবে অনেক সময়ে পরিপূর্ণতাও লোকের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়, আবার পরিপূর্ণতার অভাবে অনেক সময়ে তরঙ্গভঙ্গও লোককে বিচলিত করে, কিন্তু তাই বলিয়া এ ভ্রম যেন কাহারও না হয়, যে, পরিপূর্ণতার প্রাঞ্জলতাই সহজ এবং অগভীরতার ভঙ্গিমাই দুরূহ।

স্রোতস্বিনীর দিকে ফিরিয়া কহিলাম, উচ্চশ্রেণীর সরল সাহিত্য বুঝা অনেক সময় এই জন্য কঠিন, যে, মন তাহাকে বুঝিয়া লয় কিন্তু সে আপনাকে বুঝাইতে থাকে না।

দীপ্তি কহিল, নমস্কার করি,—আজ আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে। আর কখনও উচ্চ অঙ্গের পণ্ডিতদিগের নিকট উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করিয়া বর্ব্বরতা প্রকাশ করিব না।

স্রোতস্বিনী সেই ইংরাজ কবির নাম করিয়া কহিল, তোমরা যতই তর্ক কর এবং যতই গালি দাও, সে কবির কবিতা আমার কিছুতেই ভাল লাগে না।

কৌতুকহাস্য।

শীতের সকালে রাস্তা দিয়া খেজুররস হাঁকিয়া যাইতেছে। ভোরের দিককার ঝাপ্‌সা কুয়াশাটা কাটিয়া গিয়া তরুণ রৌদ্রে দিনের আরম্ভ-বেলাটা একটু উপভোগযোগ্য আতপ্ত হইয়া আসিয়াছে। সমীর চা খাইতেছে, ক্ষিতি খবরের কাগজ পড়িতেছে এবং ব্যোম মাথার চারি-দিকে একটা অত্যন্ত উজ্জ্বল নীলে সবুজে মিশ্রিত গলাবন্ধের পাক জড়াইয়া একটা অসঙ্গত মোটা লাঠি হস্তে সম্প্রতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

অদূরে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া স্রোতস্বিনী এবং দীপ্তি পরস্পরের কটিবেষ্টন করিয়া কি-একটা রহস্যপ্রসঙ্গে বারম্বার হাসিয়া অস্থির হইতে-ছিল। ক্ষিতি এবং সমীর মনে করিতেছিল এই উৎকট নীলহরিত পশম-রাশিপরিবৃত সুখাসীন নিশ্চিন্তচিত্ত ব্যোমই ঐ হাস্যরসোচ্ছ্বাসের মূল কারণ।

এমন সময় অন্যমনস্ক ব্যোমের চিত্তও সেই হাস্যরবে আকৃষ্ট হইল। চৌকিটা সে আমাদের দিকে ঈষৎ ফিরাইয়া কহিল দূর হইতে একজন পুরুষমানুষের হঠাৎ ভ্রম হইতে পারে যে, ঐ দুটি সখী বিশেষ কোন একটা কৌতুককথা অবলম্বন করিয়া হাসিতেছেন, কিন্তু সেটা মায়া। পুরুষ-জাতিকে পক্ষপাতী বিধাতা বিনাকৌতুকে হাসিবার ক্ষমতা দেন নাই কিন্তু মেয়েরা হাসে কি জন্য তাহা দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। চক্-মকি পাথর স্বভাবত আলোকহীন;—উপযুক্ত সংঘর্ষ প্রাপ্ত হইলে সে

অট্টশব্দে জ্যোতিঃস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করে, আর মাণিকের টুক্‌রা আপ্‌না আপ্‌নি আলোয় ঠিকরিয়া পড়িতে থাকে, কোন একটা সঙ্গত উপলক্ষ্যের অপেক্ষা রাখে না। মেয়েরা অল্প কারণে কাঁদিতে জানে এবং বিনা কারণে হাসিতে পারে; কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না, জগতের এই কড়া নিয়মটা কেবল পুরুষের পক্ষেই খাটে!

সমীর নিঃশেষিতপাত্রে দ্বিতীয়বার চা ঢালিয়া কহিল, কেবল মেয়েদের হাসি নয়, হাস্যরসটাই আমার কাছে কিছু অসঙ্গত ঠেকে। দুঃখে কাঁদি, সুখে হাসি এটুকু বুঝিতে বিলম্ব হয় না—কিন্তু কৌতুকে হাসি কেন? কৌতুক ত ঠিক সুখ নয়। মোটা মানুষ চৌকি ভাঙিয়া পড়িয়া গেলে আমাদের কোন সুখের কারণ ঘটে এ কথা বলিতে পারি না কিন্তু কারণ হাসির ঘটে ইহা পরীক্ষিত সত্য। ভাবিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে আশ্চর্য্যের বিষয় আছে।

ক্ষিতি কহিল—রক্ষা কর ভাই! না ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইবার বিষয় জগতে যথেষ্ট আছে আগে সেইগুলো শেষ কর তার পরে ভাবিতে সুরু করিয়ো। একজন পাগল তাহার উঠানকে ধূলিশূন্য করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমত ঝাঁটা দিয়া আচ্ছা করিয়া ঝাঁটাইল, তাহাতেও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ফল না পাইয়া কোদাল দিয়া মাটি চাঁচিতে আরম্ভ করিল। সে মনে করিয়াছিল এই ধূলোমাটির পৃথিবীটাকে সে নিঃশেষে আকাশে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া অবশেষে দিব্য একটি পরিষ্কার উঠান পাইবে—বলা বাহুল্য বিস্তর অধ্যবসায়েও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ভ্রাতঃ সমীর, তুমি যদি আশ্চর্য্যের উপরিস্তর ঝাঁটাইয়া অবশেষে গভীরভাবে ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতে আরম্ভ কর তবে আমরা বন্ধুগণ বিদায় লই। কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ, কিন্তু সেই নিরবধি কাল আমাদের হাতে নাই।

সমীর হাসিয়া কহিল—ভাই ক্ষিতি, আমার অপেক্ষা ভাবনা তোমারই বেশি। অনেক ভাবিলে তোমাকেও সৃষ্টির একটা মহাশ্চর্য্য ব্যাপার

মনে হইতে পারিত কিন্তু আরো ঢের বেশি না ভাবিলে আমার সহিত তোমার সেই উঠানমার্জ্জনকারী আদর্শটির সাদৃশ্য কল্পনা করিতে পারিতে না।

ক্ষিতি কহিল—মাপ কর ভাই; তুমি আমার অনেক কালের বিশেষ পরিচিত বন্ধু, সেই জন্যই আমার মনে এতটা আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল। যাহা হউক, কথাটা এই যে, কৌতুকে আমরা হাসি কেন। ভারি আশ্চর্য্য! কিন্তু তাহার পরের প্রশ্ন এই যে, যে কারণেই হউক্ হাসি কেন? একটা কিছু ভাল লাগিবার বিষয় যেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল অমনি আমাদের গলার ভিতর দিয়া একটা অদ্ভুত প্রকারের শব্দ বাহির হইতে লাগিল এবং আমাদের মুখের সমস্ত মাংসপেশী বিকৃত হইয়া সম্মুখের দন্তপংক্তি বাহির হইয়া পড়িল—মানুষের মত ভদ্র জীবের পক্ষে এমন একটা অসংযত অসঙ্গত ব্যাপার কি সামান্য অদ্ভুত এবং অবমানজনক? য়ুরোপের ভদ্রলোক ভয়ের চিহ্ন দুঃখের চিহ্ন প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করেন—আমরা প্রাচ্যজাতীয়েরা সভাসমাজে কৌতুকের চিহ্ন প্রকাশ করাটাকে নিতান্ত অসংযমের পরিচয় জ্ঞান করি—

সমীর ক্ষিতিকে কথা শেষ করিতে না দিয়া কহিল,—তাহার কারণ, আমাদের মতে কৌতুকে আমোদ অনুভব করা নিতান্ত অযৌক্তিক। উহা ছেলেমানুষেরই উপযুক্ত। এই জন্য কৌতুক রসকে আমাদের প্রবীণ লোকমাত্রেই ছেব্লামী বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকেন। একটা গানে শুনিয়াছিলাম, শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রাভঙ্গে প্রাতঃকালে হুঁকাহস্তে রাধিকার কুটীরে কিঞ্চিৎ অঙ্গারের প্রার্থনায় আগমন করিয়াছিলেন, শুনিয়া শ্রোতামাত্রের হাস্য উদ্রেক করিয়াছিল। কিন্তু হুঁকা-হস্তে শ্রীকৃষ্ণের কল্পনা সুন্দরও নহে কাহারও পক্ষে আনন্দজনকও নহে—তবুও যে, আমাদের হাসি ও আমোদের উদয় হয় তাহা অদ্ভুত ও অমূলক নহে ত কি? এই জন্যই এরূপ চাপল্য আমাদের বিজ্ঞ সমাজের অনুমোদিত নহে। ইহা যেন

অনেকটা পরিমাণে শারীরিক; কেবল স্নায়ুর উত্তেজনা মাত্র। ইহার সহিত আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ, বুদ্ধিবৃত্তি, এমন কি স্বার্থবোধেরও যোগ নাই! অতএব অনর্থক সামান্য কারণে ক্ষণকালের জন্য বুদ্ধির এরূপ অনিবার্য্য পরাভব, স্থৈর্য্যের এরূপ সম্যক্ বিচ্যুতি, মনবিশিষ্ট জীবের পক্ষে লজ্জাজনক সন্দেহ নাই।

ক্ষিতি একটু ভাবিয়া কহিল, সে কথা সত্য। কোন অখ্যাতনামা কবি-বিরচিত এই কবিতাটি বোধ হয় জানা আছে—

তৃষার্ত্ত হইয়া চাহিলাম একঘটি জল।
তাড়াতাড়ি এনে দিলে আধখানা বেল॥

তৃষার্ত্ত ব্যক্তি যখন এক ঘটি জল চাহিতেছে তখন অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিয়া আধখানা বেল আনিয়া দিলে অপরাপর ব্যক্তিব তাহাতে আমোদ অনুভব করিবার কোন ধর্ম্মসঙ্গত অথবা যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। তৃষিত ব্যক্তির প্রার্থনামতে তাহাকে একঘটি জল আনিয়া দিলে সমবেদনা-বৃত্তিপ্রভাবে আমরা সুখ পাই—কিন্তু তাহাকে হঠাৎ আধখানা বেল আনিয়া দিলে, জানি না কি বৃত্তিপ্রভাবে আমাদের প্রচুর কৌতুক বোধ হয়। এই সুখ এবং কৌতুকের মধ্যে যখন শ্রেণীগত প্রভেদ আছে তখন দুইয়ের ভিন্নবিধ প্রকাশ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রকৃতির গৃহিণী-পনাই এইরূপ—কোথাও বা অনাবশ্যক অপব্যয়, কোথাও অত্যাবশ্যকের বেলায় টানাটানি! এক হাসির দ্বারা সুখ এবং কৌতুক দুটোকে সারিয়া দেওয়া উচিত হয় নাই।

ব্যোম কহিল—প্রকৃতির প্রতি অন্যায় অপবাদ আরোপ হই-তেছে। সুখে আমরা স্মিতহাস্য হাসি, কৌতুকে আমরা উচ্চহাস্য হাসিয়া উঠি। একটা আন্দোলনজনিত স্থায়ী অপরটি সংঘর্ষজনিত আকস্মিক।

সমীর ব্যোমের কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল, আমোদ এবং

কৌতুক ঠিক সুখ নহে বরঞ্চ তাহা নিয়মাত্রার দুঃখ। স্বল্প পরিমাণে দুঃখ ও পীড়ন আমাদের চেতনার উপর যে আঘাত করে তাহাতে আমাদের সুখ হইতেও পারে। প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে বিনা কষ্টে আমরা পাচকের প্রস্তুত অন্ন খাইয়া থাকি তাহাকে আমরা আমোদ বলি না—কিন্তু যেদিন "চড়িভাতি" করা যায়, সেদিন নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কষ্ট স্বীকার করিয়া অসময়ে সম্ভবতঃ অখাদ্য আহার করি, কিন্তু তাহাকে বলি আমোদ। আমোদের জন্য আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক যে পরিমাণে কষ্ট ও অশান্তি জাগ্রত করিয়া তুলি তাহাতে আমাদের চেতনশক্তিকে উত্তেজিত করিয়া দেয়। কৌতুকও সেই জাতীয় সুখাবহ দুঃখ। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমাদের চিরকাল যেরূপ ধারণা আছে তাঁহাকে হুঁকাহস্তে রাধিকার কুটীরে আনিয়া উপস্থিত করিলে হঠাৎ আমাদের সেই ধারণায় আঘাত করে। সেই আঘাত ঈষৎ পীড়াজনক; কিন্তু সেই পীড়ার পরিমাণ এমন নিয়মিত যে, তাহাতে আমাদিগকে যে পরিমাণে দুঃখ দেয় আমাদের চেতনাকে অকস্মাৎ চঞ্চল করিয়া তুলিয়া তদপেক্ষা অধিক সুখী করে। এই সীমা ঈষৎ অতিক্রম করিলেই কৌতুক প্রকৃত পীড়ায় পরিণত হইয়া উঠে। যদি যথার্থ ভক্তির কীর্ত্তনের মাঝখানে কোন রসিকতাবায়ুগ্রস্ত ছোকরা হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণের ঐ তাম্রকূটধূমপিপাসুতার গান গাহিত তবে তাহাতে কৌতুক বোধ হইত না; কারণ, আঘাতটা এত গুরুতর হইত যে তৎক্ষণাৎ তাহা উদ্যত মুষ্টি আকার ধারণ করিয়া উক্ত রসিক ব্যক্তির পৃষ্ঠাভিমুখে প্রবল প্রতিঘাতস্বরূপে ধাবিত হইত। অতএব, আমার মতে কৌতুক—চেতনাকে পীড়ন; আমোদও তাই। এই জন্য প্রকৃত আনন্দের প্রকাশ স্মিতহাস্য এবং আমোদ ও কৌতুকের প্রকাশ উচ্চহাস্য;—সে হাস্য যেন হঠাৎ একটা দ্রুত আঘাতের পীড়নবেগে সশব্দে উর্দ্ধে উদ্গীর্ণ হইয়া উঠে।

ক্ষিতি কহিল, তোমরা যখন একটা মনের মত থিওরির সঙ্গে একটা

মনের মত উপমা জুড়িয়া দিতে পার, তখন আনন্দে আর সত্যাসত্য জ্ঞান থাকে না। ইহা সকলেরই জানা আছে কৌতুকে যে কেবল আমরা উচ্চহাস্য হাসি তাহা নহে মৃদুহাস্যও হাসি, এমন কি, মনে মনেও হাসিয়া থাকি। কিন্তু ওটা একটা অবান্তর কথা। আসল কথা এই যে, কৌতুক আমাদের চিত্তের উত্তেজনার কারণ; এবং চিত্তের অনতি-প্রবল উত্তেজনা আমাদের পক্ষে সুখজনক। আমাদের অন্তরে বাহিরে একটি সুযুক্তিসঙ্গত নিয়মশৃঙ্খলার আধিপত্য; সমস্তই চিরাভ্যস্ত, চির-প্রত্যাশিত; এই সুনিয়মিত যুক্তিরাজ্যের সমভূমিমধ্যে যখন আমাদের চিত্ত অবাধে প্রবাহিত হইতে থাকে তখন তাহাকে বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারি না—ইতিমধ্যে হঠাৎ সেই চারিদিকের যথাযোগ্যতা ও যথাপরিমিততার মধ্যে যদি একটা অসঙ্গত ব্যাপারের অবতারণা হয় তবে আমাদের চিত্তপ্রবাহ অকস্মাৎ বাধা পাইয়া দুর্নিবার হাস্যতরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। সেই বাধা সুখের নহে, সৌন্দর্য্যের নহে, সুবিধার নহে, তেমনি আবার অনতিদুঃখেরও নহে সেই জন্য কৌতুকের সেই বিশুদ্ধ অমিশ্র উত্তেজনায় আমাদের আমোদ বোধ হয়।

আমি কহিলাম, অনুভবক্রিয়ামাত্রই সুখের, যদি না তাহার সহিত কোন গুরুতর দুঃখভয় ও স্বার্থহানি মিশ্রিত থাকে। এমন কি, ভয় পাইতেও সুখ আছে যদি তাহার সহিত বাস্তবিক ভয়ের কোন কারণ জড়িত না থাকে। ছেলেরা ভূতের গল্প শুনিতে একটা বিষম আকর্ষণ অনুভব করে, কারণ, হৃৎকম্পের উত্তেজনায় আমাদের যে চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে তাহাতেও আনন্দ আছে। রামায়ণে সীতাবিয়োগে রামের দুঃখে আমরা দুঃখিত হই, ওথেলোর অমূলক অসূয়া আমাদিগকে পীড়িত করে, দুহিতার কৃতঘ্নতাশরবিদ্ধ উন্মাদ লিয়রের মর্ম্মযাতনায় আমরা ব্যথা বোধ করি—কিন্তু সেই দুঃখপীড়া বেদনা উদ্রেক করিতে না পারিলে সে সকল কাব্য আমাদের নিকট তুচ্ছ হইত। বরঞ্চ দুঃখের কাব্যকে আমরা

সুখের কাব্য অপেক্ষা অধিক সমাদর করি; কারণ, দুঃখানুভবে আমাদের চিত্তে অধিকতর আন্দোলন উপস্থিত করে। কৌতুক মনের মধ্যে হঠাৎ আঘাত করিয়া আমাদের সাধারণ অনুভবক্রিয়া জাগ্রত করিয়া দেয়। এইজন্য অনেক রসিক লোক হঠাৎ শরীরে একটা আঘাত করাকে পরিহাস জ্ঞান করেন; অনেকে গালিকে ঠাট্টার স্বরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন; বাসরঘরে কর্ণমর্দ্দন এবং অন্যান্য পীড়নৈপুণ্যকে বঙ্গসীমন্তিনীগণ এক শ্রেণীর হাস্যরস বলিয়া স্থির করিয়াছেন;—হঠাৎ উৎকট বোমার আওয়াজ করা আমাদের দেশে উৎসবের অঙ্গ এবং কর্ণবধিরকর খোল-করতালের দ্বারা চিত্তকে ধূমপীড়িত মৌচাকের মৌমাছির মত একান্ত উদ্ভ্রান্ত করিয়া ভক্তিরসের অবতারণা করা হয়।

ক্ষিতি কহিল, বন্ধুগণ, ক্ষান্ত হও! কথাটা একপ্রকার শেষ হইয়াছে। যতটুকু পীড়নে সুখ বোধ হয় তাহা তোমরা অতিক্রম করিয়াছ, এক্ষণে দুঃখ ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। আমরা বেশ বুঝিয়াছি, যে, কমেডির হাস্য এবং ট্র্যাজেডির অশ্রুজল দুঃখের তারতম্যের উপর নির্ভর করে,—

ব্যোম কহিল—যেমন বরফের উপর প্রথম রৌদ্র পড়িলে তাহা ঝিক্‌ঝিক্ করিতে থাকে এবং রৌদ্রের তাপ বাড়িয়া উঠিলে তাহা গলিয়া পড়ে। তুমি কতকগুলি প্রহসন ও ট্র্যাজেডির নাম কর আমি তাহা হইতে প্রমাণ করিয়া দিতেছি—

এমন সময় দীপ্তি ও স্রোতস্বিনী হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দীপ্তি কহিলেন—তোমরা কি প্রমাণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছ?

ক্ষিতি কহিল, আমরা প্রমাণ করিতেছিলাম যে, তোমরা এতক্ষণ বিনা কারণে হাসিতেছিলে।

শুনিয়া দীপ্তি স্রোতস্বিনীর মুখের দিকে চাহিলেন, স্রোতস্বিনী

দীপ্তির মুখের দিকে চাহিলেন এবং উভয়ে পুনরায় কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

ব্যোম কহিল, আমি প্রমাণ করিতে যাইতেছিলাম, যে, কমেডিতে পরের অল্প পীড়া দেখিয়া আমরা হাসি এবং ট্র্যাজেডিতে পরের অধিক পীড়া দেখিয়া আমরা কাঁদি।

দীপ্তি ও স্রোতস্বিনীর সুমিষ্ট সম্মিলিত হাস্যরবে পুনশ্চ গৃহ কূজিত হইয়া উঠিল, এবং অনর্থক হাস্য উদ্রেকের জন্য উভয়ে উভয়কে দোষী করিয়া পরস্পরকে তর্জ্জন পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে সলজ্জভাবে দুই সখী গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

পুরুষ সভ্যগণ এই অকারণ হাস্যোচ্ছ্বাসদৃশ্যে স্মিতমুখে অবাক্ হইয়া রহিল। কেবল সমীর কহিল, ব্যোম, বেলা অনেক হইয়াছে, এখন তোমার ঐ বিচিত্রবর্ণের নাগপাশ বন্ধনটা খুলিয়া ফেলিলে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা দেখি না।

ক্ষিতি ব্যোমের লাঠিগাছটি তুলিয়া অনেকক্ষণ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, ব্যোম, তোমার এই গদাখানি কি কমেডির বিষয়, না, ট্র্যাজেডির উপকরণ?

কৌতুকহাস্যের মাত্রা।

সেদিনকার ডায়ারিতে কৌতুকহাস্য সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা পাঠ করিয়া শ্রীমতী দীপ্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন,—"একদিন প্রাতঃকালে স্রোতস্বিনীতে আমাতে মিলিয়া হাসিয়াছিলাম। ধন্য সেই প্রাতঃকাল এবং ধন্য দুই সখীর হাস্য! জগৎসৃষ্টি অবধি এমন চাপল্য অনেক রমণীই প্রকাশ করিয়াছে—এবং ইতিহাসে তাহার ফলাফল ভালমন্দ নানা

আকারে স্থায়ী হইয়াছে। নারীর হাসি অকারণ হইতে পারে কিন্তু তাহা অনেক মন্দাক্রান্তা, উপেন্দ্রবজ্রা, এমন কি, শার্দ্দূলবিক্রীড়িতচ্ছন্দ, অনেক ত্রিপদী, চতুষ্পদী এবং চতুর্দ্দশপদীর আদিকারণ হইয়াছে, এইরূপ শুনা যায়। রমণী তরলস্বভাববশতঃ অনর্থক হাসে, মাঝের হইতে তাহা দেখিয়া অনেক পুরুষ অনর্থক কাঁদে, অনেক পুরুষ ছন্দ মিলাইতে বসে, অনেক পুরুষ গলায় দড়ি দিয়া মরে—আবার এইবার দেখিলাম নারীর হাস্যে প্রবীণ ফিলজফরের মাথায় নবীন ফিলজফি বিকশিত হইয়া উঠে! কিন্তু সত্য কথা বলিতেছি, তত্ত্ব নির্ণয় অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারের অবস্থাটা আমরা পছন্দ করি।"

এই বলিয়া সেদিন আমরা হাস্য সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম শ্রীমতী দীপ্তি তাহাকে যুক্তিহীন অপ্রামাণ্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন।

আমার প্রথম কথা এই যে, আমাদের সেদিনকার তত্ত্বের মধ্যে, যে, যুক্তির প্রাবল্য ছিল না সে জন্য শ্রীমতী দীপ্তির রাগ করা উচিত হয় না। কারণ, নারীহাস্যে পৃথিবীতে যত প্রকার অনর্থপাত করে তাহার মধ্যে বুদ্ধিমানের বুদ্ধিভ্রংশও একটি। যে অবস্থায় আমাদের ফিলজফি প্রলাপ হইয়া উঠিয়াছিল সে অবস্থায় নিশ্চয়ই মনে করিলেই কবিতা লিখিতেও পারিতাম, এবং গলায় দড়ি দেওয়াও অসম্ভব হইত না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, তাঁহাদের হাস্য হইতে আমরা তত্ত্ব বাহির করিব এ কথা তাঁহারা যেমন কল্পনা করেন নাই, আমাদের তত্ত্ব হইতে তাঁহারা যে যুক্তি বাহির করিতে বসিবেন তাহাও আমরা কল্পনা করি নাই।

নিউটন আজন্ম সত্যান্বেষণের পর বলিয়াছেন আমি জ্ঞানসমুদ্রের কূলে কেবল নুড়ি কুড়াইয়াছি; আমরা চার বুদ্ধিমানে ক্ষণকালের কথোপকথনে নুড়ি কুড়াইবার ভরসাও রাখি না—আমরা বালির ঘর বাঁধিমাত্র। ঐ খেলাটার উপলক্ষ্য করিয়া জ্ঞানসমুদ্র হইতে খানিকটা সমুদ্রের

হাওয়া খাইয়া আসা আমাদের উদ্দেশ্য। রত্ন লইয়া আসি না, খানিকটা স্বাস্থ্য লইয়া আসি, তাহার পর সে বালির ঘর ভাঙে কি থাকে তাহাতে কাহারও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

রত্ন অপেক্ষা স্বাস্থ্য যে কম বহুমূল্য আমি তাহা মনে করি না। রত্ন অনেক সময় ঝুঁটা প্রমাণ হয়, কিন্তু স্বাস্থ্যকে স্বাস্থ্য ছাড়া আর কিছু বলিবার জো নাই। আমরা পাঞ্চভৌতিক সভার পাঁচ ভূতে মিলিয়া এ পর্য্যন্ত একটা কানাকড়ি দামের সিদ্ধান্তও সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি কি না সন্দেহ, কিন্তু, তবু যতবার আমাদের সভা বসিয়াছে আমরা শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসিলেও আমাদের সমস্ত মনের মধ্যে যে সবেগে রক্ত সঞ্চালন হইয়াছে, এবং সে জন্য আনন্দ এবং আরোগ্য লাভ করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

গড়ের মাঠে এক ছটাক শস্য জন্মে না, তবু অতটা জমি অনাবশ্যক নহে। আমাদের পাঞ্চভৌতিক সভাও আমাদের পাঁচজনের গড়ের মাঠ, এখানে সত্যের শস্যলাভ করিতে আসি না, সত্যের আনন্দলাভ করিতে মিলি।

সেইজন্য এ সভায় কোন কথার পুরা মীমাংসা না হইলেও ক্ষতি নাই, সত্যের কিয়দংশ পাইলেও আমাদের চলে। এমন কি, সত্যক্ষেত্র গভীর-রূপে কর্ষণ না করিয়া তাহার উপর দিয়া লঘু পদে চলিয়া যাওয়াই আমা-দের উদ্দেশ্য।

আর একদিক্ হইতে আর এক রকমের তুলনা দিলে কথাটা পরিষ্কার হইতে পারে। রোগের সময় ডাক্তারের ঔষধ উপকারী কিন্তু আত্মীয়ের সেবাটা বড় আরামের। জর্ম্মান্ পণ্ডিতের কেতাবে তত্ত্বজ্ঞানের যে সকল চরম সিদ্ধান্ত আছে তাহাকে ঔষধের বটিকা বলিতে পার কিন্তু মানসিক শুশ্রূষা তাহার মধ্যে নাই। পাঞ্চভৌতিক সভায় আমরা যে ভাবে সত্যালোচনা করিয়া থাকি তাহাকে রোগের চিকিৎসা বলা না যাক্, তাহাকে রোগীর শুশ্রূষা বলা যাইতে পারে।

আর অধিক তুলনা প্রয়োগ করিব না। মোট কথা এই, সেদিন আমরা চার বুদ্ধিমানে মিলিয়া হাসি সম্বন্ধে যে সকল কথা তুলিয়াছিলাম তাহার কোনটাই শেষ কথা নহে! যদি শেষ কথার দিকে যাইবার চেষ্টা করিতাম তাহা হইলে কথোপকথনসভার প্রধান নিয়ম লঙ্ঘন করা হইত।

কথোপকথনসভার একটি প্রধান নিয়ম—সহজে এবং দ্রুতবেগে অগ্রসর হওয়া। অর্থাৎ মানসিক পায়চারি করা! আমাদের যদি পদতল না থাকিত, দুই পা যদি দুটো তীক্ষ্ণাগ্র শলাকার মত হইত, তাহা হইলে মাটির ভিতর দিকে সুগভীর ভাবে প্রবেশ করার সুবিধা হইত কিন্তু এক পা অগ্রসর হওয়া সহজ হইত না। কথোপকথনসমাজে আমরা যদি প্রত্যেক কথার অংশকে শেষপর্য্যন্ত তলাইবার চেষ্টা করিতাম তাহা হইলে একটা জায়গাতেই এমন নিরুপায় ভাবে বিদ্ধ হইয়া পড়া যাইত, যে, আর চলাফেরার উপায় থাকিত না। এক একবার এমন অবস্থা হয়, চলিতে চলিতে হঠাৎ কাদার মধ্যে গিয়া পড়ি; সেখানে যেখানেই পা ফেলি হাঁটু পর্য্যন্ত বসিয়া যায়, চলা দায় হইয়া উঠে। এমন সকল বিষয় আছে যাহাতে প্রতিপদে গভীরতার দিকে তলাইয়া যাইতে হয়; কথোপকথনকালে সেই সকল অনিশ্চিত, সন্দেহতরল বিষয়ে পদার্পণ না করাই ভাল। সে সব জমি বায়ুসেবী পর্য্যটনকারীদের উপযোগী নহে, কৃষী যাহাদের ব্যবসায় তাহাদের পক্ষেই ভাল।

যাহা হউক, সে দিন মোটের উপরে আমরা প্রশ্নটা এই তুলিয়াছিলাম, যে, যেমন দুঃখের কান্না, তেমনি সুখের হাসি আছে—কিন্তু মাঝে হইতে কৌতুকের হাসিটা কোথা হইতে আসিল? কৌতুক জিনিষটা কিছু রহস্যময়। জন্তুরাও সুখ দুঃখ অনুভব করে কিন্তু কৌতুক অনুভব করে না। অলঙ্কারশাস্ত্রে যে ক'টা রসের উল্লেখ আছে সব রসই জন্তুদের অপরিণত অপরিস্ফুট সাহিত্যের মধ্যে আছে কেবল হাস্যরসটা

নাই। হয় ত বানরের প্রকৃতির মধ্যে এই রসের কথঞ্চিৎ আভাস দেখা যায়, কিন্তু বানরের সহিত মানুষের আরও অনেক বিষয়েই সাদৃশ্য আছে।

যাহা অসঙ্গত তাহাতে মানুষের দুঃখ পাওয়া উচিত ছিল, হাসি পাই-বার কোন অর্থই নাই। পশ্চাতে যখন চৌকি নাই তখন চৌকিতে বসিতেছি মনে করিয়া কেহ যদি মাটিতে পড়িয়া যায় তবে তাহাতে দর্শক-বৃন্দের সুখানুভব করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখা যায় না। এমন একটা উদাহরণ কেন, কৌতুকমাত্রেরই মধ্যে একটা পদার্থ আছে যাহাতে মানুষের সুখ না হইয়া দুঃখ হওয়া উচিত!

আমরা কথায় কথায় সেদিন ইহার একটা কারণ নির্দ্দেশ করিয়া ছিলাম! আমরা বলিয়াছিলাম, কৌতুকের হাসি এবং আমোদের হাসি একজাতীয়—উভয় হাস্যের মধ্যেই একটা প্রবলতা আছে। তাই আমাদের সন্দেহ হইয়াছিল, যে, হয় ত আমোদ এবং কৌতুকের মধ্যে একটা প্রকৃতিগত সাদৃশ্য আছে; সেইটে বাহির করিতে পারিলেই কৌতুকহাস্যের রহস্য ভেদ হইতে পারে!

সাধারণভাবের সুখের সহিত আমোদের একটা প্রভেদ আছে! নিয়মভঙ্গে যে একটু পীড়া আছে সেই পীড়াটুকু না থাকিলে আমোদ হইতে পারে না। আমোদ জিনিষটা নিত্যনৈমিত্তিক সহজ নিয়মসঙ্গত নহে; তাহা মাঝে মাঝে এক একদিনের; তাহাতে প্রয়াসের আবশ্যক। সেই পীড়ন এবং প্রয়াসের সংঘর্ষে মনের যে একটা উত্তেজনা হয় সেই উত্তেজনাই আমোদের প্রধান উপকরণ।

আমরা বলিয়াছিলাম কৌতুকের মধ্যেও নিয়মভঙ্গজনিত একটা পীড়া আছে; সেই পীড়াটা অনতিঅধিকমাত্রায় না গেলে আমাদের মনে যে একটা সুখকর উত্তেজনার উদ্রেক করে, সেই আকস্মিক উত্তেজনার আঘাতে আমরা হাসিয়া উঠি। যাহা সুসঙ্গত তাহা চিরদিনের নিয়মসম্মত,

যাহা অসঙ্গত তাহা ক্ষণকালের নিয়মভঙ্গ। যেখানে যাহা হওয়া উচিত সেখানে তাহা হইলে তাহাতে আমাদের মনের কোন উত্তেজনা নাই, হঠাৎ, না হইলে কিম্বা আর একরূপ হইলে সেই আকস্মিক অনতিপ্রবল উৎপীড়নে মনটা একটা বিশেষ চেতনা অনুভব করিয়া সুখ পায় এবং আমরা হাসিয়া উঠি।

সেদিন আমরা এই পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম—আর বেশীদূর যাই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আর যে যাওয়া যায় না তাহা নহে। আরও বলিবার কথা আছে।

শ্রীমতী দীপ্তি প্রশ্ন করিয়াছেন, যে, আমাদের চার পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয় তবে চলিতে চলিতে হঠাৎ অল্প হুঁচট্ খাইলে কিম্বা রাস্তায় যাইতে অকস্মাৎ অল্পমাত্রায় দুর্গন্ধ নাকে আসিলে আমাদের হাসি পাওয়া, অন্তত, উত্তেজনাজনিত সুখ অনুভব করা উচিত।

এ প্রশ্নের দ্বারা আমাদের মীমাংসা খণ্ডিত হইতেছে না, সীমাবদ্ধ হইতেছে মাত্র। ইহাতে কেবল এইটুকু দেখা যাইতেছে যে পীড়নমাত্রেই কৌতুকজনক উত্তেজনা জন্মায় না; অতএব, এক্ষণে দেখা আবশ্যক, কৌতুক-পীড়নের বিশেষ উপকরণটা কি।

জড়প্রকৃতির মধ্যে করুণরসও নাই, হাস্যরসও নাই। একটা বড় পাথর ছোট পাথরকে গুঁড়াইয়া ফেলিলেও আমাদের চোখে জল আসে না, এবং সমতলক্ষেত্রের মধ্যে চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা খাপছাড়া গিরি-শৃঙ্গ দেখিতে পাইলে তাহাতে আমাদের হাসি পায় না। নদী নির্ঝর পর্ব্বত সমুদ্রের মধ্যে মাঝে মাঝে আকস্মিক অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহা বাধাজনক, বিরক্তিজনক, পীড়াজনক হইতে পারে, কিন্তু কোন স্থানেই কৌতুকজনক হয় না। সচেতন পদার্থসম্বন্ধীয় খাপছাড়া ব্যাপার ব্যতীত শুদ্ধ জড়পদার্থে আমাদের হাসি আনিতে পারে না।

কেন, তাহা ঠিক করিয়া বলা শক্ত কিন্তু আলোচনা করিয়া দেখিতে দোষ নাই।

আমাদের ভাষায় কৌতুক এবং কৌতূহল শব্দের অর্থের যোগ আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক স্থলে একই অর্থে বিকল্পে উভয় শব্দেরই প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহা হইতে অনুমান করি, কৌতূহলবৃত্তির সহিত কৌতুকের বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

কৌতূহলের একটা প্রধান অঙ্গ নূতনত্বের লালসা—কৌতুকেরও একটা প্রধান উপাদান নূতনত্ব। অসঙ্গতের মধ্যে যেমন নিছক বিশুদ্ধ নূতনত্ব আছে সঙ্গতের মধ্যে তেমন নাই।

কিন্তু প্রকৃত অসঙ্গতি ইচ্ছাশক্তির সহিত জড়িত, তাহা জড় পদার্থের মধ্যে নাই। আমি যদি পরিষ্কার পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ দুর্গন্ধ পাই তবে আমি নিশ্চয় জানি, নিকটে কোথায় এক জায়গায় দুর্গন্ধ বস্তু আছে তাই এইরূপ ঘটিল; ইহাতে কোনরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই, ইহা অবশ্যম্ভাবী। জড়প্রকৃতিতে যে যে কারণে যাহা হইতেছে তাহা ছাড়া আর কিছু হইবার জো নাই, ইহা নিশ্চয়।

কিন্তু পথে চলিতে চলিতে যদি হঠাৎ দেখি একজন মান্য বৃদ্ধ ব্যক্তি খেম্‌টা নাচ নাচিতেছে, তবে সেটা প্রকৃতই অসঙ্গত ঠেকে; কারণ, তাহা অনিবার্য্য নিয়মসঙ্গত নহে। আমরা বৃদ্ধের নিকট কিছুতেই এরূপ আচরণ প্রত্যাশা করি না, কারণ, সে ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন লোক; সে ইচ্ছা করিয়া নাচিতেছে; ইচ্ছা করিলে না নাচিতে পারিত। জড়ের নাকি নিজের ইচ্ছামত কিছু হয় না এই জন্য জড়ের পক্ষে কিছুই অসঙ্গত কৌতুকাবহ হইতে পারে না। এই জন্য অনপেক্ষিত হুঁচট বা দুর্গন্ধ হাস্যজনক নহে। চায়ের চামচ যদি দৈবাৎ চায়ের পেয়ালা হইতে চ্যুত হইয়া দোয়াতের কালির মধ্যে পড়িয়া যায় তবে সেটা চামচের পক্ষে হাস্যকর নহে—ভারাকর্ষণের নিয়ম তাহার লঙ্ঘন করিবার জো নাই;

কিন্তু অন্যমনস্ক লেখক যদি তাঁহার চায়ের চামচ দোয়াতের মধ্যে ডুবাইয়া চা খাইবার চেষ্টা করেন তবে সেটা কৌতুকের বিষয় বটে। ধর্ম্মনীতি যেমন জড়ে নাই, অসঙ্গতিও সেইরূপ জড়ে নাই। মনঃপদার্থ প্রবেশ করিয়া যেখানে দ্বিধা জন্মাইয়া দিয়াছে সেইখানেই উচিত এবং অনুচিত, সঙ্গত এবং অদ্ভুত।

কৌতূহল জিনিষটা অনেক স্থলে নিষ্ঠুর; কৌতুকের মধ্যেও নিষ্ঠুরতা আছে। সিরাজদ্দৌলা দুইজনের দাড়িতে দাড়িতে বাঁধিয়া উভয়ের নাকে নস্য পুরিয়া দিতেন এইরূপ প্রবাদ শুনা যায়—উভয়ে হাঁচিতে আরম্ভ করিত তখন সিরাজদ্দৌলা আমোদ অনুভব করিতেন। ইহার মধ্যে অসঙ্গতি কোন্‌খানে? নাকে নস্য দিলে ত হাঁচি আসিবারই কথা। কিন্তু এখানেও ইচ্ছার সহিত কার্য্যের অসঙ্গতি। যাহাদের নাকে নস্য দেওয়া হইতেছে তাহাদের ইচ্ছা নয় যে তাহারা হাঁচে, কারণ, হাঁচিলেই তাহাদের দাড়িতে অকস্মাৎ টান পড়িবে কিন্তু তথাপি তাহাদিগকে হাঁচিতেই হইতেছে।

এইরূপ ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসঙ্গতি, উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের অসঙ্গতি, কথার সহিত কার্য্যের অসঙ্গতি, এগুলোর মধ্যে নিষ্ঠুরতা আছে। অনেক সময় আমরা যাহাকে লইয়া হাসি সে নিজের অবস্থাকে হাস্যের বিষয় জ্ঞান করে না। এই জন্যই পাঞ্চভৌতিক সভায় ব্যোম বলিয়াছিলেন, যে, কমেডি এবং ট্র্যাজেডি কেবল পীড়নের মাত্রাভেদ। কমেডিতে যতটুকু নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হয় তাহাতে আমাদের হাসি পায় এবং ট্র্যাজেডিতে যতদূর পর্য্যন্ত যায় তাহাতে আমাদের চোখে জল আসে। গর্দ্দভের নিকট অনেক টাইটানিয়া অপূর্ব্ব মোহবশতঃ যে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া থাকে তাহা মাত্রাভেদে এবং পাত্রভেদে মর্ম্মভেদী শোকের কারণ হইয়া উঠে।

অসঙ্গতি কমেডিরও বিষয়, অসঙ্গতি ট্র্যাজেডিরও বিষয়। কমেডিতেও

ইচ্ছার সহিত অবস্থার অসঙ্গতি প্রকাশ পায়। ফল্‌ষ্টাফ্‌ উয়িণ্ড্‌সরবাসিনী রঙ্গিনীর প্রেমলালসায় বিশ্বস্তচিত্তে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু দুর্গতির এক-শেষ লাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন;—রামচন্দ্র যখন রাবণ বধ করিয়া, বনবাস—প্রতিজ্ঞাপূরণ করিয়া, রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া দাম্পত্য সুখের চরমশিখরে আরোহণ করিয়াছেন এমন সময় অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল, গর্ভবতী সীতাকে অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিতে বাধ্য হই-লেন। উভয় স্থলেই আশার সহিত ফলের, ইচ্ছার সহিত অবস্থার অস-ঙ্গতি প্রকাশ পাইতেছে। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, অসঙ্গতি দুই শ্রেণীর আছে; একটা হাস্যজনক, আর একটা দুঃখজনক। বিরক্তি-জনক, বিস্ময়জনক, রোষজনককেও আমরা শেষ শ্রেণীতে ফেলিতেছি।

অর্থাৎ অসঙ্গতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখনই আমাদের কৌতুক বোধ হয়, গভীরতর স্তরে আঘাত করিলে আমাদের দুঃখ বোধ হয়। শিকারী যখন অনেকক্ষণ অনেক তাক করিয়া হংসভ্রমে একটা দূরস্থ শ্বেত পদার্থের প্রতি গুলি বর্ষণ করে এবং ছুটিয়া কাছে গিয়া দেখে সেটা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড, তখন তাহার সেই নৈরাশ্যে আমাদের হাসি পায়; কিন্তু কোন লোক যাহাকে আপন জীবনের পরম পদার্থ মনে করিয়া একাগ্রচিত্তে একান্ত চেষ্টায় আজন্মকাল তাহার অনুসরণ করিয়াছে এবং অবশেষে সিদ্ধকাম হইয়া তাহাকে হাতে লইয়া দেখিয়াছে সে তুচ্ছ প্রবঞ্চনামাত্র, তখন তাহার সেই নৈরাশ্যে অন্তঃকরণ ব্যথিত হয়।

স্থূল কথাটা এই যে, অসঙ্গতির তার অল্পে অল্পে চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইতে থাকে।

সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সন্তোষ।

দীপ্তি এবং স্রোতস্বিনী উপস্থিত ছিলেন না,—কেবল আমরা চারি জন ছিলাম।

সমীর বলিল, দেখ সেদিনকার সেই কৌতুকহাস্যের প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে উদয় হইয়াছে। অধিকাংশ কৌতুক আমাদের মনে একটা কিছু অদ্ভুত ছবি আনয়ন করে এবং তাহাতেই আমাদের হাসি পায়। কিন্তু যাহারা স্বভাবতই ছবি দেখিতে পায় না, যাহাদের বুদ্ধি অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট্ বিষয়ের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে কৌতুক তাহাদিগকে সহসা বিচলিত করিতে পারে না।

ক্ষিতি কহিল, প্রথমতঃ তোমার কথাটা স্পষ্ট বুঝা গেল না, দ্বিতীয়তঃ অ্যাব্‌ষ্ট্র্যাক্ট্ শব্দটা ইংরাজি।

সমীর কহিল, প্রথম অপরাধটা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিতেছি কিন্তু দ্বিতীয় অপরাধ হইতে নিষ্কৃতির উপায় দেখি না, অতএব সুধীগণকে ওটা নিজগুণে মার্জ্জনা করিতে হইবে। আমি বলিতেছিলাম, যাহারা দ্রব্যটাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া তাহার গুণটাকে অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে তাহারা স্বভাবত হাস্যরস-রসিক হয় না।

ক্ষিতি মাথা নাড়িয়া কহিল, উহুঁ, এখনো পরিষ্কার হইল না।

সমীর কহিল, একটা উদাহরণ দিই। প্রথমতঃ দেখ, আমাদের সাহিত্যে কোন সুন্দরীর বর্ণনাকালে ব্যক্তিবিশেষের ছবি আঁকিবার দিকে লক্ষ্য নাই; সুমেরু দাড়িম্ব কদম্ব বিম্ব প্রভৃতি হইতে কতকগুলি গুণ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া তাহারই তালিকা দেওয়া হয় এবং সুন্দরী-মাত্রেরই প্রতি তাহার আরোপ হইয়া থাকে। আমরা ছবির মত স্পষ্ট করিয়া কিছু দেখি না এবং ছবি আঁকি না—সেই জন্য কৌতুকের একটি

প্রধান অঙ্গ হইতে আমরা বঞ্চিত। আমাদের প্রাচীন কাব্যে প্রশংসাচ্ছলে গজেন্দ্রগমনের সহিত সুন্দরীর চলনের তুলনা হইয়া থাকে। এ তুলনাটি অন্যদেশীয় সাহিত্যে নিশ্চয়ই হাস্যকর বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু এমন একটা অদ্ভুত তুলনা আমাদের দেশে উদ্ভুত এবং সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইল কেন? তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের লোকেরা দ্রব্য হইতে তাহার গুণটা অনায়াসে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইতে পারে। ইচ্ছামত হাতি হইতে হাতির সমস্তটাই লোপ করিয়া দিয়া কেবলমাত্র তাহার মন্দগমনটুকু বাহির করিতে পারে, এই জন্য ষোড়শী সুন্দরীর প্রতি যখন গজেন্দ্রগমন আরোপ করে তখন সেই বৃহদাকার জন্তুটাকে একেবারেই দেখিতে পায় না। যখন একটা সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা কবির উদ্দেশ্য হয় তখন সুন্দর উপমা নির্ব্বাচন করা আবশ্যক; কারণ, উপমার কেবল সাদৃশ্য অংশ নহে অন্যান্য অংশও আমাদের মনে উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না। সেই জন্য হাতির শুঁড়ের সহিত স্ত্রীলোকের হাত পায়ের তুলনা করা সামান্য দুঃসাহসিকতা নহে। কিন্তু আমাদের দেশের পাঠক এ তুলনায় হাসিল না বিরক্ত হইল না; তাহার কারণ, হাতির শুঁড় হইতে কেবল তাহার গোলত্বটুকু লইয়া আর সমস্তই আমরা বাদ দিতে পারি, আমাদের সেই আশ্চর্য্য ক্ষমতাটি আছে। গৃধিনীর সহিত কানের কি সাদৃশ্য আছে বলিতে পারি না, আমার তদুপযুক্ত কল্পনাশক্তি নাই; কিন্তু সুন্দর মুখের দুই পাশে দুই গৃধিনী ঝুলিতেছে মনে করিয়া হাসি পায় না কল্পনাশক্তির এত অসাড়তাও আমার নাই। বোধ করি নব্য শিক্ষায় আমাদের না হাসিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা বিকৃত হইয়া যাওয়াতেই এরূপ দুর্ঘটনা ঘটে।

ক্ষিতি কহিল,—আমাদের দেশের কাব্যে নারীদেহের বর্ণনায় যেখানে উচ্চতা বা গোলতা বুঝাইবার আবশ্যক হইয়াছে সেখানে কবিরা অনায়াসে গম্ভীর মুখে সুমেরু এবং মেদিনীর অবতারণা করিয়াছেন, তাহার কারণ,

অ্যাব্‌ষ্ট্র্যাক্টের দেশে পরিমাণবিচারের অবশ্যকতা নাই; গোরুর পিঠের কুঁজও উচ্চ, কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরও উচ্চ অতএব অ্যাব্‌ষ্ট্র্যাক্ট্‌ উচ্চতাটুকু-মাত্র ধরিতে গেলে গোরুর পিঠের কুঁজের সহিত কাঞ্চনজঙ্ঘার তুলনা করা যাইতে পারে; কিন্তু যে হতভাগ্য কাঞ্চনজঙ্ঘার উপমা শুনিবামাত্র কল্পনাপটে হিমালয়ের শিখর চিত্রিত দেখিতে পায়, যে বেচারা গিরিচূড়া হইতে আলগোছে কেবল তাহার উচ্চতাটুকু লইয়া বাকি আর সমস্তই আড়াল করিতে পারে না, তাহার পক্ষে বড়ই মুস্কিল। ভাই সমীর, তোমার আজিকার এই কথাটা ঠিক মনে লাগিতেছে—প্রতিবাদ না করিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত আছি।

ব্যোম কহিল, কিছু প্রতিবাদ করিবার নাই তাহা বলিতে পারি না। সমীরের মতটা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে বলা আবশ্যক। আসল কথাটা এই—আমরা অন্তর্জগৎবিহারী। বাহিরের জগৎ আমাদের নিকট প্রবল নহে। আমরা যাহা মনের মধ্যে গড়িয়া তুলি বাহিরের জগৎ তাহার প্রতিবাদ করিলে সে প্রতিবাদ গ্রাহ্যই করি না। যেমন ধূমকেতুর লঘু পুচ্ছটা কোন গ্রহের পথে আসিয়া পড়িলে তাহার পুচ্ছেরই ক্ষতি হইতে পারে কিন্তু গ্রহ অপ্রতিহতভাবে অনায়াসে চলিয়া যায়, তেমনি বহির্জগতের সহিত আমাদের অন্তর্জগতের রীতিমত সংঘাত কোন কালে হয় না; হইলে বহির্জগৎটাই হঠিয়া যায়। যাহাদের কাছে হাতিটা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ প্রবল সত্য, তাহারা গজেন্দ্রগমনের উপমায় গজেন্দ্রটাকে বেমালুম বাদ দিয়া কেবল গমনটুকুকে রাখিতে পারে না। গজেন্দ্র বিপুল দেহ বিস্তার পূর্ব্বক অটলভাবে কাব্যের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের কাছে গজ বল, গজেন্দ্র বল, কিছুই কিছু নয়। সে আমাদের কাছে এত অধিক জাজ্বল্যমান নহে, যে, তাহার গমনটুকু রাখিতে হইলে তাহাকে সুদ্ধ পুষিতে হইবে।

ক্ষিতি কহিল, আমরা অন্তরের বাঁশের কেল্লা বাঁধিয়া তীতুমীরের

মত বহিঃপ্রকৃতির সমস্ত "গোলা খা ডালা"—সেই জন্য গজেন্দ্র বল, সুমেরু বল, মেদিনী বল কিছুতেই আমাদিগকে হঠাইতে পারে না। কাব্যে কেন, জ্ঞানরাজ্যেও আমরা বহির্জগৎকে খাতিরমাত্র করি না। একটা সহজ উদাহরণ মনে পড়িতেছে। আমাদের সাত সুর ভিন্ন ভিন্ন পশু-পক্ষীর কণ্ঠস্বর হইতে প্রাপ্ত, ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে এই প্রবাদ বহুকাল চলিয়া আসিতেছে—এ পর্য্যন্ত আমাদের ওস্তাদদের মনে এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহমাত্র উদয় হয় নাই, অথচ বহির্জগৎ হইতে প্রতিদিনই তাহার প্রতিবাদ আমাদের কানে আসিতেছে। স্বরমালার প্রথম সুরটা যে গাধার সুর হইতে চুরি এরূপ পরমাশ্চর্য্য কল্পনা কেমন করিয়া যে কোন সুরজ্ঞ ব্যক্তির মনে উদয় হইল তাহা আমাদের পক্ষে স্থির করা দুরূহ।

ব্যোম কহিল, গ্রীকদিগের নিকট বহির্জগৎ বাষ্পবৎ মরীচিকাবৎ ছিল না, তাহা প্রত্যক্ষ জাজ্বল্যমান ছিল, এই জন্য অত্যন্ত যত্নসহকারে তাঁহাদিগকে মনের সৃষ্টির সহিত বাহিরের সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইত। কোন বিষয়ে পরিমাণ লঙ্ঘন হইলে বাহিরের জগৎ আপন মাপকাঠি লইয়া তাঁহাদিগকে লজ্জা দিত। সেই জন্য তাঁহারা আপন দেবদেবীর মূর্ত্তি সুন্দর এবং স্বাভাবিক করিয়া গড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন —নতুবা জাগতিক সৃষ্টির সহিত তাঁহাদের মনের সৃষ্টির একটা প্রবল সংঘাত বাধিয়া তাঁহাদের ভক্তির ও আনন্দের ব্যাঘাত করিত। আমাদের সে ভাবনা নাই। আমরা আমাদের দেবতাকে যে মূর্ত্তিই দিই না কেন আমাদের কল্পনার সহিত বা বহির্জগতের সহিত তাহার কোন বিরোধ ঘটে না। মূষিকবাহন চতুর্ভুজ একদন্ত লম্বোদর গজানন মূর্ত্তি আমাদের নিকট হাস্যজনক নহে, কারণ, আমরা সেই মূর্ত্তিকে আমাদের মনের ভাবের মধ্যে দেখি, বাহিরের জগতের সহিত, চারিদিকের সত্যের সহিত তাহার তুলনা করি না। কারণ, বাহিরের জগৎ আমাদের নিকট তেমন প্রবল নহে, প্রত্যক্ষ সত্য আমাদের নিকট তেমন সুদৃঢ় নহে, আমরা

যে-কোন একটা উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া নিজের মনের ভাবটাকে জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারি।

সমীর কহিল,—যেটাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমরা প্রেম বা ভক্তির উপভোগ অথবা সাধনা করিয়া থাকি, সেই উপলক্ষ্যটাকে সম্পূর্ণতা বা স্বাভাবিকতায় ভূষিত করিয়া তোলা আমরা অনাবশ্যক মনে করি। আমরা সম্মুখে একটা কুগঠিত মূর্ত্তি দেখিয়াও মনে তাহাকে সুন্দর বলিয়া অনুভব করিতে পারি। মানুষের ঘননীলবর্ণ আমাদের নিকট স্বভাবত সুন্দর মনে না হইতে পারে, অথচ ঘননীলবর্ণে চিত্রিত কৃষ্ণের মূর্ত্তিকে সুন্দর বলিয়া ধারণা করিতে আমাদিগকে কিছুমাত্র প্রয়াস পাইতে হয় না। বহির্জগতের আদর্শকে যাহারা নিজের স্বেচ্ছামতে লোপ করিতে জানে না, তাহারা মনের সৌন্দর্য্যভাবকে মূর্ত্তি দিতে গেলে কখনই কোন অস্বাভাবিকতা বা অসৌন্দর্য্যের সমাবেশ করিতে পারে না। গ্রীকদের চক্ষে এই নীলবর্ণ অত্যন্ত অধিক পীড়া উৎপাদন করিত।

ব্যোম কহিল, আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির এই বিশেষত্বটি উচ্চ-অঙ্গের কলাবিদ্যার ব্যাঘাত করিতে পারে কিন্তু ইহার একটু সুবিধাও আছে। ভক্তি স্নেহ প্রেম, এমন কি, সৌন্দর্য্যভোগের জন্য আমাদিগকে বাহিরের দাসত্ব করিতে হয় না, সুবিধা সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। আমাদের দেশে স্ত্রী স্বামীকে দেবতা বলিয়া পূজা করে—কিন্তু সেই ভক্তিভাব উদ্রেক করিবার জন্য স্বামীর দেবত্ব বা মহত্ত্ব থাকিবার কোন আবশ্যক করে না; এমন কি ঘোরতর পশুত্ব থাকিলেও পূজার ব্যাঘাত হয় না। তাহারা একদিকে স্বামীকে মানুষভাবে লাঞ্ছনা গঞ্জনা করিতে পারে আবার অন্যদিকে দেবতাভাবে পূজাও করিয়া থাকে। একটাতে অন্যটা অভিভূত হয় না। কারণ, আমাদের মনোজগতের সহিত বাহ্যজগতের সংঘাত তেমন প্রবল নহে।

সমীর কহিল, কেবল স্বামীদেবতা কেন, পৌরাণিক দেবদেবী

সম্বন্ধেও আমাদের মনের এইরূপ দুই বিরোধী ভাব আছে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে দূরীকৃত করিতে পারে না। আমাদের দেবতাদের সম্বন্ধে যে সকল শাস্ত্রকাহিনী ও জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে তাহা আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধির উচ্চ আদর্শসঙ্গত নহে, এমন কি, আমাদের সাহিত্যে, আমাদের সঙ্গীতে, সেই সকল দেবকুৎসার উল্লেখ করিয়া বিস্তর তিরস্কার ও পরিহাসও আছে—কিন্তু ব্যঙ্গ ও ভর্ৎসনা করি বলিয়া যে ভক্তি করি না তাহা নহে। গাভীকে জন্তু বলিয়া জানি, তাহার বুদ্ধিবিবেচনার প্রতিও কটাক্ষপাত করিয়া থাকি, ক্ষেতের মধ্যে প্রবেশ করিলে লাঠিহাতে তাহাকে তাড়াও করি, গোয়ালঘরে তাহাকে এক হাঁটু গোময় পঙ্কের মধ্যে দাঁড় করাইয়া রাখি। কিন্তু ভগবতী বলিয়া ভক্তি করিবার সময় সে সব কথা মনেও উদয় হয় না।

ক্ষিতি কহিল, আবার দেখ, আমরা চিরকাল বেসুরো লোককে গাধার সহিত তুলনা করিয়া আসিতেছি অথচ বলিতেছি গাধাই আমাদিগকে প্রথম সুর ধরাইয়া দিয়াছে। যখন এটা বলি তখন ওটা মনে আনি না, যখন ওটা বলি তখন এটা মনে আনি না। ইহা আমাদের একটা বিশেষ ক্ষমতা, সন্দেহ নাই, কিন্তু এই বিশেষ ক্ষমতাবশত ব্যোম যে সুবিধার উল্লেখ করিতেছেন আমি তাহাকে সুবিধা মনে করি না! কাল্পনিক সৃষ্টি বিস্তার করিতে পারি বলিয়া অর্থলাভ, জ্ঞানলাভ এবং সৌন্দর্য্য ভোগ সম্বন্ধে আমাদের একটা ঔদাসীন্যজড়িত সন্তোষের ভাব আছে। আমাদের বিশেষ কিছু আবশ্যক নাই। য়ুরোপীয়েরা তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক অনুমানকে কঠিন প্রমাণের দ্বারা সহস্রবার করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন তথাপি তাঁহাদের সন্দেহ মিটিতে চায় না—আমরা মনের মধ্যে যদি বেশ একটা সুসঙ্গত এবং সুগঠিত মত খাড়া করিতে পারি তবে তাহার সুসঙ্গতি এবং সুষমাই আমাদের নিকট সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়, তাহাকে বহির্জগতে পরীক্ষা করিয়া দেখা বাহুল্য বোধ

করি। জ্ঞানবৃত্তি সম্বন্ধে যেমন, হৃদয়বৃত্তি সম্বন্ধে সেইরূপ। আমরা সৌন্দর্য্যরসের চর্চ্চা করিতে চাই, কিন্তু সে জন্য অতি যত্নসহকারে মনের আদর্শকে বাহিরে মূর্ত্তিমান করিয়া তোলা আবশ্যক বোধ করি না—যেমন-তেমন একটা-কিছু হইলেই সন্তুষ্ট থাকি,—এমন কি, আলঙ্কারিক অত্যুক্তি অনুসরণ করিয়া একটা বিকৃত মূর্ত্তি খাড়া করিয়া তুলি এবং সেই অসঙ্গত বিরূপ বিসদৃশ ব্যাপারকে মনে মনে আপন ইচ্ছামত ভাবে পরিণত করিয়া তাহাতেই পরিতৃপ্ত হই; আপন দেবতাকে, আপন সৌন্দর্য্যের আদর্শকে প্রকৃতরূপে সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করি না। ভক্তিরসের চর্চ্চা করিতে চাই, কিন্তু যথার্থ ভক্তির পাত্র অন্বেষণ করিবার কোন আবশ্যকতা বোধ করি না—অপাত্রে ভক্তি করিয়াও আমরা সন্তোষে থাকি। সেই জন্য আমরা বলি গুরুদেব আমাদের পূজনীয়, এ কথা বলি না যে যিনি পূজনীয় তিনি আমাদের গুরু। হয়ত গুরু আমার কানে যে মন্ত্র দিয়াছেন তাহার অর্থ তিনি কিছুই বুঝেন না, হয়ত গুরুঠাকুর আমার মিথ্যা মকদ্দমায় প্রধান মিথ্যা সাক্ষী তথাপি তাঁহার পদধূলি আমার শিরোধার্য্য—এরূপ মত গ্রহণ করিলে ভক্তির জন্য ভক্তিভাজনকে খুঁজিতে হয় না, দিব্য আরামে ভক্তি করা যায়।

সমীর কহিল—শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র তাহার একটি উদাহরণ। বঙ্কিম কৃষ্ণকে পূজা করিবার এবং কৃষ্ণপূজা প্রচার করিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণকে নির্ম্মল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন কি, কৃষ্ণের চরিত্রে অনৈসর্গিক যাহা কিছু ছিল তাহাও তিনি বর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি কৃষ্ণকে তাঁহার নিজের উচ্চতম আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি একথা বলেন নাই যে, দেবতার কোন কিছুতেই দোষ নাই, তেজীয়ানের পক্ষে সমস্ত মার্জ্জনীয়। তিনি এক নূতন অসন্তোষের সূত্রপাত করিয়াছেন;—তিনি পূজা বিতরণের

পূর্ব্বে প্রাণপণ চেষ্টায় দেবতাকে অন্বেষণ করিয়াছেন ও হাতের কাছে যাহাকে পাইয়াছেন তাহাকেই নমোনমঃ করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই।

ক্ষিতি কহিল—এই অসন্তোষটি না থাকাতে বহুকাল হইতে আমাদের সমাজে দেবতাকে দেবতা হইবার, পূজ্যকে উন্নত হইবার, মূর্ত্তিকে ভাবের অনুরূপ হইবার প্রয়োজন হয় নাই। ব্রাহ্মণকে দেবতা বলিয়া জানি, সেই জন্য বিনা চেষ্টায় তিনি পূজা প্রাপ্ত হন, এবং আমাদেরও ভক্তিবৃত্তি অতি অনায়াসে চরিতার্থ হয়। স্বামীকে দেবতা বলিলে স্ত্রীর ভক্তি পাইবার জন্য স্বামীর কিছুমাত্র যোগ্যতালাভের আবশ্যক হয় না, এবং স্ত্রীকেও যথার্থ ভক্তির যোগ্য স্বামী অভাবে অসন্তোষ অনুভব করিতে হয় না। সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার জন্য সুন্দর জিনিষের আবশ্যকতা নাই, ভক্তি বিতরণ করিবার জন্য ভক্তিভাজনের প্রয়োজন নাই এরূপ পরমসন্তোষের অবস্থাকে আমি সুবিধা মনে করি না। ইহাতে কেবল সমাজের দীনতা, শ্রী-হীনতা এবং অবনতি ঘটিতে থাকে। বহির্জ্জগৎটাকে উত্তরোত্তর বিলুপ্ত করিয়া দিয়া মনোজগৎকেই সর্ব্বপ্রাধান্য দিতে গেলে যে ডালে বসিয়া আছি সেই ডালকেই কুঠারাঘাত করা হয়।

ভদ্রতার আদর্শ।

স্রোতস্বিনী কহিল, দেখ, বাড়িতে ক্রিয়াকর্ম্ম আছে, তোমরা ব্যোমকে একটু ভদ্রবেশ পরিয়া আসিতে বলিয়ো।

শুনিয়া আমরা সকলে হাসিতে লাগিলাম। দীপ্তি একটু রাগ করিয়া বলিল—না, হাসিবার কথা নয়; তোমরা ব্যোমকে সাবধান করিয়া দাও না বলিয়া সে ভদ্রসমাজে এমন উন্মাদের মত সাজ করিয়া আসে। এ সকল বিষয়ে একটু সামাজিক শাসন থাকা দরকার।

সমীর কথাটাকে ফলাইয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিল—কেন দরকার?

দীপ্তি কহিল—কাব্যরাজ্যে কবির শাসন যেমন কঠিন; কবি যেমন ছন্দের কোন শৈথিল্য, মিলের কোন ত্রুটি, শব্দের কোন রূঢ়তা মার্জ্জনা করিতে চাহে না,—আমাদের আচার ব্যবহার বসন ভূষণ সম্বন্ধে সমাজ-পুরুষের শাসন তেমনি কঠিন হওয়া উচিত, নতুবা সমগ্র সমাজের ছন্দ এবং সৌন্দর্য্য কখনই রক্ষা হইতে পারে না।

ক্ষিতি কহিল, ব্যোম বেচারা যদি মানুষ না হইয়া শব্দ হইত, তাহা হইলে এ কথা নিশ্চয় বলিতে পারি ভট্টিকাব্যেও তাহার স্থান হইত না; নিঃসন্দেহ তাহাকে মুগ্ধবোধের সূত্র অবলম্বন করিয়া বাস করিতে হইত।

আমি কহিলাম, সমাজকে সুন্দর, সুশিষ্ট, সুশৃঙ্খল করিয়া তোলা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য সে কথা মানি কিন্তু অন্যমনস্ক ব্যোম বেচারা সে কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া দীর্ঘ পদবিক্ষেপে যখন চলিয়া যায় তখন তাহাকে মন্দ লাগে না।

দীপ্তি কহিল—ভাল কাপড় পরিলে তাহাকে আরও ভাল লাগিত।

ক্ষিতি কহিল—সত্য বল দেখি, ভাল কাপড় পরিলে ব্যোমকে কি ভাল দেখাইত? হাতীর যদি ঠিক ময়ূরের মত পেখম্ হয় তাহা হইলে কি তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়? আবার ময়ূরের পক্ষেও হাতীর লেজ শোভা পায় না—তেমনি তোমাদের ব্যোমকে সমীরের পোষাকে মানায় না, আবার সমীর যদি ব্যোমের পোষাক পরিয়া আসে উহাকে ঘরে ঢুকিতে দেওয়া যায় না।

সমীর কহিল, আসল কথা, বেশভূষা আচার ব্যবহারের স্খলন যেখানে শৈথিল্য, অজ্ঞতা ও জড়ত্ব সূচনা করে সেইখানেই তাহা কদর্য্য দেখিতে হয়। সেই জন্য আমাদের বাঙালীসমাজ এমন শ্রীবিহীন। লক্ষ্মীছাড়া যেমন সমাজছাড়া তেমনি বাঙালীসমাজ যেন পৃথ্বীসমাজের বাহিরে।

হিন্দুস্থানীর সেলামের মত বাঙালীর কোন সাধারণ অভিবাদন নাই। তাহার কারণ, বাঙালী কেবল ঘরের ছেলে, কেবল গ্রামের লোক; সে কেবল আপনার গৃহসম্পর্ক এবং গ্রামসম্পর্ক জানে,—সাধারণ পৃথিবীর সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই—এ জন্য অপরিচিত সমাজে সে কোন শিষ্টাচারের নিয়ম খুঁজিয়া পায় না। একজন হিন্দুস্থানী ইংরাজকেই হৌক্ আর চীনেম্যান্‌কেই হৌক্ ভদ্রতাস্থলে সকলকেই সেলাম করিতে পারে—আমরা সেস্থলে নমস্কার করিতেও পারি না, আমরা সেখানে বর্ব্বর। বাঙালী স্ত্রীলোক যথেষ্ট আবৃত নহে এবং সর্ব্বদাই অসম্বৃত—তাহার কারণ, সে ঘরেই আছে; এই জন্য ভাসুর শ্বশুর সম্পর্কীয় গৃহপ্রচলিত যে সকল কৃত্রিম লজ্জা তাহা তাহার প্রচুর পরিমাণেই আছে কিন্তু সাধারণ ভদ্রসমাজসঙ্গত লজ্জা সম্বন্ধে তাহার সম্পূর্ণ শৈথিল্য দেখা যায়। গায়ে কাপড় রাখা বা না রাখার বিষয়ে বাঙালী পুরুষদেরও অপর্য্যাপ্ত ঔদাসীন্য, চিরকাল অধিকাংশ সময় আত্মীয়সমাজে বিচরণ করিয়া এ সম্বন্ধে একটা অবহেলা তাহার মনে দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। অতএব বাঙালীর বেশভূষা চালচলনের অভাবে একটা অপরিমিত আলস্য, শৈথিল্য, স্বেচ্ছাচার ও আত্মসম্মানের অভাব প্রকাশ পায় সুতরাং তাহা যে বিশুদ্ধ বর্ব্বরতা তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমি কহিলাম—কিন্তু সে জন্য আমরা লজ্জিত নহি। যেমন রোগবিশেষে মানুষ যাহা খায় তাহাই শরীরের মধ্যে শর্করা হইয়া উঠে তেমনি আমাদের দেশের ভাল মন্দ সমস্তই আশ্চর্য্য মানসিক বিকার বশতঃ কেবল অতিমিষ্ট অহঙ্কারের বিষয়েই পরিণত হইতেছে। আমরা বলিয়া থাকি আমাদের সভ্যতা আধ্যাত্মিক সভ্যতা, অশনবসনগত সভ্যতা নহে, সেই জন্যই এই সকল জড় বিষয়ে আমাদের এত অনাসক্তি।

সমীর কহিল, উচ্চতম বিষয়ে সর্ব্বদা লক্ষ্য স্থির রাখাতে নিম্নতম

বিষয়ে যাঁহাদের বিস্মৃতি ও ঔদাসীন্য জন্মে তাঁহাদের সম্বন্ধে নিন্দার কথা কাহারও মনেও আসে না। সকল সভ্যসমাজেই এরূপ এক সম্প্রদায়ের লোক সমাজের বিরল উচ্চশিখরে বাস করিয়া থাকেন। অতীত ভারতবর্ষে অধ্যয়ন-অধ্যাপনশীল ব্রাহ্মণ এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন ;—তাঁহারা যে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ন্যায় সাজসজ্জা ও কাজ কর্ম্মে নিরত থাকিবেন এমন কেহ আশা করিত না। য়ুরোপেও সে সম্প্রদায়ের লোক ছিল এবং এখনও আছে। মধ্যযুগের আচার্য্যদের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্‌ আধুনিক য়ুরোপেও ন্যূটনের মত লোক যদি নিতান্ত হাল্‌ ফেশানের সান্ধ্যবেশ না পরিয়াও নিমন্ত্রণে যান এবং লৌকিকতার সমস্ত নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন না করেন তথাপি সমাজ তাঁহাকে শাসন করে না, উপহাস করিতেও সাহস করে না। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই স্বল্পসংখ্যক মহাত্মা লোকসমাজের মধ্যে থাকিয়াও সমাজের বাহিরে থাকেন, নতুবা তাঁহারা কাজ করিতে পারেন না এবং সমাজও তাঁহাদের নিকট হইতে সামাজিকতার ক্ষুদ্র শুল্কগুলি আদায় করিতে নিরস্ত থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে বাংলা দেশে, কেবল কতকগুলি লোক নহে, আমরা দেশসুদ্ধ সকলেই সকলপ্রকার স্বভাববৈচিত্র্য ভুলিয়া সেই সমাজাতীত আধ্যাত্মিক শিখরে অবহেলে চড়িয়া বসিয়া আছি। আমরা ঢিলা কাপড় এবং অত্যন্ত ঢিলা আদবকায়দা লইয়া দিব্য আরামে ছুটি ভোগ করিতেছি,—আমরা যেমন করিয়াই থাকি আর যেমন করিয়াই চলি তাহাতে কাহারও সমালোচনা করিবার কোন অধিকার নাই— কারণ আমরা উত্তম মধ্যম অধম সকলেই খাটো ধুতি ও ময়লা চাদর পরিয়া নির্গুণ ব্রহ্মে লয় পাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছি।

হেনকালে ব্যোম তাহার বৃহৎ লগুড়খানি হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত। তাহার বেশ অন্যদিনের অপেক্ষাও অদ্ভুত; তাহার কারণ, আজ ক্রিয়াকর্ম্মের বাড়ি বলিয়াই তাহার প্রাত্যহিক বেশের উপরে বিশেষ

করিয়া একখানা অনির্দ্দিষ্ট-আকৃতি চাপকান গোছের পদার্থ চাপাইয়া আসিয়াছে;—তাহার আশপাশ হইতে ভিতরকার অসঙ্গত কাপড়গুলার প্রান্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে;—দেখিয়া আমাদের হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল এবং দীপ্তি ও স্রোতস্বিনীর মনে যথেষ্ট অবজ্ঞার উদয় হইল।

ব্যোম জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের কি বিষয়ে আলাপ হইতেছে?

সমীর আমাদের আলোচনার কিয়দংশ সংক্ষেপে বলিয়া কহিল, আমরা দেশসুদ্ধ সকলেই বৈরাগ্যে "ভেক" ধারণ করিয়াছি।

ব্যোম কহিল, বৈরাগ্য ব্যতীত কোন বৃহৎ কর্ম্ম হইতেই পারে না। আলোকের সহিত যেমন ছায়া, কর্ম্মের সহিত তেমনি বৈরাগ্য নিয়ত সংযুক্ত হইয়া আছে। যাহার যে পরিমাণে বৈরাগ্যে অধিকার পৃথিবীতে সে সেই পরিমাণে কাজ করিতে পারে।

ক্ষিতি কহিল, সেইজন্য পৃথিবীসুদ্ধ লোক যখন সুখের প্রত্যাশায় সহস্র চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল তখন বৈরাগী ডারুয়িন্ সংসারের সহস্র চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কেবল প্রমাণ করিতেছিলেন, যে, মানুষের আদিপুরুষ বানর ছিল। এই সমাচারটি আহরণ করিতে ডারুয়িনকে অনেক বৈরাগ্য সাধন করিতে হইয়াছিল।

ব্যোম কহিল, বহুতর আসক্তি হইতে গারিবাল্ডি যদি আপনাকে স্বাধীন করিতে না পারিতেন তবে ইটালীকেও তিনি স্বাধীন করিতে পারিতেন না। যে সকল জাতি কর্ম্মিষ্ঠ জাতি তাহারাই যথার্থ বৈরাগ্য জানে। যাহারা জ্ঞান লাভের জন্য জীবন ও জীবনের সমস্ত আরাম তুচ্ছ করিয়া মেরুপ্রদেশের হিমশীতল মৃত্যুশালার তুষাররুদ্ধ কঠিন দ্বারদেশে বারম্বার আঘাত করিতে ধাবিত হইতেছে,—যাহারা ধর্ম্ম-বিতরণের জন্য নরমাংসভুক্ রাক্ষসের দেশে চিরনির্ব্বাসন বহন করিতেছে,—যাহারা মাতৃভূমির আহ্বানে মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই ধনজনযৌবনের

সুখশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দুঃসহ ক্লেশ এবং অতি নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়ে তাহারাই জানে যথার্থ বৈরাগ্য কাহাকে বলে। আর আমাদের এই কর্ম্মহীন শ্রীহীন নিশ্চেষ্ট নির্জ্জীব বৈরাগ্য কেবল অধঃপতিত জাতির মূর্চ্ছাবস্থামাত্র—উহা জড়ত্ব, উহা অহঙ্কারের বিষয় নহে।

ক্ষিতি কহিল, আমাদের এই মূর্চ্ছাবস্থাকে আমরা আধ্যাত্মিক "দশা" পাওয়ার অবস্থা মনে করিয়া নিজের প্রতি নিজে ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া বসিয়া আছি।

ব্যোম কহিল—কর্ম্মীকে কর্ম্মের কঠিন নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, সেই জন্যই সে আপন কর্ম্মের নিয়মপালনউপলক্ষ্যে সমাজের অনেক ছোট কর্ত্তব্য উপেক্ষা করিতে পারে—কিন্তু অকর্ম্মণ্যের সে অধিকার থাকিতে পারে না। যে লোক তাড়াতাড়ি আপিসে বাহির হইতেছে তাহার নিকটে সমাজ সুদীর্ঘ সুসম্পূর্ণ শিষ্টালাপ প্রত্যাশা করে না। ইংরাজ মালী যখন গায়ের কোর্ত্তা খুলিয়া হাতের আস্তিন গুটাইয়া বাগানের কাজ করে তখন তাহাকে দেখিয়া তাহার অভিজাতবংশীয়া প্রভুমহিলার লজ্জা পাইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু আমরা যখন কোন কাজ নাই কর্ম্ম নাই, দীর্ঘ দিন রাজপথপার্শ্বে নিজের গৃহদ্বারপ্রান্তে স্থূল বর্ত্তুল উদর উদ্ঘাটিত করিয়া হাঁটুর উপর কাপড় গুটাইয়া নির্ব্বোধের মত তামাক টানি, তখন বিশ্বজগতের সম্মুখে কোন্ মহৎ বৈরাগ্যের কোন্ উন্নত আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়া এই কুশ্রী বর্ব্বরতা প্রকাশ করিয়া থাকি! যে বৈরাগ্যের সঙ্গে কোন মহত্তর সচেষ্ট সাধনা সংযুক্ত নাই তাহা অসভ্যতার নামান্তর মাত্র।

ব্যোমের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া স্রোতস্বিনী আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমরা সকল ভদ্রলোকেই যতদিন না আপন ভদ্রতা রক্ষার কর্ত্তব্য সর্ব্বদা মনে রাখিয়া আপনা-

দিগকে বেশে ব্যবহারে বাসস্থানে সর্ব্বতোভাবে ভদ্র করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিব ততদিন আমরা আত্মসম্মান লাভ করিব না এবং পরের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইব না। আমরা নিজের মূল্য নিজে অত্যন্ত কমাইয়া দিয়াছি।

ক্ষিতি কহিল, সে মূল্য বাড়াইতে হইলে এদিকে বেতন বৃদ্ধি করিতে হয়, সেটা প্রভুদের হাতে।

দীপ্তি কহিল, বেতন বৃদ্ধি নহে চেতন বৃদ্ধির আবশ্যক। আমাদের দেশের ধনীরাও যে অশোভনভাবে থাকে সেটা কেবল জড়তা এবং মূঢ়তাবশতঃ, অর্থের অভাবে নহে। যাহার টাকা আছে সে মনে করে জুড়ি গাড়ি না হইলে তাহার ঐশ্বর্য্য প্রমাণ হয় না, কিন্তু তাহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, তাহা ভদ্রলোকের গোশালারও অযোগ্য। অহঙ্কারের পক্ষে যে আয়োজন আবশ্যক তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আছে কিন্তু আত্মসম্মানের জন্য, স্বাস্থ্যশোভার জন্য যাহা আবশ্যক তাহার বেলায় আমাদের টাকা কুলায় না। আমাদের মেয়েরা এ কথা মনেও করে না, যে, সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য যতটুকু অলঙ্কার আবশ্যক তাহার অধিক পরিয়া ধনগর্ব্ব প্রকাশ করিতে যাওয়া ইতরজনোচিত অভদ্রতা,—এবং সেই অহঙ্কারতৃপ্তির জন্য টাকার অভাব হয় না, কিন্তু প্রাঙ্গণপূর্ণ আবর্জ্জনা এবং শয়নগৃহভিত্তির তৈলকজ্জলময় মলিনতা মোচনের জন্য তাহাদের কিছুমাত্র সত্বরতা নাই। টাকার অভাব নহে, আমাদের দেশে যথার্থ ভদ্রতার আদর্শ এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

স্রোতস্বিনী কহিল—তাহার প্রধান কারণ, আমরা অলস। টাকা থাকিলেই বড়মানুষী করা যায়, টাকা না থাকিলেও ধার করিয়া নবাবী করা চলে, কিন্তু ভদ্র হইতে গেলে আলস্য অবহেলা বিসর্জ্জন করিতে হয়—সর্ব্বদা আপনাকে উন্নত সামাজিক আদর্শের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত রাখিতে হয়, নিয়ম স্বীকার করিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিতে হয়।

ক্ষিতি কহিল, কিন্তু আমরা মনে করি আমরা স্বভাবের শিশু—অতএব অত্যন্ত সরল!—ধুলায় কাদায় নগ্নতায়, সর্ব্বপ্রকার নিয়মহীনতায় আমাদের কোন লজ্জা নাই;—আমাদের সকলই অকৃত্রিম এবং সকলই আধ্যাত্মিক!

অপূর্ব্ব রামায়ণ।

বাড়িতে একটা শুভকার্য্য ছিল, তাই বিকালের দিকে অদূরবর্ত্তী মঞ্চের উপর হইতে বারোয়াঁ রাগিণীতে নহবৎ বাজিতেছিল। ব্যোম অনেকক্ষণ মুদ্রিত চক্ষে থাকিয়া হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিল:—

আমাদের এই সকল দেশীয় রাগিণীর মধ্যে একটা পরিব্যাপ্ত মৃত্যুশোকের ভাব আছে; সুরগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে সংসারে কিছুই স্থায়ী হয় না। সংসারে সকলি অস্থায়ী, এ কথাটা সংসারীর পক্ষে নূতন নহে, প্রিয়ও নহে, ইহা একটা অটল কঠিন সত্য; কিন্তু তবু এটা বাঁশির মুখে শুনিতে এত ভাল লাগিতেছে কেন? কারণ, বাঁশিতে জগতের এই সর্ব্বাপেক্ষা সুকঠোর সত্যটাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুমধুর করিয়া বলিতেছে —মনে হইতেছে মৃত্যুটা এই রাগিণীর মত সকরুণ বটে কিন্তু এই রাগিণীর মতই সুন্দর। জগৎ সংসারের বক্ষের উপরে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতম যে জগদ্দল পাথরটা চাপিয়া আছে এই গানের সুরে সেইটাকে কি এক মন্ত্রবলে লঘু করিয়া দিতেছে। একজনের হৃদয়কুহর হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলে যে বেদনা চীৎকার হইয়া বাজিয়া উঠিত, ক্রন্দন হইয়া ফাটিয়া পড়িত, বাঁশি তাহাই সমস্ত জগতের মুখ হইতে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়া এমন অগাধকরুণাপূর্ণ অথচ অত্যন্ত সান্ত্বনাময় রাগিণীর সৃষ্টি করিতেছে।

দীপ্তি এবং স্রোতস্বিনী আতিথ্যের কাজ সারিয়া সবেমাত্র আসিয়া

বসিয়াছিল, এমন সময় আজিকার এই মঙ্গলকার্য্যের দিনে ব্যোমের মুখে মৃত্যুসম্বন্ধীয় আলোচনায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। ব্যোম তাহাদের বিরক্তি না বুঝিতে পারিয়া অবিচলিত অম্লানমুখে বলিয়া যাইতে লাগিল। নহবৎটা বেশ লাগিতেছিল আমরা আর সে দিন বড় তর্ক করিলাম না।

ব্যোম কহিল, আজিকার এই বাঁশি শুনিতে শুনিতে একটা কথা বিশেষ করিয়া আমার মনে উদয় হইতেছে।—প্রত্যেক কবিতার মধ্যে একটি বিশেষ রস থাকে—অলঙ্কার শাস্ত্রে যাহাকে আদি করুণ শান্তি নামক ভিন্ন ভিন্ন নামে ভাগ করিয়াছে—আমার মনে হইতেছে, জগৎ-রচনাকে যদি কাব্যহিসাবে দেখা যায় তবে মৃত্যুই তাহার সেই প্রধান রস, মৃত্যুই তাহাকে যথার্থ কবিত্ব অর্পণ করিয়াছে। যদি মৃত্যু না থাকিত, জগতের যেখানকার যাহা তাহা চিরকাল সেখানেই যদি অবিকৃতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, তবে জগৎটা একটা চিরস্থায়ী সমাধিমন্দিরের মত অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত বদ্ধ হইয়া রহিত। এই অনন্ত নিশ্চলতার চিরস্থায়ী ভার বহন করা প্রাণীদের পক্ষে বড় দুরূহ হইত। মৃত্যু এই অস্তিত্বের ভীষণ ভারকে সর্ব্বদা লঘু করিয়া রাখিয়াছে, এবং জগৎকে বিচরণ করিবার অসীম ক্ষেত্র দিয়াছে। যেদিকে মৃত্যু সেই দিকেই জগতের অসীমতা। একে, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা বর্ত্তমান, তাহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রবল,—আবার তাহাই যদি চিরস্থায়ী হইত তবে তাহার একেশ্বর দৌরাত্ম্যের আর শেষ থাকিত না—তবে তাহার উপরে আর আপীল চলিত কোথায়? তবে কে নির্দ্দেশ করিয়া দিত ইহার বাহিরেও অসীমতা আছে? অনন্তের ভার এ জগৎ কেমন করিয়া বহন করিত মৃত্যু যদি সেই অনন্তকে আপনার চিরপ্রবাহে নিত্যকাল ভাসমান করিয়া না রাখিত?

সমীর কহিল, মরিতে না হইলে বাঁচিয়া থাকিবার কোন মর্য্যাদাই

থাকিত না। এখন জগৎসুদ্ধ লোক যাহাকে অবজ্ঞা করে সেও মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবনের গৌরবে গৌরবান্বিত।

ক্ষিতি কহিল, আমি সে জন্য বেশি চিন্তিত নহি; আমার মতে মৃত্যুর অভাবে কোন বিষয়ে কোথাও দাঁড়ি দিবার জো থাকিত না সেইটাই সব চেয়ে চিন্তার কারণ। সে অবস্থায় ব্যোম যদি অদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করিত কেহ জোড়হাত করিয়া এ কথা বলিতে পারিত না, যে ভাই এখন আর সময় নাই অতএব ক্ষান্ত হও। মৃত্যু না থাকিলে অবসরের অন্ত থাকিত না। এখন মানুষ নিদেন সাত আট বৎসর বয়সে অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যে কলেজের ডিগ্রি লইয়া অথবা দিব্য ফেল্ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়; তখন কোন বিশেষ বয়সে আরম্ভ করারও কারণ থাকিত না, কোন বিশেষ বয়সে শেষ করিবারও তাড়া থাকিত না। সকলপ্রকার কাজকর্ম্ম ও জীবনযাত্রার কমা, সেমি-কোলন্, দাঁড়ি একেবারেই উঠিয়া যাইত।

ব্যোম এ সকল কথায় যথেষ্ট কর্ণপাত না করিয়া নিজের চিন্তাসূত্র অনুসরণ করিয়া বলিয়া গেল:—আমাদের স্বর্গ, আমাদের পুণ্য, আমাদের অমরতা সব মৃত্যুর পারে। পৃথিবীতে বিচার নাই, মনে করি সুবিচার মৃত্যুর পরে; পৃথিবীতে প্রাণপণ বাসনা নিষ্ফল হয়, আশা করি সফলতা মৃত্যুর কল্পতরুতলে। জগতের আর সকল দিকেই কঠিন স্থূল বস্তুরাশি আমাদের মানস আদর্শকে প্রতিহত করে, জগতের যে সীমায় মৃত্যু, যেখানে সমস্ত বস্তুর অবসান, সেইখানেই আমাদের প্রিয়তম প্রবলতম বাসনার, আমাদের শুচিতম সুন্দরতম কল্পনার কোন প্রতিবন্ধক নাই। আমাদের শিব শ্মশানবাসী—আমাদের সর্ব্বোচ্চ মঙ্গলের আদর্শ মৃত্যুনিকেতনে।

মূলতান বারোয়াঁ শেষ করিয়া সূর্য্যাস্তকালের স্বর্ণাভ অন্ধকারের মধ্যে নহবতে পূরবী বাজিতে লাগিল। সমীর বলিল—মানুষ মৃত্যুর পারে

কল্পলোকে যে সকল আশা আকাঙ্ক্ষাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে, এই বাঁশির সুরে সেই সকল চিরাশ্রুসজল হৃদয়ের ধনগুলিকে পুনর্ব্বার মনুষ্যলোকে ফিরাইয়া আনিতেছে। সাহিত্য সঙ্গীত এবং সমস্ত ললিত কলা, মনুষ্যহৃদয়ের সমস্ত নিত্য পদার্থকে ইহজীবনের মাঝখানেই প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। বলিতেছে, পৃথিবীকে স্বর্গ, বাস্তবকে সুন্দর এবং এই ক্ষণিক জীবনকেই অমর জানিতে হইবে। আমাদের সমস্ত প্রেমকে পৃথিবী হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া মৃত্যুর পারে পাঠাইয়া দিব, না এই পৃথিবীতেই রাখিব ইহা লইয়াই তর্ক। বৈরাগ্যধর্ম্ম বলিতেছে, পরকালের মধ্যেই প্রকৃত প্রেমের স্থান—সাহিত্য এবং ললিতকলা বলিতেছে, ইহলোকেই আমরা তাহার স্থান দেখাইয়া দিতেছি।

ক্ষিতি কহিল, এই প্রসঙ্গে আমি এক অপূর্ব্ব রামায়ণ কথা বলিয়া সভা ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করি।

রাজা রামচন্দ্র—অর্থাৎ মানুষ—প্রীতি নামক সীতাকে নানা রাক্ষসের হাত হইতে রক্ষা করিয়া আনিয়া নিজের অযোধ্যাপুরীতে পরমসুখে বাস করিতেছিলেন। এমন সময় কতকগুলি ধর্ম্মশাস্ত্র দল বাঁধিয়া এই প্রেমের নামে কলঙ্ক রটনা করিয়া দিল। বলিল, উনি অনিত্য পদার্থের সহিত একত্র বাস করিয়াছেন উঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। বাস্তবিক অনিত্যের ঘরে রুদ্ধ থাকিয়াও এই দেবাংশজাত রাজকুমারীকে যে কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারে নাই সে কথা এখন কে প্রমাণ করিবে? এক, অগ্নি-পরীক্ষা আছে, সে ত দেখা হইয়াছে—অগ্নিতে ইহাকে নষ্ট না করিয়া আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে। তবু শাস্ত্রের কানাকানিতে অবশেষে এই রাজা প্রেমকে এক দিন মৃত্যু-তমসার তীরে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে মহাকবি এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দের আশ্রয়ে থাকিয়া এই অনাথিনী, কুশ এবং লব, কাব্য এবং ললিতকলা নামক যুগল সন্তানপ্রসব করিয়াছেন। সেই দুটি শিশুই কবির কাছে রাগিণী শিক্ষা করিয়া রাজসভায় আজ

তাহাদের পরিত্যক্তা জননীর যশোগান করিতে আসিয়াছে। এই নবীন গায়কের গানে বিরহী রাজার চিত্ত চঞ্চল এবং তাঁহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এখনও উত্তরকাণ্ড সম্পূর্ণ শেষ নাই। এখনো দেখিবার আছে জয় হয়—ত্যাগপ্রচারক প্রবীন বৈরাগ্যধর্ম্মের, না, প্রেমমঙ্গলগায়ক দুটি অমর শিশুর?

বৈজ্ঞানিক কৌতূহল।

বিজ্ঞানের আদিম উৎপত্তি এবং চরমলক্ষ্য লইয়া ব্যোম এবং ক্ষিতির মধ্যে মহা তর্ক বাধিয়া গিয়াছিল। তদুপলক্ষে ব্যোম কহিল—

যদিও আমাদের কৌতূহলবৃত্তি হইতেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি, তথাপি, আমার বিশ্বাস, আমাদের কৌতূহলটা ঠিক বিজ্ঞানের তল্লাস করিতে বাহির হয় নাই; বরঞ্চ তাহার আকাঙ্ক্ষাটা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। সে খুঁজিতে যায় পরশ পাথর, বাহির হইয়া পড়ে একটা প্রাচীন জীবের জীর্ণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ; সে চায় আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ, পায় দেশালাইয়ের বাক্স। আল্‌কিমিটাই তাহার মনোগত উদ্দেশ্য, কেমিষ্ট্রী তাহার অপ্রার্থিত সিদ্ধি; আ্যাষ্ট্রলজির জন্য সে আকাশ ঘিরিয়া জাল ফেলে কিন্তু হাতে উঠিয়া আসে আ্যাষ্ট্রনমি। সে নিয়ম খুঁজে না, সে কার্য্যকারণশৃঙ্খলের নব নব অঙ্কুরী গণনা করিতে চায় না; সে খোঁজে নিয়মের বিচ্ছেদ; সে মনে করে কোন্ সময়ে এক জায়গায় আসিয়া হঠাৎ দেখিতে পাইবে, সেখানে কার্য্যকারণের অনন্ত পুনরুক্তি নাই। সে চায় অভূতপূর্ব্ব নূতনত্ব—কিন্তু বৃদ্ধ বিজ্ঞান নিঃশব্দে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া তাহার সমস্ত নূতনকে পুরাতন করিয়া দেয়, তাহার ইন্দ্রধনুকে পরকলা-বিচ্ছুরিত বর্ণমালার পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, এবং পৃথিবীর গতিকে পক্বতাল-ফলপতনের সমশ্রেণীয় বলিয়া প্রমাণ করে।

যে নিয়ম আমাদের ধূলিকণার মধ্যে, অনন্ত আকাশ ও অনন্ত কালের সর্ব্বত্রই সেই এক নিয়ম প্রসারিত; এই আবিষ্কারটি লইয়া আমরা আজকাল আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু এই আনন্দ এই বিস্ময় মানুষের যথার্থ স্বাভাবিক নহে; সে অনন্ত আকাশে জ্যোতিষ্করাজ্যের মধ্যে যখন অনুসন্ধানদূত প্রেরণ করিয়াছিল তখন বড় আশা করিয়াছিল, যে, ঐ জ্যোতির্ম্ময় অন্ধকারময় ধামে ধূলিকণার নিয়ম নাই, সেখানে অত্যাশ্চর্য্য একটা স্বর্গীয় অনিয়মের উৎসব, কিন্তু এখন দেখিতেছে ঐ চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্র, ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল, ঐ অশ্বিনী ভরণী কৃত্তিকা আমাদের এই ধূলিকণারই জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সহোদর সহোদরা। এই নূতন তথ্যটি লইয়া আমরা যে আনন্দ প্রকাশ করি, তাহা আমাদের একটা নূতন কৃত্রিম অভ্যাস, তাহা আমাদের আদিম প্রকৃতিগত নহে।

সমীর কহিল, সে কথা বড় মিথ্যা নহে। পরশপাথর এবং আলা-দিনের প্রদীপের প্রতি প্রকৃতিস্থ মানুষমাত্রেরই একটা নিগূঢ় আকর্ষণ আছে। ছেলেবেলায় কথামালার এক গল্প পড়িয়াছিলাম যে, কোন কৃষক মরিবার সময় তাহার পুত্রকে বলিয়া গিয়াছিল, যে, অমুক ক্ষেত্রে তোমার জন্য আমি গুপ্তধন রাখিয়া গেলাম। সে বেচারা বিস্তর খুঁড়িয়া গুপ্তধন পাইল না কিন্তু প্রচুর খননের গুণে সে জমিতে এত শস্য জন্মিল যে, তাহার আর অভাব রহিল না। বালক-প্রকৃতি বালকমাত্রেরই এ গল্পটি পড়িয়া কষ্ট বোধ হইয়া থাকে। চাষ করিয়া শস্য ত পৃথিবীসুদ্ধ সকল চাষাই পাইতেছে কিন্তু গুপ্তধনটা গুপ্ত বলিয়াই পায় না; তাহা বিশ্বব্যাপী নিয়মের একটা ব্যভিচার, তাহা আকস্মিক, সেইজন্যই তাহা স্বভাবতঃ মানুষের কাছে এত বেশি প্রার্থনীয়; কথামালা যাহাই বলুন, কৃষকের পুত্র তাহার পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হয় নাই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিক নিয়মের প্রতি অবজ্ঞা মানুষের পক্ষে কত স্বাভাবিক আমরা প্রতিদিনই তাহার প্রমাণ পাই। যে ডাক্তার নিপুণ চিকিৎসার

দ্বারা অনেক রোগীর আরোগ্য করিয়া থাকেন তাঁহার সম্বন্ধে আমরা বলি লোকটার "হাতযশ" আছে; শাস্ত্রসঙ্গত চিকিৎসার নিয়মে ডাক্তার রোগ আরাম করিতেছে একথায় আমাদের আন্তরিক তৃপ্তি নাই; উহার মধ্যে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমস্বরূপ একটা রহস্য আরোপ করিয়া তবে আমরা সন্তুষ্ট থাকি।

আমি কহিলাম, তাহার কারণ এই যে, নিয়ম অনন্ত কাল ও অনন্ত দেশে প্রসারিত হইলেও তাহা সীমাবদ্ধ, সে আপন চিহ্নিত রেখা হইতে অণু-পরিনাণ ইতস্তত করিতে পারে না, সেইজন্যই তাহার নাম নিয়ম এবং সেই জন্যই মানুষের কল্পনাকে সে পীড়া দেয়। শাস্ত্রসঙ্গত চিকিৎসার কাছে আমরা অধিক আশা করিতে পারি না—এমন রোগ আছে যাহা চিকিৎসার অসাধ্য; কিন্তু এপর্য্যন্ত হাতযশ নামক একটা রহস্যময় ব্যাপারের ঠিক সীমা নির্ণয় হয় নাই; এই জন্য সে আমাদের আশাকে কল্পনাকে কোথাও কঠিন বাধা দেয় না। এই জন্যই ডাক্তারি ঔষধের চেয়ে অবধৌতিক ঔষধের আকর্ষণ অধিক। তাহার ফল যে কতদূর পর্য্যন্ত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে আমাদের প্রত্যাশা সীমাবদ্ধ নহে। মানুষের যত অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হইতে থাকে, অমোঘ নিয়মের লৌহপ্রাচীরে যতই সে আঘাত প্রাপ্ত হয়, ততই মানুষ নিজের স্বাভাবিক অনন্ত আশাকে সীমাবদ্ধ করিয়া আনে, কৌতূহলবৃত্তির স্বাভাবিক নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষা সংযত করিয়া আনে, নিয়মকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করে, এবং প্রথমে অনিচ্ছাক্রমে পরে অভ্যাসক্রমে তাহার প্রতি একটা রাজভক্তির উদ্রেক করিয়া তোলে।

ব্যোম কহিল—কিন্তু সে ভক্তি যথার্থ অন্তরের ভক্তি নহে, তাহা কাজ আদায়ের ভক্তি। যখন নিতান্ত নিশ্চয় জানা যায় যে, জগৎকার্য্য অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে বদ্ধ, তখন কাজেই পেটের দায়ে তাহার নিকট ঘাড় হেঁট করিতে হয়;—তখন বিজ্ঞানের বাহিরে অনিশ্চয়ের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে সাহস হয় না। তখন মাদুলি তাগা জলপড়া প্রভৃ-

তিকে গ্রহণ করিতে হইলে ইলেক্ট্রিসিটি, ম্যাগ্নেটিজম্, হিপ্‌নটিজ্‌ম্ প্রভৃতি বিজ্ঞানের জাল মার্কা দেখাইয়া আপনাকে ভুলাইতে হয়। আমরা নিয়ম অপেক্ষা অনিয়মকে যে ভালবাসি তাহার একটা গোড়ার কারণ আছে। আমাদের নিজের মধ্যে এক জায়গায় আমরা নিয়মের-বিচ্ছেদ দেখিতে পাই। আমাদের ইচ্ছাশক্তি সকল নিয়মের বাহিরে—সে স্বাধীন; অন্ততঃ আমরা সেইরূপ অনুভব করি। আমাদের অন্তর-প্রকৃতিগত সেই স্বাধীনতার সাদৃশ্য বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে উপলব্ধি করিতে স্বভাবতই আমাদের আনন্দ হয়। ইচ্ছার প্রতি ইচ্ছার আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল;—ইচ্ছার সহিত যে দান আমরা প্রাপ্ত হই, সে দান আমাদের কাছে অধিকতর প্রিয়; সেবা যতই পাই তাহার সহিত ইচ্ছার যোগ না থাকিলে তাহা আমাদের নিকট রুচিকর বোধ হয় না। সেই জন্য, যখন জানিতাম যে, ইন্দ্র আমাদিগকে বৃষ্টি দিতেছেন. মরুৎ আমাদিগকে বায়ু জোগাইতেছেন, অগ্নি আমাদিগকে দীপ্তি দান করিতেছেন, তখন সেই জ্ঞানের মধ্যে আমাদের একটা আন্তরিক তৃপ্তি ছিল; এখন জানি রৌদ্র-বৃষ্টিবায়ুর মধ্যে ইচ্ছা অনিচ্ছা নাই, তাহারা যোগ্য অযোগ্য প্রিয় অপ্রিয় বিচার না করিয়া নির্ব্বিকারে যথানিয়মে কাজ করে; আকাশে জলীয় অণু শীতল বায়ুসংযোগে সংহত হইলেই সাধুর পবিত্র মস্তকে বর্ষিত হইয়া সর্দ্দি উৎপাদন করিবে এবং অসাধুর কুষ্মাণ্ডমঞ্চে জলসিঞ্চন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না;—বিজ্ঞান আলোচনা করিতে করিতে ইহা আমাদের ক্রমে একরূপ সহ্য হইয়া আসে, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা আমাদের ভালই লাগে না।

আমি কহিলাম—পূর্ব্বে আমরা যেখানে স্বাধীন ইচ্ছার কর্ত্তৃত্ব অনুমান করিয়াছিলাম, এখন সেখানে নিয়মের অন্ধ শাসন দেখিতে পাই, সেই জন্য বিজ্ঞান আলোচনা করিলে জগৎকে নিরানন্দ ইচ্ছাসম্পর্কবিহীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইচ্ছা এবং আনন্দ যতক্ষণ আমার অন্তরে আছে, ততক্ষণ জগতের অন্তরতর অন্তরতম স্থানে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত না জানিলে

আমাদের অন্তরতম প্রকৃতির প্রতি ব্যভিচার করা হয়। আমাদের মধ্যে সমস্ত বিশ্বনিয়মের যে একটি ব্যতিক্রম আছে, জগতে কোথাও তাহার একটা মূল আদর্শ নাই, ইহা আমাদের অন্তরাত্মা স্বীকার করিতে চাহে না। এই জন্য আমাদের ইচ্ছা একটা বিশ্ব-ইচ্ছার, আমাদের প্রেম একটা বিশ্বপ্রেমের নিগূঢ় অপেক্ষা না রাখিয়া বাঁচিতে পারে না।

সমীর কহিল—জড় প্রকৃতির সর্ব্বত্রই নিয়মের প্রাচীর চীন দেশের প্রাচীরের অপেক্ষা দৃঢ় প্রশস্ত ও অভ্রভেদী; হঠাৎ মানব-প্রকৃতির মধ্যে একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র বাহির হইয়াছে, সেইখানে চক্ষু দিয়াই আমরা এক আশ্চর্য্য আবিষ্কার করিয়াছি, দেখিয়াছি প্রাচীরের পরপারে এক অনন্ত অনিয়ম রহিয়াছে; এই ছিদ্রপথে তাহার সহিত আমাদের যোগ;—সেইখান হইতেই সমস্ত সৌন্দর্য্য স্বাধীনতা প্রেম আনন্দ প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। সেই জন্য এই সৌন্দর্য্য ও প্রেমকে কোন বিজ্ঞানের নিয়মে বাঁধিতে পারিল না।

এমন সময়ে স্রোতস্বিনী গৃহে প্রবেশ করিয়া সমীরকে কহিল, সেদিন দীপ্তির পিয়ানো বাজাইবার স্বরলিপি বইখানা তোমরা এত করিয়া খুঁজিতেছিলে, সেটার কি দশা হইয়াছে জান?

সমীর কহিল, না।

স্রোতস্বিনী কহিল, রাত্রে ইঁদুরে তাহা কুটি কুটি করিয়া কাটিয়া পিয়ানোর তারের মধ্যে ছড়াইয়া রাখিয়াছে। এরূপ অনাবশ্যক ক্ষতি করিবার ত কোন উদ্দেশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সমীর কহিল—উক্ত ইন্দুরটি বোধ করি ইন্দুরবংশে একটি বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক। বিস্তর গবেষণায় সে বাজনার বহির সহিত বাজনার তারের একটা সম্বন্ধ অনুমান করিতে পারিয়াছে। এখন সমস্ত রাত ধরিয়া পরীক্ষা চালাইতেছে। বিচিত্র ঐক্যতানপূর্ণ সঙ্গীতের আশ্চর্য্য রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। তীক্ষ্ণ দন্তাগ্রভাগ দ্বারা বাজনার

বহির ক্রমাগত বিশ্লেষণ করিতেছে, পিয়ানোর তারের সহিত তাহাকে নানাভাবে একত্র করিয়া দেখিতেছে। এখন বাজনার বই কাটিতে সুরু করিয়াছে, ক্রমে বাজনার তার কাটিবে, কাঠ কাটিবে, বাজনাটাকে শতছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্র পথে আপন সূক্ষ্ম নাসিকা ও চঞ্চল কৌতুহল প্রবেশ করাইয়া দিবে—মাঝে হইতে সঙ্গীতও ততই উত্তরোত্তর সুদূর-পরাহত হইবে! আমার মনে এই তর্ক উদয় হইতেছে যে, ইন্দুরকুলতিলক যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে তাহাতে তার এবং কাগজের উপাদানসম্বন্ধে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে কিন্তু উক্ত কাগজের সহিত উক্ত তারের যথার্থ যে সম্বন্ধ তাহা কি শত সহস্র বৎসরেও বাহির হইবে? অবশেষে কি সংশয়পরায়ণ নব্য ইন্দুরদিগের মনে এইরূপ একটা বিতর্ক উপস্থিত হইবে না যে, কাগজ কেবল কাগজ মাত্র, এবং তার কেবল তার;—কোন জ্ঞানবান জীবকর্ত্তৃক উহাদের মধ্যে যে একটা আনন্দজনক উদ্দেশ্যবন্ধন বদ্ধ হইয়াছে তাহা কেবল প্রাচীন ইন্দুরদিগের যুক্তিহীন সংস্কার; সেই সংস্কারের কেবল একটা এই শুভফল দেখা যাইতেছে যে তাহারই প্রবর্ত্তনায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া তার এবং কাগজের আপেক্ষিক কঠিনতা সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা সম্পন্ন হইয়াছে।

কিন্তু এক এক দিন গহ্বরের গভীরতলে দন্তচালন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া মাঝে মাঝে অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবেশ করে এবং অন্তঃকরণকে ক্ষণকালের জন্য মোহাবিষ্ট করিয়া দেয়। সেটা ব্যাপারটা কি?

১২৯৯—১৩০৩।

জলপথে।

১৬ই জুন, ১৮৯১। যমুনা।—এখন পাল তুলে যমুনার মধ্যে দিয়ে চলেছি। বাঁধারে মাঠে গোরু চরচে, দক্ষিণধারে কূল দেখা যাচ্চে না। নদীর তীব্র স্রোতে তীর থেকে ক্রমাগতই ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করে মাটি খসে পড়চে। এই প্রকাণ্ড নদীর মধ্যে আমাদের বোট ছাড়া আর দ্বিতীয় একটি নৌকো দেখা যাচ্চে না; কেবলি বাতাস হুহু করচে আর জলের খলখল শব্দ শুনচি।

কাল সন্ধ্যার সময় চরের উপর বোট লাগিয়েছিলুম। নদীটি ছোট—যমুনার একটি শাখা। এক পারে জনশূন্য শাদা বালি, আর এক পারে সবুজ শস্যক্ষেত্র এবং বহুদূরে একটি গ্রাম। ক্রমে যখন অন্ধকারে গাছ-পালা কুটীর সমস্ত একাকার হয়ে এল কেবলমাত্র জলের রেখায় এবং তটের রেখায় একটা প্রভেদ দেখা যাচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল এ সমস্তই যেন ছেলেবেলার রূপকথার জগৎ। তখন এই বৈজ্ঞানিক জগৎ সম্পূর্ণ গড়ে উঠেনি; অল্পদিনমাত্র সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে; প্রদোষের অন্ধকারে এবং একটি ভীতিবিস্ময়জড়িত স্তব্ধতায় সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন; তখন সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে মায়াপুরে পরমাসুন্দরী রাজকন্যা চিরতন্দ্রায় অচেতন; তখন রাজপুত্র এবং পাত্রের পুত্র তেপান্তর মাঠে একটা অসম্ভব উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্চে। এ যেন তখনকার সেই অতি দূরবর্ত্তী অর্দ্ধচেতনায় মোহাবিষ্ট মায়ামিশ্রিত বিস্মৃত জগতের একটি নিস্তব্ধ নদীতীর। আর মনে করা যেতে পারে আমিই সেই রাজপুত্র, একটা অসম্ভবের প্রত্যাশায় সন্ধ্যারাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্চি। এই ছোটো নদীটি সেই তেরোনদীর মধ্যে একটা নদী—এখনো সাত সমুদ্র বাকি আছে; এখনো অনেক দূর,

অনেক ঘটনা, অনেক অন্বেষণ বাকি ; এখনো কত অজ্ঞাত নদীতীরে, কত অপরিচিত সমুদ্রসীমায় কত ক্ষীণচন্দ্রালোকিত অনাগত রাত্রি অপেক্ষা করে আছে ! তার পরে হয় ত অনেক ভ্রমণ, অনেক রোদন, অনেক বেদনের পর হঠাৎ একদিন আমার কথাটি ফুরোলো, নটে শাকটি মুড়োলো—হঠাৎ মনে হবে এতক্ষণ একটা গল্প চলছিল—সেই রূপকথার সুখদুঃখ নিয়ে হাস্‌ছিলুম কাঁদছিলুম—এখন গল্প ফুরিয়েছে, এখন অনেক রাত্রি, এখন ছোট ছেলের ঘুমোবার সময়।

১৯শে জুন, ১৮৯১। যমুনা।—কাল পনেরো মিনিট বাইরে বস্‌তে না বস্‌তে পশ্চিমে ঘোর মেঘ করে এল—খুব কালো, গাঢ়, আলুথালু রকমের মেঘ—তারি মাঝে মাঝে চোরা আলো পড়ে রাঙা হয়ে উঠেছে। দুটো একটা নৌকা তাড়াতাড়ি খোলা যমুনা থেকে এই ছোট নদীর মধ্যে প্রবেশ করে দড়িদড়া নোঙর দিয়ে মাটিকে আঁক্‌ড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বস্‌ল। যারা মাঠে শস্য কাট্‌তে এসেছিল তারা মাথায় এক এক বোঝা শস্য নিয়ে বাড়ির দিকে ছুটে চলেছে ; গোরুও ছুটেছে, পিছনে পিছনে লেজ নেড়ে নেড়ে বাছুর তাদের সঙ্গ রাখ্‌বার চেষ্টা করচে। খানিক বাদে একটা আক্রোশের গর্জ্জন শোনা গেল কতকগুলো ছিন্নভিন্ন মেঘ ভগ্নদূতের মত সুদূর পশ্চিম থেকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এল—তার পরে বিদ্যুৎ বজ্র ঝড় বৃষ্টি সমস্ত এক সঙ্গে এসে পড়ে খুব একটা তুর্কিনাচন নাচতে আরম্ভ করে দিলে,—বাঁশগাছগুলো হাউ হাউ শব্দে একবার পূর্ব্বে একবার পশ্চিমে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগ্‌ল,—ঝড় যেন সোঁ সোঁ শব্দে সাপুড়ের মত বাঁশি বাজাতে লাগ্‌ল আর জলের ঢেউগুলো তিন লক্ষ সাপের মত ফণা তুলে তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করে দিলে। বজ্রের শব্দ আর থামে না—আকাশের কোন্‌খানে একটা আস্ত জগৎ যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্চে।

২০শে জুন। ১৮৯১। যমুনা।—কাল সন্ধ্যার সময় নৌকো ছেড়ে দিলুম। আকাশে মেঘ ছিল না ;—চাঁদ উঠেছিল, অল্প অল্প হাওয়া

দিচ্ছিল—ঝুপ্ ঝুপ্ দাঁড় ফেলে স্রোতের মুখে ছোট নদীটির মধ্যে ভেসে যাওয়া যাচ্ছিল। তখন অন্যান্য সমস্ত নৌকো ডাঙায় কাছি বেঁধে পাল গুটিয়ে চন্দ্রালোকে স্তব্ধ হয়ে নিদ্রা দিচ্ছিল। অবশেষে ছোট নদীটা যেখানে যমুনার মধ্যে গিয়ে পড়েছে তারি কাছে একটা নিরাপদ স্থানে নৌকো বাঁধ্‌লে। এরকম স্থানে যেমন আপদ থাকে না তেমনি হাওয়াও থাকে না তাই মাঝিকে বল্লুম ওপারে চল্। ওপারে উঁচু পাড় নেই—জলে স্থলে সমান—এমন কি, ধানের ক্ষেতের উপর এক হাঁটু জল উঠেচে। মাঝি পার হয়ে নৌকো বাঁধ্‌লে। তখন পিছন-দিকের আকাশে একটু বিদ্যুৎ চিকমিক্ করতে আরম্ভ করেচে। বিছানায় ঢুকে জানালার কাছে মুখ রেখে ক্ষেতের দিকে চেয়ে আছি এমন সময় রব উঠ্‌ল—ঝড় আস্‌চে। কাছি ফেল্, নোঙর ফেল্, এ কর্ সে কর্ করতে করতেই ঝড় ছুটে এল। মাঝি থেকে থেকে বল্‌তে লাগ্‌ল, ভয় কোরো না ভাই, আল্লার নাম কর, আল্লা মালেক। বোটের দুই পাশের পরদা বাতাসে আছাড় খেয়ে খেয়ে শব্দ করতে লাগ্‌ল—বোটটা যেন একটা শিকলি-বাঁধা পাখীর মত পাখা ঝাপ্‌টে ঝট্‌পট্ ঝট্‌পট্ করছিল। ঝড়টা থেকে থেকে চীঁহি চীঁহি শব্দ করে একটা বিপর্য্যয় চীলের মত হঠাৎ এসে পড়ে বোটের ঝুঁটি ধরে ছোঁ মেরে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়—বোটটা অমনি সশব্দে ধড়ফড় করে ওঠে। হাওয়া খেতে চেয়েছিলুম হাওয়াটা কিছু বেশি খাইয়ে দিলে—যাকে বলে আশাতিরিক্ত। যেন কে ঠাট্টা করে বল্‌ছিল, হাওয়া খেয়ে নাও পরে কিঞ্চিৎ জল খাওয়াব তার পরে এমনি পেট ভরে উঠ্‌বে যে ভবিষ্যতে আর জলযোগের আবশ্যক হবে না।

২৭শে জুন। ১৮৯২। কাল বিকেলের দিকে এম্‌নি করে এল আমার ভয় হল। এমনতর রাগী চেহারার মেঘ আমি কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না। গাঢ় নীল মেঘ দিগন্তের কাছে একেবারে থাকে

থাকে ফুলে উঠেছে—একটা প্রকাণ্ড হিংস্র দৈত্যের রোষস্ফীত গোঁফ-জোড়াটার মত। এই ঘননীলের ঠিক পাশেই দিগন্তের সব শেষে ছিন্ন মেঘের ভিতর থেকে একটা টক্‌টকে রক্তবর্ণ আভা বেরচ্চে। একটা আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড অলৌকিক "বাইসন্" মোষ যেন ক্ষেপে উঠে রাঙা চোখ দুটো পাকিয়ে, ঘাড়ের নীল কেশরগুলো ফুলিয়ে বাঁকাভাবে মাথাটা নীচু করে দাঁড়িয়েচে, এখনি পৃথিবীকে শৃঙ্গাঘাত করতে আরম্ভ করে দেবে,—এবং এই আসন্ন সঙ্কটের সময় পৃথিবীর সমস্ত শস্যক্ষেত আর গাছের পাতা হী হী করচে—জলের উপরিতল শিউরে শিউরে উঠ্‌চে, কাকগুলো অশান্তভাবে কাকা করে ডাক্‌তে ডাক্‌তে বাসার দিকে উড়ে চলেছে।

২২শে জুলাই। ১৮৯২। গোরাই।—নদীর কি রোখ্! যেন লেজ-দোলানো, কেশর-ফোলানো, ঘাড়-বাঁকানো তাজা বুনো ঘোড়ার মত। এ ত তবু গোরাইনদী—এখানথেকে এখনি পদ্মায় গিয়ে পড়ব। সে মেয়ে বোধ হয় ক্ষেপে নেচে বেরিয়ে চলেছে, সে আর কিছুর মধ্যেই থাক্‌তে চায় না। মাঝি বল্‌ছিল নতুন বর্ষায় পদ্মায় খুব "ধার" হয়েছে। ধারই বটে। তীব্র স্রোত যেন চকচকে খড়্গের মত—পাৎলা ইস্পাতের মত একেবারে কেটে চলে যায়। প্রাচীন ব্রিটনবাসিদের যুদ্ধরথের চাকায় যেমন কুঠার বাধা থাক্‌ত পদ্মার দ্রুতগামী বিজয়রথের দুই চাকায় তেমনি খরধার স্রোত শাণিত কুঠারের মত বাঁধা—দুইধারের তীর একেবারে অবহেলায় ছারখার করে দিয়ে চলেচে।

৯ই ডিসেম্বর। ১৮৯২। পদ্মা।—স্রোতের মুখে বোট চল্‌চে তায় উপরে পাল পেয়েচে, দুপরবেলাকার রৌদ্রে শীতের দিনটা ঈষৎ তেতে উঠেছে। পদ্মায় নৌকো নেই, নদীর নীল এবং দূরদিগন্তের নীলিমার মাঝ-খানে বালির চরের হল্‌দে রং একটি রেখার মত আঁকা রয়েচে,—জল কেবল উত্তরে বাতাসে খুব অল্প চিক্‌চিক্ করে কাঁপচে—ঢেউ নেই। অনেক-

দিন রোগভোগের পরে শরীরটা শিথিল দুর্ব্বল অবস্থায় আছে। এই শীতশীর্ণ নদীর মত আমার সমস্ত অস্তিত্ব যেন মৃদুরৌদ্রে পড়ে অলসভাবে ঝিক্‌ঝিক্ করচে এবং আনমনে লিখে যাচ্চি। প্রতিবার কলকাতা ছাড়বার আগে ভয় হয় পদ্মা বুঝি পুরাণো হয়ে গেছে; কিন্তু যখনি বোট ভাসিয়ে দিই, চারিদিকে জল কুলকুল করে উঠে, চারিদিকে একটা দোলন কম্পন আলোক আকাশ, একটা সুকোমল নীল বিস্তৃতি, একটি সুনবীন শ্যামল বনরেখা, বর্ণনৃত্যসঙ্গীতসৌন্দর্য্যের একটি নিত্য উৎসব উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায় তখন হৃদয় আবার নতুন করে অভিভূত হয়। এই পৃথিবীর সঙ্গে কতদিনের চেনাশোনা! বহুযুগপূর্ব্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে সেদিনকার নবীন সূর্য্যকে বন্দনা করচেন তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্য্যালোক পান করেছিলুম, অন্ধজীবনের গূঢ়পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম। মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত, নবপল্লবে ডাল ছেয়ে যেত, বর্ষার মেঘের ঘননীল ছায়া আমার সমস্ত পাতাগুলিকে পরিচিত করতলের মত স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের পরিচয় অল্প অল্প মনে পড়ে। আমার বসুন্ধরা এখন "রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল" গায়ের উপর টেনে ঐ নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন, আমি তাঁর পায়ের কাছে এসে বসেচি। বহু ছেলের মা যেমন অর্দ্ধমনস্ক নিশ্চল সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃক্‌পাত করেন না তেমনি আমার পৃথিবী এই দুপরবেলায় ঐ আকাশপ্রান্তের দিকে চেয়ে বহু আদিমকালের কথা ভাবচেন—আমার দিকে তেমন লক্ষ্য করচেন না—আর আমি কেবল অবিশ্রাম বকে যাচ্চি।

১০ই অগষ্ট। ১৮৯৪। পদ্মা।—কাল খানিক রাত্রে জলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। নদীর মধ্যে হঠাৎ একটা কল্লোল এবং চঞ্চলতা উপস্থিত হয়েছে। আকস্মিক অতিথির মত কোথা থেকে বিনা এত্তেলায় একটা নূতন জলের স্রোত এসে পড়েছে। এরকম প্রায়ই মাঝে মাঝে ঘটে। হঠাৎ দেখি নদী ছল্‌ছল্‌ কল্‌কল্‌ করে জেগে উঠে তার হৃৎপিণ্ডের আক্ষেপ বেড়ে উঠেছে। বোটের তক্তার উপরে পা রাখ্‌লে স্পষ্ট বোঝা যায় তার নীচে দিয়ে কত রকমের বিচিত্র গতি অবিশ্রাম চল্‌চে—খানিকটা কাঁপচে, খানিকটা টল্‌চে, খানিকটা ফুল্‌চে, খানিকটা টান্‌চে, খানিকটা আছাড় খাবচে। ঠিক যেন আমি পৃথিবীর নাড়ি টিপে তার বেগ অনুভব করচি। রাত্রে ঘুম ভেঙে জানলার ধারে বসে রইলুম—একটা ঝাপ্‌সা আলোয় উতলা নদীকে আরো যেন পাগলের মত দেখাচ্ছিল। একটা খুব জলজ্বলে মস্ত তারার প্রতিবিম্ব দীর্ঘতর হয়ে জলের মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত একটা জ্বালাময় বিদ্ধ বেদনার মত থর্ থর্ করে কাঁপছিল। দুই নিদ্রাচ্ছন্ন তীরের মাঝখান দিয়ে একটা নিদ্রাহীন অধীরতা ভরপুর বেগে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে চলেছে। অর্দ্ধেক রাত্রে এইরকম দৃশ্যের মধ্যে জেগে বসে থাক্‌লে দিনের বেলাকার লোকসংসর্গের জগৎটা সম্পূর্ণ মিথ্যা হয়ে যায়। আবার আজ সকালে সেই গভীর রাত্রের জগৎ দূরবর্ত্তী হয়ে গেছে। মানুষের পক্ষে দুটোই সত্য অথচ দুটোই স্বতন্ত্র। দিনের জগৎটা যেন য়ুরোপীয় সঙ্গীত—সুরে বেসুরে খণ্ডে অংশে মিলে একটা প্রবহমান প্রকাণ্ড হার্ম্মনির জটলা। আর রাত্রের জগৎটা আমাদের ভারতবর্ষের সঙ্গীত—একটি বিশুদ্ধ করুণ গম্ভীর রাগিণী। দুটোই আমাদের বিচলিত করে অথচ দুটোই পরস্পরবিরোধী। কি করা যাবে! প্রকৃতির গোড়ায় যে একটা দ্বিধা আছে; রাজা এবং রাণীর মত সমস্ত বিভক্ত। দিন এবং রাত্রি, বিচিত্র এবং অখণ্ড, পরিব্যক্ত এবং অনন্ত। আমরা ভারতবর্ষের লোক রাত্রের রাজত্বে আছি, আমরা অখণ্ড

অনন্তের দ্বারা অভিভূত। আমাদের গানে শ্রোতাকে মনুষ্যের প্রতিদিনের সুখদুঃখের সীমা থেকে বাহির করে নিয়ে নিখিলের মূলে যে একটি সঙ্গীহীন বৈরাগ্যের দেশ আছে সেইখানে নিয়ে যায় – আর য়ুরোপীয় সঙ্গীত মনুষ্যের সুখদুঃখের অনন্ত উত্থান পতনের মধ্যে বিচিত্রভাবে নৃত্য করিয়ে নিয়ে চলে।

২৪শে অগষ্ট। ১৮৯৪। গোরাই।—জলের দিকে চেয়ে অনেক সময় ভাবি বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গতিকে যদি বিশুদ্ধ গতিভাবেই মনে আন্‌তে চাই তবে নদীর কাছ থেকে সেটা পাওয়া যায়। জীবজন্তু তরুলতার মধ্যে যে চলাফেরা তাতে খানিকটা গতি খানিকটা বিশ্রাম, একটা অংশের গতি আর একটা অংশের নিশ্চলতা, কিন্তু নদীর আগাগোড়াই একসঙ্গে চল্‌চে—সেই জন্যে যেন আমাদের সচেতন মনের সঙ্গে ওর একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এই ভাদ্র মাসের পদ্মাকে একটা প্রবল মানসশক্তির মত বোধ হয়—সে মনের ইচ্ছার মত ভাংচে চুরচে এবং চল্‌চে—মনের ইচ্ছার মত সে নিজেকে নানা ভঙ্গে নানা শব্দে নানা প্রকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করচে। এই একাগ্রগামিনী নদী আমাদের মনের বাসনার মত আর প্রশান্ত শস্যশালিনী ভূমি আমাদের বাসনার সামগ্রীর মত। আমি মাঝখানে বোট নিয়ে আমার বামে ইচ্ছার তীব্র বেগ ও ক্রন্দন এবং দক্ষিণে সফলতার শান্ত সৌন্দর্য্য ও মর্ম্মরধ্বনিকে বিভক্ত করে বসে আছি।

২০শে সেপ্টেম্বর। ১৮৯৬। প্লাবন।—বিলখাল নদীনালা কত রকম জলপথের মধ্য দিয়েই চলেছি তার ঠিক নেই। বড় বড় গাছ জলের মধ্যে তার গুঁড়িটি ডুবিয়ে শাখাপ্রশাখা জলের উপর অবনত করে দাঁড়িয়ে আছে। আমগাছ বটগাছের অন্ধকার ডালপালার মধ্যে নৌকা বাঁধা এবং তারি মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে গ্রামের লোকে স্নান করচে। কুঁড়েঘরের আঙিনায় জল উঠেছে; ক্ষেতে ধানের ডগাগুলো মাথা জাগিয়ে

আছে; তারি মধ্যে দিয়ে সর্‌সর্‌ শব্দে যেতে যেতে বোট হয় ত একটা জলাশয়ের মধ্যে গিয়ে পড়ে—সেখানে আর ধান নেই—কেবল শাদা শাদা নালফুল ফুটে আছে, শ্যাওলা ভাস্‌চে এবং পানকৌড়ি জলের ভিতর ডুবে ডুবে মাছ ধরচে। গোল গোল মাটির গামলার মধ্যে বসে বাঁখারি চালনা করে গ্রামের লোকে ইতস্তত যাতায়াত করচে—ডাঙাপথ একেবারেই নেই। আর একটু জল বাড়লেই ঘরের মধ্যে জল প্রবেশ করবে, তখন মাচা বেঁধে তার উপরে বাস করতে হবে; গরুগুলো দিনরাত একহাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরবে; রাজ্যের সাপ জলমগ্ন গর্ত্ত ত্যাগ করে ঘরের চালে আশ্রয় নেবে এবং যেখানকার যত গৃহহীন কীটপতঙ্গ সরীসৃপ মানুষের সহবাস গ্রহণ করবে। যখন গ্রমের চারিদিকের জঙ্গলগুলো জলে ডুবে পাতালতাগুল্মে পচ্‌তে থাকে, গোয়ালঘর ও লোকালয়ের বিবিধ আবর্জ্জনা চারিদিকে ভেসে বেড়ায়, পাট পচানির গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত, উলঙ্গ পেটমোটা পা-সরু রুগ্ন ছেলে-মেয়েরা যেখানে সেখানে জলে কাদায় মাথামাথি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে—মশার ঝাঁক স্থির জলের উপর একটি বাষ্পস্তরের মত ঝাঁক বেঁধে ভেসে বেড়ায়; গৃহস্থের মেয়েরা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মত ঘরকন্নার নিত্যকর্ম্ম করে যায় তখন সে দৃশ্য কোনোমতেই ভাল লাগে না। ঘরে ঘরে বাতে ধরচে, পা ফুল্‌চে, সর্দ্দি হচ্চে, জ্বরে ধরচে, পিলেওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদচে, কিছুতেই কেউ তাদের বাঁচাতে পারচে না—এত অবহেলা, অস্বাস্থ্য, অসৌন্দর্য্য, দারিদ্র্য, মানুষের বাসস্থানে কি এক মুহূর্ত্ত সহ্য হয়? সকল রকম শক্তির কাছেই আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। প্রকৃতি উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা উপদ্রব করে তাও সই, শাস্ত্র চিরদিন ধরে যে সকল উপদ্রব করে আস্‌চে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বল্‌তে সাহস হয় না।

২২শে সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪। বোয়ালিয়ার পথে।—আজ আকাশ এবং পৃথিবী থেকে দুর্দ্দিনের স্মৃতি একেবারে মুছে দিয়ে ভুবনভরা সোনার রৌদ্র আমার মনটার পরে বিছিয়ে পড়েছে—সেখানে আমার জীবনের সমস্ত সুখস্মৃতির দেশটি শরতের আলোতে ঝলমল করে উঠেছে। অনেকে বাংলাদেশকে সমতল বলে আপত্তি প্রকাশ করে কিন্তু সেই জন্মেই বাংলাদেশের মাঠ নদীতীর আমার এত ভাল লাগে। যখন সন্ধ্যার আলো এবং সন্ধ্যার শান্তি উপর থেকে নামতে থাকে তখন সমস্ত অনবরুদ্ধ আকাশটি একটি নীলকান্তমণির পেয়ালার মত আগাগোড়া পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌তে থাকে,—যখন শ্রান্তস্তিমিত মধ্যাহ্ন তার সমস্ত সোনার আঁচলটি বিছিয়ে দেয় তখন কোথাও সে বাধা পায় না—চেয়ে চেয়ে দেখবার এবং দেখে দেখে মনটা ভরে নেবার এমন জায়গা কি আর আছে!

৯ই জুলাই। ১৮৯৫। পাবনার পথে। ইছামতী।—পদ্মানদীর কাছে মানুষের লোকালয় তুচ্ছ কিন্তু ইছামতী মানুষ-ঘেঁসা নদী;—তার শান্ত জলপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের কর্ম্মপ্রবাহের স্রোত মিশে যাচ্চে। সে ছেলেদের মাছ ধরবার এবং মেয়েদের স্নান করবার নদী। স্নানের সময় মেয়েরা যে সমস্ত গল্পগুজব নিয়ে আসে সেগুলি এই নদীটির হাস্যময় কলধ্বনির সঙ্গে একসুরে মিলে যায়। আশ্বিনমাসে মেনকার ঘরের পার্ব্বতী যেমন কৈলাসশিখর ছেড়ে একবার তাঁর বাপের বাড়ি দেখে শুনে যান ইছামতী তেমনি সম্বৎসর অদর্শন থেকে বর্ষার কয়েকমাস আনন্দহাস্য করতে করতে তার আত্মীয় লোকালয়গুলির তত্ত্ব নিতে আসে। তার পরে ঘাটে ঘাটে মেয়েদের কাছে প্রত্যেক গ্রামের সমস্ত নূতন খবর শুনে নিয়ে, তাদের সঙ্গে মাথামাথি সখীত্ব করে আবার চলে যায়।

১০ই জুলাই। ১৮৯৫। ইছামতী।—সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আকাশ

মেঘে অন্ধকার; গুরুগুরু মেঘ ডাকচে, এবং ঝোড়ো হাওয়ায় তীরের বনঝাউগুলো দুলে উঠ্‌ছে। বাঁশঝাড়ের মধ্যে ঘন কালীর মত অন্ধকার এবং জলের উপর গোধূলির একটা বিবর্ণ ধূসর আলো পড়ে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার মত দেখ্‌তে হয়েছে। আমি ক্ষীণালোকে কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে চিঠি লিখ্‌চি—উচ্ছৃঙ্খল বাতাসে টেবিলের সমস্ত কাগজপত্র উড়িয়ে ছড়িয়ে ফেলবার উপক্রম করচে। ছোট নদীটির উপরে ঘনবর্ষার সমারোহের মধ্যে একটি চিঠি লিখ্‌তে ইচ্ছা করচে—মেঘলা গোধূলিতে নিরালা ঘরে মৃদুমন্দস্বরে গল্প করে যাবার মত চিঠি। কিন্তু এটা একটা ইচ্ছামাত্র। মনের এইরকম সহজ ইচ্ছাগুলিই বাস্তবিক দুঃসাধ্য। সেগুলি, হয় আপনি পূর্ণ হয়, নয় কিছুতে পূর্ণ হয় না—তাই অনেক সময় যুদ্ধ জমানো সহজ, গল্প জমানো সহজ নয়।

২৩শে অগষ্ট। ১৮৯৫। পদ্মা—নদীটা যেন একটা সুবৃহৎ প্রাণ-পদার্থের মত; একটা প্রবল উদ্যম বহুদূর থেকে সগর্ব্ব কলস্বরে অবহেলে চলে আস্‌চে। তাই দেখে আমাদের প্রাণের মধ্যে আত্মীয়তার স্পন্দন জেগে ওঠে। একটা দুর্দ্ধর্ষ বুনো ঘোড়াকে যদি প্রান্তরের মধ্যে উদ্দাম আনন্দে ছুট্‌তে দেখা যায় তাহলে আমাদের ভিতরকার প্রাণের উদ্যম আন্দোলিত হয়ে ওঠে। প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গভীর আনন্দ পাওয়া যায় সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা গূঢ় আত্মীয়তা অনুভব করে। এই তৃণগুল্মলতা, জলধারা, বায়ুপ্রবাহ, এই ছায়ালোকের আবর্ত্তন, জ্যোতিষ্কদলের প্রবাহ, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণীপর্য্যায় এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ি-চলাচলের যোগ রয়েছে। বিশ্বের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো; তাই এই ছন্দের যেখানেই যতি পড়চে, যেখানে ঝঙ্কার উঠ্‌চে সেইখানেই আমাদের মনের ভিতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্চে। জগতের সমস্ত অণু পরমাণু যদি আমাদের সগোত্র না হত, যদি প্রাণে ও আনন্দে অনন্ত দেশকাল স্পন্দমান হয়ে না থাকৃত তাহলে কখনই এই

বাহ্যজগতের সংস্পর্শে আমাদের অন্তরের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার হত না। যাকে আমরা জড় বলি তার সঙ্গে আমাদের যথার্থ জাতিভেদ নেই বলেই আমরা উভয়ে একজগতে স্থান পেয়েছি, নইলে আপনিই দুই স্বতন্ত্র জগৎ তৈরি হয়ে উঠ্‌ত।

ঘাটে।

৫ই মাঘ। ১৮৯১। নাগর নদীর ঘাট।—বেশ কুড়েমি করবার বেলাটা। যেন পৃথিবীতে অত্যাবশ্যক কাজ বলে কিছু নেই—যেন সময়মত নাওয়া-খাওয়াটা কলকাতার প্রচলিত একটা বহুদিনের কুসংস্কার। এখানকার চারিদিকের ভাবগতিকটা সেইরকম। একটা ছোট নদী আছে বটে কিন্তু তাতে কানাকড়ির স্রোত নেই—সে যেন আপনার শৈবালদামের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে পড়ে পড়ে ভাব্‌চে যে যদি না চল্লেও চলে তবে আর কেন! জলের মাঝে মাঝে যে সব লম্বা ঘাস এবং উদ্ভিদ জন্মেছে জেলেরা জাল ফেল্‌তে না এলে সেগুলো সমস্ত দিনের মধ্যে নাড়া পায় না। পাঁচটা ছটা বড় বড় নৌকো সারিসারি বাঁধা আছে—তার মধ্যে একটার ছাতের উপর একজন মাঝি আপাদমস্তক কাপড়ে মুড়ে রৌদ্রে পড়ে নিদ্রা দিচ্চে। আর একটার উপর একজন বসে বসে দড়ি পাকাচ্চে এবং রোদ পোহাচ্চে; দাঁড়ের কাছে একজন আধবৃদ্ধ লোক খোলাগায়ে বসে বিনা কারণে আমাদের বোটের দিকে চেয়ে আছে। ডাঙায় কেন যে ঐ একটি লোক নিজের দুটো হাঁটুকে বুকের মধ্যে আলিঙ্গন করে ধরে উঁচু হয়ে বসে আছে তার কিছুই বোঝবার জো নেই। কেবল গোটাকতক পাতিহাঁসের ওরি মধ্যে একটু ব্যস্তভাব দেখা যাচ্চে; তারা ভারি কলরব করচে এবং ক্রমাগতই উৎসাহসহকারে জলের মধ্যে মাথা ডুবচ্চে এবং তখনি মাথা তুলে নিয়ে সবলে ঝাড়া দিচ্চে। ঠিক মনে হচ্চে তারা জলের

তলাকার গূঢ়রহস্য আবিষ্কার করবার জন্য প্রতিক্ষণেই গলা বাড়িয়ে দিচ্চে এবং তার পরেই সবেগে মাথা নেড়ে বল্‌চে—"কিচ্ছু না, কিচ্ছুই না!" এখানকার দিনগুলো বারোঘণ্টা রোদ পোহায় এবং অবশিষ্ট বারোঘণ্টা একটা মোটা অন্ধকার মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নিদ্রা দেয়।

২৩শে জুন। ১৮৯১। বলেশ্বর।—আমি ভাব্‌ছিলুম আমাদের দেশের মাঠঘাট আকাশ রোদ্দুরের মধ্যে বিষাদ বৈরাগ্য কেন? তার কারণ আমার মনে হল আমাদের দেশে প্রকৃতিটাই সব চেয়ে বেশি চোখে পড়ে; আকাশ বাষ্পমুক্ত, মাঠের সীমা নেই, রৌদ্র ঝাঁঝাঁ করচে—এর মাঝখান দিয়ে মানুষ আস্‌চে যাচ্চে, এই খেয়ানৌকোর মত পারাপার হচ্চে। তাদের কলরব যেটুকু শোনা যায়, এই সংসারের হাটে তাদের সুখদুঃখচেষ্টার যেটুকু আনাগোনা দেখা যায় তা এই অনন্ত-প্রসারিত প্রকাণ্ড উদাসীন প্রকৃতির মাঝখানে কত সামান্য, কত ক্ষণস্থায়ী, কত নিষ্ফল বেদনাপূর্ণ বলেই মনে হয়! এই নিশ্চেষ্ট নিস্তব্ধ নিশ্চিন্ত নিরুদ্দেশ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটি বৃহৎ সৌন্দর্য্যপূর্ণ নির্ব্বিকার উদার শান্তি দেখ্‌তে পাওয়া যায় এবং তারি তুলনায় নিজের মধ্যে এমন একটা সতত-সচেষ্ট পীড়িত জর্জ্জর ক্ষুদ্র নিত্য নৈমিত্তিক অশান্তি চোখে পড়ে যে অতিদূর নদীতীরের ছায়াময় নীল বনরেখার দিকে চেয়ে নিতান্ত উন্মনা হয়ে যেতে হয়। যেখানে মেঘে কুয়াশায় বরফে অন্ধকারে প্রকৃতি আচ্ছন্ন সঙ্কুচিত সেখানে মানুষ আপনাকে কর্ত্তা বলে জানে, মানুষ সেখানে আপনার সকল ইচ্ছা সকল চেষ্টাকে চিরস্থায়ী মনে করে, আপনার সকল কাজকে চিহ্নিত করে রেখে দেয়, পষ্টারিটির দিকে তাকায়, কীর্ত্তিস্তম্ভ তৈরি করে, জীবনচরিত লেখে এবং মৃতদেহের উপরেও পাষাণের চির-স্মরণ গৃহ নির্ম্মাণ করে—তার পরে অনেক চিহ্ন ভেঙে যায় এবং অনেক নাম বিস্মৃত হয়, সময়াভাবে সেটা কারো খেয়ালেই আসে না।

২রা কার্ত্তিক। ১৮৯১। শিলাইদহের ঘাট।—এই পাড়াগাঁয়ে এলে

মানুষকে ঠিক স্বতন্ত্র মানুষভাবে দেখা যায় না। মনে হয় যেমন নানাদেশ দিয়ে নদী চলেচে মানুষের স্রোতও তেমনি গাছপালা গ্রামনগরের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে চিরকাল ধরে চলেছে, এ আর ফুরোয় না। মেন্ মে কাম্ এণ্ড্ মেন্ মে গো, বাট্ আই গো অন্ ফর্ এভার—কথাটা সঙ্গত নয়। মানুষও নানা শাখায় প্রশাখায় নদীর মতই চলেছে—একপ্রান্ত জন্মশিখরে আর একপ্রান্ত মরণসমুদ্রে,—দুই রহস্যের মাঝখানে বিচিত্রলীলা এবং কর্ম্ম এবং কলধ্বনি—কোনো কালেই এর আর শেষ নেই। ওই শোন, মাঠে চাষা গান গাচ্চে, জেলেডিঙি ভেসে চলেচে, বেলা যাচ্চে, রৌদ্র ক্রমেই বেড়ে উঠচে, ঘাটে কেউ স্নান করচে, কেউ জল নিয়ে যাচ্চে—এমনি করে এই শান্তিময়ী নদীর দুইতীরে গ্রামের মধ্যে গাছের ছায়ায় শত শত বৎসর তার গুন্ গুন্ ধ্বনি তুলে চলেচে—এবং সকলের মধ্যে থেকেই ঐ কথাটা জেগে উঠ্‌চে—আই গো অন্ ফর্ এভার। দুপুর বেলার নিস্তব্ধতার মধ্যে রাখাল দূর থেকে উর্দ্ধকণ্ঠে তার সঙ্গীকে ডাক দেয় এবং নৌকা ছপ্‌ছপ্ শব্দ করে ঘরের দিকে ফিরে যায়; মেয়েরা ঘড়া দিয়ে জল ঠেলে দেয়, জল ছল্‌ছল্ করে ওঠে, তার সঙ্গে জেগে ওঠে মধ্যাহ্নের নানা অনির্দ্দিষ্ট শব্দ—পাখীর ডাক, মৌমাছির গুঞ্জন, বাতাসে বোটটা বেঁকে যেতে থাকে তারি কাতর সুর, সব জড়িয়ে এমন একটা করুণ ঘুমপাড়ানি গান,—যেন মা সমস্ত বেলা বসে বসে তার ব্যথিত ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে ভুলিয়ে রাখ্‌তে চেষ্টা করচে—বল্‌চে, আর ভাবিস্‌নে, আর কাঁদিস্‌নে, আর কাড়াকাড়ি মারামারি করিস্‌নে, আর তর্কবিতর্ক রাখ্,—একটুখানি ভুলে থাক্, একটুখানি ঘুমো;—বলে তপ্ত কপালে আস্তে আস্তে করাঘাত করচে।

৯ই জানুয়ারি। ১৮৯২। শিলাইদহের ঘাট। আজ পূর্ণিমা রাত। ঠিক আমার বাঁ-দিকের খোলা জানলার উপরেই একটা মস্ত চাঁদ উঠে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে—দেখ্‌ছে আমি চিঠিতে তার সম্বন্ধে

কোন চর্চ্চা করচি কিনা—সে হয়ত মনে করে তার আলোর চেয়ে তার কলঙ্কের কথা নিয়েই নিন্দুক পৃথিবীর লোকে বেশি কানাকানি করে। নিস্তব্ধ চরে একটি টিটি পাখী ডাক্‌চে—নদী স্থির—কোথাও নৌকা নেই—জলের উপর স্থির ছায়া ফেলে ওপারের ঘন বন স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে—ঘুমন্ত চোখ খোলা থাক্‌লে যেমন দেখ্‌তে হয় এই প্রকাণ্ড পূর্ণিমার আকাশ তেম্‌নি ঈষৎ ঝাপসা দেখাচ্চে। কাল সন্ধ্যা থেকে আবার ক্রমে ক্রমে অন্ধকারের দখল বেড়ে যেতে থাক্‌বে—কাল কাজ সেরে এই ছোট নদীটি পার হবার সময় দেখ্‌তে পাব আমার সঙ্গে আমার এই প্রবাসের প্রণয়িনীর একটুখানি বিচ্ছেদ হয়েচে; কাল যে আমার কাছে আপনার রহস্যময় অপার হৃদয় উদ্ঘাটন করে দিয়েছিল আজ তার মনে যেন একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে, যেন তার মনে হচ্চে একেবারে অতখানি আত্ম-প্রকাশ কি ভাল হয়েছিল—তাই হৃদয়কে আবার একটু একটু করে সঙ্কুচিত করে নিচ্চে।

কিন্তু আজ পূর্ণিমা, এবৎসরকার বসন্তারম্ভের এই প্রথম পূর্ণিমা। এর কথাটা লিখে রেখে দিলুম—হয়ত অনেকদিন পরে এই নিস্তব্ধ রাত্রিটি মনে পড়বে—ঐ টিটি পাখীর ডাকসুদ্ধ—এবং ওপারে ঐ বাঁধানৌকায় যে আলোটি জ্বল্‌চে সেটি সুদ্ধ—এই একটুখানি উজ্জ্বল নদীর রেখা, ঐ একটু-খানি অন্ধকার বনের একটা পোঁচ—এবং ঐ নির্লিপ্ত উদাসীন পাণ্ডুবর্ণ আকাশ।

২রা আষাঢ়। ১৮৯২। শিলাইদহ ঘাট।—কাল আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে রীতিমত আয়োজনের সঙ্গে বর্ষার নব রাজ্যাভিষেক সুসম্পন্ন হয়ে গেল। কাল ভাব্‌লুম বর্ষার প্রথম দিনটা, আজ বরঞ্চ ভেজাও ভাল তবু ঘরে বদ্ধ হয়ে থাকব না। জীবনে '৯৯ শাল আর দ্বিতীয়বার আস্‌বে না। পরমায়ুর মধ্যে আষাঢ়ের প্রথম দিন আর ক'বারই বা আস্‌বে! সবগুলো কুড়িয়ে যদি আরো ত্রিশটা দিনও হয় ত সে বড় কর্ম নয়। মাঝে মাঝে

ভাবি এই যে আমার জীবনে প্রত্যহ একটি একটি করে দিন আস্‌চে,—কোনোটি সূর্য্যের উদয়াস্তচ্ছটায় রাঙা, কোনোটি ঘনঘোর মেঘে স্নিগ্ধ নীল, কোনোটি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় শাদা ফুলের মত প্রফুল্ল, এগুলি কি আমার কম সৌভাগ্য! হাজার বছর পূর্ব্বে কালিদাস সেই যে আষাঢ়ের প্রথম দিনটিকে অভ্যর্থনা করেছিলেন এবং প্রকৃতির সেই রাজসভায় বসে অমর ছন্দে মানুষের চিরন্তন বিরহসঙ্গীত গেয়েছিলেন আমার জীবনেও প্রতিবৎসরে সেই আষাঢ়ের প্রথম দিন তার সমস্ত আকাশ-জোড়া ঐশ্বর্য্য নিয়ে উদয় হয়—সেই প্রাচীন উজ্জয়িনীর প্রাচীন কবির—সেই বহু বহু-কালের সুখ দুঃখ বিরহ মিলনে জড়িত নবনারীদের আষাঢ়স্য প্রথম দিবসঃ। সেই অতি পুরাতন আষাঢ়ের প্রথম মহাদিন আমার জীবনের ভাগে প্রতি বৎসর একটি একটি করে কমে আসচে, অবশেষে একদিন আস্‌বে যখন কালিদাসের মন্দাক্রান্তা ছন্দ দিয়ে চিহ্নিত এই দিনটি আমার আর একটিও বাকি থাকবে না। একথা ভাব্‌লে পৃথিবীর দিকে আবার ভাল করে চেয়ে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে—ইচ্ছা করে জীবনের প্রত্যেক সূর্য্যোদয়কে সজ্ঞানভাবে অভিবাদন করি, এবং প্রত্যেক সূর্য্যাস্তকে পরিচিত বন্ধুর মত বিদায় দিই। যদি সাধুপ্রকৃতির লোক হতুম তাহলে হয়ত মনে করতুম জীবনটা নশ্বর অতএব প্রতিদিন বৃথা নষ্ট না করে নামজপে যাপন করি—কিন্তু স্বভাবটা ত সেরকম নয়, তাই থেকে থেকে মনে হয় এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্চে এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারচি নে। এই রং, এই আলো ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোক ভূলোকের মাঝখানে সমস্ত শূন্যপরিপূর্ণ-করা শান্তি এবং সৌন্দর্য্য,—এর জন্যে কি অসীম আয়োজনটাই চল্‌চে! কতবড় উৎসবের ক্ষেত্রটা! এমন আশ্চর্য্যকাণ্ড প্রতিদিন আমাদের বাইরে হয়ে যাচ্চে আর আমাদের ভিতরে তার কোনো অভ্যর্থনা নেই। আমরা আমাদের চারিদিক থেকে এত তফাতে থাকি! লক্ষ লক্ষ

যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না—সে যেন আরো লক্ষ যোজন দূরে! রঙীন সকাল এবং রঙীন্ সন্ধ্যাগুলি দিগ্বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার থেকে এক একমুঠো মাণিকের মত সমুদ্রের জলে খসে খসে পড়ে যাচ্চে আমাদের মনের মধ্যে একটিও এসে পড়ে না! পৃথিবীতে এসে পড়েচি এখানকার মানুষগুলো অদ্ভুত জীব—এরা কেবলই দিনরাত্রি নিয়ম এবং দেয়াল গেঁথে তুল্‌চে, পাছে সহজেই দুটো চোখে কিছু দেখ্‌তে পায় এই ভয়ে বহুযত্নে পর্দ্দা-টাঙিয়ে দিচ্চে। এরা চাঁদের নীচে চাঁদোয়া খাটাতে পারলে তবে খুসি হয়।

৩রা ভাদ্র। ১৮৯২। শিলাইদহ ঘাট।—শরতের প্রভাত চোখের উপর সুধাবর্ষণ করচে। এই ভরা নদীর ধারে, বর্ষার ধারায় প্রফুল্ল সরস পৃথিবীর উপরে শরতের সোনালি আলো দেখে মনে হয় যেন আমাদের এই নবযৌবনা ধরণীসুন্দরীর সঙ্গে কোন্ এক জ্যোতির্ম্ময় দেবতার ভাল-বাসা চল্‌চে—তাই আলো আর এই বাতাস, এই অর্দ্ধউদাস অর্দ্ধসুখের ভাব—গাছের পাতা এবং ধানের ক্ষেতের মধ্যে এই অবিশ্রাম স্পন্দন, জলের মধ্যে এমন অগাধ পরিপূর্ণতা, স্থলের মধ্যে এমন শ্যামশ্রী, আকাশে এমন নির্ম্মল নীলিমা। চারদিক থেকে আকাশ আলো বাতাস আমার সমস্ত মনটাকে যেন তুলিতে করে তুলে নিয়ে এই রঙীন শরৎ প্রকৃতির উপর আর এক পোঁচ রঙের মত মাখিয়ে দিচ্ছে—তাতে করে এই সমস্ত নীল সবুজ এবং সোনার উপর আরো একটা যেন নেশার রং লেগে যাচ্চে।

২২শে জুন। ১৮৯২। শিলাইদহ।—আজ ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুন্‌ছিলুম ঘাটে মেয়েরা উলু দিচ্চে—শুনে মনটা একটু যেন বিকল হয়ে গেল। বোধ হয় তার কারণটা এই;—এই রকমের একটা আনন্দ-ধ্বনিতে হঠাৎ অনুভব করা যায় পৃথিবীতে একটা কর্ম্মপ্রবাহ চল্‌চে যার

অধিকাংশের সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই; অধিকাংশ মানুষ আমার আপন নয়—তাদের সঙ্গে সেই বিচ্ছেদটা কি বৃহৎ বিচ্ছেদ! অথচ তাদের কাজকর্ম্ম সুখদুঃখ আনন্দ উৎসব চল্‌চে! কি বৃহৎ পৃথিবী! কি বিপুল মানবসংসার! কত দূর থেকে জীবনযাত্রার কলধ্বনি প্রবাহিত হয়ে আসে, কত অপরিচিত ঘরের একটুখানি বার্ত্তা পাওয়া যায়! এমনি করে যখন বুঝ্‌তে পারি অধিকাংশ জগৎই আমার অজ্ঞাত অজ্ঞেয় অনাত্মীয় তখন এই প্রকাণ্ড ঢিলে জগতের মধ্যে নিজেকে কেমন একরকম প্রান্তবর্ত্তী বলে মনে হয়, তখন মনের মধ্যে এই রকমের ব্যাপ্ত বিষাদের উদয় হতে থাকে।

জুলাই। ১৮৯৩। শিলাইদহ।—কাল সমস্ত রাত তীব্র বাতাস পথের কুকুরের মত মাঠে মাঠে কেঁদে কেঁদে বেড়িয়েছিল—বৃষ্টিও অবিশ্রাম চল্‌চে। মাঠের জল ছোট ছোট ঝরনা বেয়ে নানাদিক থেকে কল্‌কল্‌ করে নদীতে এসে পড়চে। চাষারা ওপারের চরে থেকে ধান কেটে আনবার জন্যে কেউবা টোগা মাথায় কেউবা একখানা কচুপাতা মাথার উপর ধরে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে খেয়া নৌকায় পার হচ্চে। বড় বড় বোঝাই নৌকার মাথার উপর মাঝি হাল ধরে বসে বসে ভিজ্‌চে—মাল্লারা গুণ কাঁধে করে ডাঙার উপর দিয়ে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে চলেচে। এমন দুর্য্যোগ তবু পৃথিবীর কাজকর্ম্ম বন্ধ থাকবার জো নেই,—পাখীরা বিমর্ষ মনে তাদের নীড়ের মধ্যে বসে আছে কিন্তু মানুষের ছেলেরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েচে। বোটের সামনেই দুটি রাখাল বালক একপাল গোরু নিয়ে চরাচ্চে। গোরুগুলি কচরমচর করে এই বর্ষাসতেজ সরসসিক্ত ঘাসগুলির মধ্যে মুখ ভরে দিয়ে ল্যাজ নেড়ে পিঠের মাছি তাড়াতে তাড়াতে স্নিগ্ধ-শান্তনেত্রে আহার করে করে বেড়াচ্চে; তাদের পিঠের উপর বৃষ্টি এবং রাখাল বালকের যষ্টি অবিশ্রাম পড়চে; দুইই তাদের পক্ষে সমান অকারণ, অন্যায়, অনাবশ্যক; এবং দুইই তারা সহিষ্ণুভাবে বিনাবিচারে সয়ে যাচ্ছে এবং কচর্‌মচর্‌ করে ঘাস খাচ্চে। এই গোরুগুলির চোখের দৃষ্টি কেমন

শান্ত সুগম্ভীর স্নেহপূর্ণ—মাঝের থেকে মানুষের কর্ম্মের বোঝা এই বড় বড় জন্তুগুলোর ঘাড়ের উপর কেন পড়ল? নদীর জল প্রতিদিন বেড়ে উঠ্‌চে। ডাঙা এবং জল দুই লাজুক প্রণয়ীর মত অল্প অল্প করে পরস্পরের কাছে অগ্রসর হচ্চে—লজ্জার সীমা উপ্‌চে এল বলে—প্রায় গলাগলি হয়ে এসেচে।

জুলাই। ১৮৯৩। শিলাইদহ।—আজ সকালে অল্প অল্প রৌদ্রের আভাস দিচ্চে—কাল বিকেল থেকে বৃষ্টি ধরে গেছে। আকাশের ধারে ধারে স্তরে স্তরে মেঘ জমে আছে—ঠিক যেন মেঘের কালো ফরাসটা সমস্ত আকাশ থেকে গুটিয়ে নিয়ে এক প্রান্তে পাকিয়ে জড় করা হয়েছে; এখনি একটা ব্যস্তবাগীশ বাতাস এসে আবার সমস্ত আকাশময় বিছিয়ে দিয়ে যাবে তখন নীলাকাশ ও সোনালি রৌদ্রের কোনো চিহ্ন দেখা যাবে না।

১৮ই মার্চ। ১৮৯৪। নাগর নদীর ঘাট।—জ্যোৎস্না প্রতি রাত্রেই অল্প অল্প করে ফুটে উঠ্‌চে। নদীর এ পারের মাঠে কোথাও কোনো সীমাচিহ্ন নেই—গাছ পালা নেই, চষামাঠে একটি ঘাসও নেই। জলের সমুদ্রে অবিশ্রাম গতি ও শব্দ আছে—এই মাটির সমুদ্রে কেবল একটা নিঃশব্দ শূন্যতা; চষার মধ্যে একপ্রান্তে আমি চল্‌চি আর আমার পায়ের কাছে একটি ছায়া চলে বেড়াচ্চে। এমন একটা বিস্তীর্ণ প্রাণহীনতার উপর যখন অস্পষ্ট চাঁদের আলো এসে পড়ে তখন যেন একটি বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদশোকের ভাব মনে আসে; যেন একটি মরুময় বৃহৎ গোরের উপর একটি শাদাকাপড়পরা মেয়ে উপুড় হয়ে মুখ ঢেকে মূর্চ্ছিতপ্রায় নিস্তব্ধ পড়ে আছে।

২৮শে মার্চ। ১৮৯৪। নাগর নদী।—মানুষের মনখানাও এই প্রকাণ্ড প্রকৃতির মত রহস্যময়, তার চারিদিকে শিরা উপশিরা স্নায়ু মস্তিষ্ক মজ্জার মধ্যে কি অবিশ্রাম উদ্যোগ চল্‌চে! হুহুঃ শব্দে রক্তস্রোত ছুটেছে,

স্নায়ুগুলো কাঁপচে, হৃৎপিণ্ড উঠ্‌চে পড়চে, আর এই রহস্যময়ী মানব-প্রকৃতির মধ্যে ঋতুপরিবর্ত্তন হচ্চে। কোথা থেকে কখন্ কি হাওয়া আসে আমরা কিছুই জানি নে;—আজ মনে করা গেল জীবনটি দিব্যি চালাতে পারব, বেশ বল মজুত আছে, সংসারের বিঘ্নবিপদগুলো অনায়াসে ডিঙিয়ে চলে যাব—এই ভেবে সমস্ত জীবনের প্রোগ্রামটি ছাপিয়ে এনে শক্ত করে বাঁধিয়ে পকেটে রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি হেনকালে কাল দেখি কোন্ অজানা রসাতল থেকে হঠাৎ উল্টো হাওয়া উঠেছে, আকাশের ভাবগতিক বদ্‌লে গেছে, তখন কিছুতেই মনে হয় না এ দুর্য্যোগ কোনোকালে কাটিয়ে উঠ্‌ব। এ সবের উৎপত্তি কোন্‌খানে! কোন্ শিরার মধ্যে স্নায়ুর মধ্যে কি নড়চড় হয়ে গেল যাতে করে এক নিমেষে সমস্ত বলবুদ্ধির মধ্যে সামাল্ সামাল্ রব উঠে যায়! বুকের ভিতর কি হয়, শিরার মধ্যে কি চল্‌চে, মস্তিষ্কের মধ্যে কি নড়চে, কত কি অসংখ্য কাণ্ড আমাকে অবিশ্রাম আচ্ছন্ন করে ঘট্‌চে,—আমি দেখ্‌তেও পাচ্চিনে, আমার সঙ্গে পরামর্শও করচে না—অথচ সবসুদ্ধ নিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আমি বল্‌চি আমি একজন আমি! আমি ত ভেবে চিন্তে অন্তত এটুকু ঠিক করেছি যে আমি নিজেকে কিছুই জানিনে। আমি একটা সজীব পিয়ানো যন্ত্রের মত—ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে অনেকগুলো তার এবং কলবল—কখন্ কে এসে যে বাজায় কিছুই জানিনে, কেন বাজে তাও সম্পূর্ণ বোঝা শক্ত—কেবল বাজে কি সেইটেই জানি; সুখ বাজে কি ব্যথা বাজে, কড়ি বাজে কি কোমল বাজে, তালে বাজে কি বেতালে বাজে এইটুকুই বুঝতে পারি। আর জানি আমার স্বরসপ্তকে তার নীচের দিকেই বা কতদূর গেছে আর উপরের দিকেই বা কতদূর! না—তাও কি ঠিক জানি!

৩০শে মার্চ্চ। ১৮৯৪। নাগর নদীর ঘাট।—সন্ধের সময় একলা বসে বসে টেবিলের বাতির দিকে দৃষ্টি আটক্ করে মনে করি জীবনটাকে

বীরপুরুষের মত অবিচলিত ভাবে, নীরবে বিনা অভিযোগে বহন করব— সেই কল্পনায় মনটা উপস্থিতমত অনেকখানি স্ফীত হয়ে ওঠে এবং নিজেকে হাতে হাতেই একজন অবতার বিশেষ বলে ভ্রম হয়। তার পরে পথ চল্‌তে পায়ে যেই কুশের কাঁটাটি ফোটে অমনি যখন লাফিয়ে উঠি তখন ভবিষ্যতের পক্ষে সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু যুক্তিটা বোধ হয় ঠিক নয়। বোধ হয় কুশের কাঁটাতেই বেশি অস্থির করে। আমাদের মনের ভিতরে একটা গোছালো গিন্নিপনা আছে; সে দ্‌রকার বুঝে ব্যয় করে, সামান্য কারণে তহবিলে টান দেয় না। বড় বড় সংকট এবং চরম আত্মোৎসর্গের জন্য সে আপনার সমস্ত বল কৃপণের মত সযত্নে সঞ্চয় করে রাখে। ছোট ছোট বেদনায় হাজার কান্নাকাটি করলেও তার রীতিমত সাহায্য পাওয়া যায় না। কিন্তু দুঃখ যেখানে গভীর সেখানে তার আলস্য নেই। এই জন্যে জীবনে এই স্বতোবিরোধ প্রায় দেখা যায় যে বড় দুঃখের চেয়ে ছোট দুঃখ বেশি দুঃখকর। বড় দুঃখে হৃদয়ের যেখানটা বিদীর্ণ হয়ে যায় সেইখান থেকেই একটা সান্ত্বনার উৎস উঠ্‌তে থাকে, মনের সমস্ত দল বল সমস্ত ধৈর্য্য এক হয়ে সেইখানে এসে হাজির হয়, তখন দুঃখের মাহাত্ম্যের দ্বারাই দুঃখ সহ্য কর্‌বার বল বেড়ে যায়। ছোট দুঃখের কাছে আমরা কাপুরুষ কিন্তু বড় দুঃখ আমাদের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলে; সেইজন্যই তার মধ্যে একটা সুখ আছে—নিজেকে পূরাপূরি পাই বলেই সেই সুখ।

২৮শে জুন। ১৮৯৪। শিলাইদহের ঘাট।—আমি একদিন বোটে বসে ভাবছিলুম, মানুষ ভারাক্রান্ত; তার এমন কোনো আবশ্যক জিনিষ নেই যার ভার নেই। এমন কি, মনের ভাব প্রকাশ করে বই লিখেছে তাও পার্শেল পোষ্টে পাঠিয়ে মাশুল দিতে প্রাণ বেরিয়ে যায়; কাপড় চোপড় অশন আসন প্রভৃতি তার সমস্ত জিনিষই শত শত মুটের বোঝা। এই জন্যে এই সকল ভার রক্ষা করেও কি করে ভার লাঘব করা যেতে

পারে মানুষের এই এক প্রধান চেষ্টা। গাড়ির চাকা একটা মস্ত উপায়—সে আমাদের অনেক বস্তুভারকে সহজ করে দিয়েছে। জলের উপর নৌকা এক মস্ত উপায় বেরিয়েছে—এই ফিকিরে ডাঙার ভার অনায়াসে জলের ঘাড়ে চাপিয়ে দেশ বিদেশে নিয়ে যাওয়া যায়। আমাদের শাস্ত্র সমাজ প্রভৃতিও সেই রকম ভার-লাঘবের উপায়। অভাব বিচ্ছেদ মৃত্যু ও অর্জ্জন রক্ষণের চেষ্টা মানুষকে দুঃখভারে আক্রান্ত করবেই, এইজন্য মানুষ আপনার শাস্ত্রমত, আপনার সমাজ এমন করে গড়বার চেষ্টা করচে যাতে সেই সমস্ত ভারকে যথাসম্ভব হাল্কা করে আনে। ভার যদি নিজেরই কাঁধে রাখি তাহলে দুঃসহ হয় কিন্তু যদি সমাজের উপর চারিয়ে দিই তাহলেই সে হাল্কা হয়। বড় বড় আইডিয়ার গুণ হচ্চে বড় নদীর মত তার একটা ভারবহনের ও ভারচালনের শক্তি আছে; সেই জন্যে দেশহিত সমাজহিত ও ধর্ম্মের নাম করে আমরা অসাধ্যসাধন করতে পারি—তারা নিয়ত আমাদের ভারহরণ শ্রান্তিহরণ করে।—

৫ই আগষ্ট। ১৮৯৪। শিলাইদহ।—কাল সমস্ত রাত্রি অজস্র ধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে। আজ যখন ভোরে উঠ্‌লুম তখনো বৃষ্টি চল্‌চে এবং চারিদিক ম্লান। এইমাত্র স্নান করে উঠে দেখি পশ্চিমদিকে আউষধানের ক্ষেতের উপর জলভারে অবনত কালোমেঘ স্তূপে স্তূপে স্তরে স্তরে জমে রয়েছে এবং পূর্ব্বদক্ষিণদিকে মেঘ খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে রৌদ্র ওঠ্‌বার চেষ্টা হচ্চে; রৌদ্রে-বৃষ্টিতে খানিকক্ষণের জন্যে যেন সন্ধি হয়েছে। যেদিকে ছিন্নমেঘের ভিতর দিয়ে সকাল বেলাকার আলো বিচ্ছুরিত হয়ে বেরিয়ে আস্‌চে সেদিকে অপার পদ্মাদৃশ্যটি আশ্চর্য্য। জলের রহস্যগর্ভ থেকে একটি স্নানশুভ্র অলৌকিক জ্যোতিঃপ্রতিমা উদিত হয়ে নিঃশব্দ মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে—আর ডাঙার উপরে কালোমেঘ স্ফীতকেশর সিংহের মত ভ্রূকুটি করে ধানক্ষেতের মাথার কাছে থাবা মেলে দিয়ে চুপ করে বসে আছে;—জন্তুটা যেন একটি সুন্দরী দিব্যশক্তির কাছে হার মেনেছে

কিন্তু এখনো পোষ মানেনি—দিগন্তের একটা কোণে নিজের সমস্ত রাগ এবং অভিমান গুটিয়ে নিয়ে বসে আছে। এখনি আবার বৃষ্টি হবে তার লক্ষণ দেখা যাচ্চে—রীতিমত শ্রাবণের বর্ষণ;—সুপ্তোত্থিত সহাস্য জ্যোতীরশ্মি যে মুক্তদ্বারের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই দ্বারটি আবার আস্তে আস্তে রুদ্ধ হয়ে যাচ্চে, পদ্মার ঘোলা জলরাশি ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে; নদীর একতীর থেকে আর একতীর মেঘের সঙ্গে মেঘ আবদ্ধ হয়ে সমস্ত আকাশ অধিকার করে নিয়েছে—খুব নিবিড় আয়োজন।—

১৮ই ফেব্রুয়ারি। ১৮৯৫। শিলাইদহ। অদৃষ্টের পরিহাসবশতঃ, ফাল্গুনের এক মধ্যাহ্নে এই নির্জ্জন অবসরে এই নিস্তরঙ্গ পদ্মার উপরে এই নিভৃত নৌকার মধ্যে বসে, সমুখে সোনার রৌদ্র এবং সুনীল আকাশ নিয়ে আমাকে একখানা বই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হতে হচ্চে। সে বইও কেউ পড়বে না সে সমালোচনাও কেউ মনে রাখ্‌বে না মাঝের থেকে এমন দিনটা মাটি করতে হবে। জীবনে এমন দিন কটাই বা আসে! অধিকাংশ দিনই ভাঙাচোরা জোড়াতাড়া; আজকের দিনটি যেন নদীর উপরে সোনার পদ্মফুলের মত ফুটে উঠেচে, আমার মনটিকে তার মর্ম্ম-কোষের মধ্যে টেনে নিচ্চে। আবার হয়েচে কি, একটা হল্‌দে-কোমর-বন্ধ্‌-পরা স্নিগ্ধনীলরঙের মস্ত ভ্রমর আমার বোটের চারদিকে গুঞ্জন-সহকারে চঞ্চল হয়ে বেড়াচ্চে। বসন্তকালে ভ্রমরগুঞ্জনে বিরহিণীর বিরহবেদনা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এ কথাটাকে আমি বরাবর পরিহাস করে এসেছি, কিন্তু ভ্রমরগুঞ্জনের মর্ম্মটা আমি একদিন দুপরবেলা বোল-পুরে প্রথম আবিষ্কার করেছিলুম। সেদিন নিষ্কর্ম্মার মত দক্ষিণের বারান্দায় বেড়াচ্ছিলুম—মধ্যাহ্নটা মাঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল, গাছের নিবিড় পল্লবগুলির মধ্যে স্তব্ধতা যেন রাশীকৃত হয়ে উঠেছিল। সেই সময়টায় বারান্দার নিকটবর্ত্তী একটা মুকুলিত নিমগাছের কাছে ভ্রমরের অলসগুঞ্জন

সমস্ত উদাস মধ্যাহ্নের একটা সুর বেঁধে দিচ্ছিল। সেইদিন বেশ বোঝা গেল মধ্যাহ্নের সমস্ত পাঁচমিশালি শ্রান্তসুরের মূল সুরটা হচ্চে ঐ ভ্রমরের গুঞ্জন—তাতে বিরহিণীর মনটা যে হঠাৎ হাহা করে উঠ্‌বে তাতে আশ্চর্য্য কিছুই নেই। আসল কথাটা হচ্চে, ঘরের মধ্যে যদি থামখা একটা ভ্রমর এসে পড়েই ভোঁভোঁ কর্‌তে সুরু করে এবং ক্ষণে ক্ষণে শাসির কাঁচে মাথা ঠুক্‌তে থাকে তবে তাতে করে তার নিজের ছাড়া আর কারো কোনো প্রকার ব্যথা লাগ্‌বার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ঠিক জায়গাটিতে সে ঠিক সুরই দেয়। আজকের আমার এই সোনার মেখলাপরা ভ্রমরটিও ঠিক সুরটি লাগিয়েছে। নিশ্চয়ই বোধ হচ্চে কোনো গ্রন্থের সমালোচনা করচে না—কিন্তু কেন যে আমার নৌকার চারপাশে ঘুরঘুর করে মরচে আমি ত বুঝতে পারচিনে—নিরপেক্ষ বিচারক-মাত্রই ত বলবে আমি শকুন্তলা বা সে জাতীয় কেউ নই। কিন্তু ক'দিন ধরে গোটাদুয়েক ভ্রমর প্রায়ই আমার বোটের চারদিকে এবং আমার বোটের ভিতরে এসে অত্যন্ত উতলাভাবে ব্যর্থগুঞ্জন এবং বৃথা অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্চে। রোজই বেলা নটা দশটার সময় তাদের দেখা যায়—তাড়াতাড়ি একবার আমার টেবিলের কাছে, ডেস্কের নীচে, রঙীন শাসির উপরে আমার মাথার চারধারে ঘুরে আবার হুস্‌ করে বেরিয়ে চলে যায়। আমি অনায়াসে মনে করতে পারি লোকান্তর থেকে কোনো অতৃপ্ত প্রেতাত্মা রোজ এমনই সময়ে ভ্রমর আকারে একবার করে আমাকে দেখেশুনে প্রদক্ষিণ করে চলে যায়। কিন্তু আমি তা মনে করিনে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ওটা সত্যকার ভ্রমর, মধুপ, সংস্কৃতে যাকে কখনো কখনো বলে দ্বিরেফ।

৮ই মার্চ্চ। ১৮৯৫। শিলাইদহের ঘাট। চিঠি জিনষটার দ্বারা মানুষের একটা নতুন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের আর একটা বন্ধন যোগ করে দিয়েছে। আমরা মানুষকে দেখে একরকম লাভ

করি, তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে একরকম লাভ করি, চিঠিপত্র পেয়ে তাকে আবার আর একরকম করে পাই। চিঠির দ্বারা যে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ আলাপের অভাব দূর করি, অসাক্ষাতে থেকে কথাবার্ত্তা চালাই, তা নয়। তার মধ্যে আরো একটু রস আছে সেটা প্রতিদিনের দেখাসাক্ষাৎ কথা-বার্ত্তার মধ্যে নেই। মানুষ মুখের কথায় আপনাকে যতখানি এবং যেরকম করে প্রকাশ করে লেখার কথায় ঠিক ততখানি করে না— আবার লেখার কথায় যতখানি মুখের কথায় ততখানি করে না,— উভয়ের মধ্যেই যে অসম্পূর্ণতা আছে তা কেবল উভয়ের যোগে পূরণ হতে পারে। এই জন্য মানুষের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে চিঠিপত্র একটা নূতনজাতীয় সুখ এবং বার্ত্তা বহন করচে যা ডাকঘর সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না। এ যেন মানুষকে দেখবার জন্যে পাবার জন্যে একটা নতুন ইন্দ্রিয়-বৃদ্ধি হয়েচে। সামান্য কথাবার্ত্তা ও আলোচনা চিঠির মধ্যে বাঁধা পড়ে একটা নতুন চেহারা বের করে—কথায় সেটা এড়িয়ে যায় এবং প্রবন্ধে সেটা কৃত্রিম হয়ে ওঠে কিন্তু চিঠিতে সেটা সহজে ধরা দেয়। আমার মনে হয় যারা চিরকাল বিচ্ছেদে যাপন করেছে, যারা চিঠি-লেখালেখির অবসর পায়নি তারা পরস্পরকে সম্পূর্ণভাবে জানে না। যেমন বাছুর কাছে এলেই গোরুর বাঁটে দুধ আপনি জুগিয়ে আসে তেমনি মনের বিশেষ বিশেষ রস কেবল বিশেষ বিশেষ উত্তেজনায় আপনি সঞ্চারিত হয়; অন্য উপায়ে হবার জো নেই। চিঠির কাগজের চারটি পৃষ্ঠায় মনের ঠিক যে জায়গাটি দোহন করতে পারে কথা কিম্বা প্রবন্ধের প্রভাব ঠিক সেখানে পৌঁছতেই পারে না।

১২ই ডিসেম্বর। ১৮৯৬। শিলাইদহ।—সেদিন সন্ধ্যাবেলায় এক-খানি ইংরিজি সমালোচনার বই নিয়ে কবিতা, সৌন্দর্য্য, আর্ট্ প্রভৃতি মাথামুণ্ডু নানা কথার নানা তর্ক পড়া যাচ্ছিল। এক এক সময় এই সমস্ত গোড়াকার কথার বাজে আলোচনা করতে করতে শ্রান্তচিত্তে সমস্তই

মরীচিকাবৎ শূন্য বোধ হয়—মনে হয় এর বারো আনা কথা বানানো। সেদিন পড়তে পড়তে মনটার ভিতরে একটা নীরস শ্রান্তির উদ্রেক হয়ে একটা বিদ্রূপপরায়ণ সন্দেহ সয়তানের আবির্ভাব হল। এদিকে রাত্রিও অনেক হওয়াতে বইটা ধাঁ করে মুড়ে ধপ্ করে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে শুতে যাবার উদ্দেশে এক ফুঁয়ে বাতি নিবিয়ে দিলুম। দেবা-মাত্রই হঠাৎ চারিদিকের সমস্ত খোলা জানলা থেকে বোটের মধ্যে জ্যোৎস্না একেবারে ভেঙে পড়ল। হঠাৎ যেন আমার চমক্ ভেঙে গেল। আমার ক্ষুদ্র একরত্তি বাতির শিখা সয়তানের মত নীরস হাসি হাসছিল, অথচ সেই অতিক্ষুদ্র বিদ্রূপহাসিতে এই বিশ্বব্যাপী গভীর প্রেমের অসীম আনন্দচ্ছটাকে একেবারে আড়াল করে রেখেছিল। নীরস গ্রন্থের বাক্যরাশির মধ্যে কি খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম! যাকে খুঁজছিলুম সে কতক্ষণ থেকে সমস্ত আকাশ পরিপূর্ণ করে নিঃশব্দে বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। যদি দৈবাৎ না দেখে অন্ধকারের মধ্যে শুতে যেতুম তাহলেও সে আমার সেই ক্ষুদ্র বাতির ব্যঙ্গের কিছুমাত্র প্রতিবাদ না করে নীরবেই নিলীন হয়ে যেত। যদি ইহজীবনে নিমেষের জন্যও তাকে না দেখ্‌তে পেতুম এবং শেষরাত্রের অন্ধকারে শেষবারের মত শুতে যেতুম তাহলেও সেই বাতির আলোরই জিৎ থেকে যেত অথচ সে বিশ্বকে ব্যাপ্ত করে সেই রকম নীরবে সেই রকম মধুর মুখেই হাস্য করত—আপনাকে গোপনও করত না, আপনাকে প্রকাশও করত না।

৬ই ডিসেম্বর। ১৮৯৫। নাগর নদীর ঘাট।—কাল অনেকদিন পরে সূর্য্যাস্তের পর ওপারে পাঙ্কের উপর বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে উঠেই হঠাৎ যেন এই প্রথম দেখ্‌লুম, আকাশের আদিঅন্ত নেই—জনহীন মাঠ দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করে হাহা করচে,—কোথায় দুটি ক্ষুদ্র গ্রাম কোথায় একপ্রান্তে সঙ্কীর্ণ একটু জলের রেখা! কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন

অসীম সন্ধ্যা,—মনে হয় যেন একটি সোনার চেলিপরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেচে; ধীরে ধীরে কত শত সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্ব্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগ-যুগান্তর কাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে, মৌনমুখে, শ্রান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আস্‌চে। তার বর যদি কোথাও নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে! কোন্ অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ?

স্থলে।

৭ই জুলাই। ১৮৯৩। সাজাদপুর।—ছোটখাট গ্রাম, ভাঙাচোরা ঘাট, বেড়া-দেওয়া গোলাঘর, বাঁশঝাড়, আম কাঁঠাল কুল খেজুর শিমুল কলা আকন্দ ভেরেণ্ডা ওল কচু লতাগুল্মতৃণের সমষ্টিবদ্ধ ঝোপঝাড় জঙ্গল, ঘাটে-বাঁধা মাস্তুল-তোলা বড় বড় নৌকার দল, নিমগ্নপ্রায় ধান ও অর্দ্ধমগ্ন পাটের ক্ষেতের মধ্য দিয়া ক্রমাগত এঁকেবেঁকে কাল সন্ধের সময় সাজাদপুরে এসে পৌঁচেছি। এখন কিছুদিনের মত এইখানেই স্থায়ী হওয়া গেল। আজ প্রাতে মাঝে মাঝে বেশ একটুখানি রৌদ্র দেখা দিচ্চে, বাতাসটি চঞ্চলবেগে বইচে, ঝাউ এবং লিচুগাছ ক্রমাগত সর্‌সর্ মর্‌মর্ করে দুল্‌চে, নানা জাতি পাখী নানা সুরে বনের মজ্‌লিষ জমিয়ে তুলেচে। আমি দোতলার জান্‌লা থেকে খালের উপরকার নৌকাশ্রেণী, ওপারের তরুমধ্যগত গ্রাম এবং এ পারের অদূরবর্ত্তী লোকালয়ের কর্ম্ম-স্রোত নিরীক্ষণ করে দেখচি। এ স্রোত তেমন তীব্রও নয় অথচ নিতান্ত নির্জ্জীবও নয়—কাজ ও বিশ্রাম এখানে হাত-ধরাধরি করে চলেচে। খেয়ানৌকো পারাপার করচে, পথিকরা ছাতা হাতে খালের ধারের রাস্তা

দিয়ে চল্‌চে, মেয়েরা ধুচুনি ডুবিয়ে চাল ধুচ্চে, চাষারা আঁটিবাঁধা পাট মাথায় করে হাটে আস্‌চে, দুটো লোক ঠক্‌ঠক্‌ শব্দে কাঠ চেলা করচে, একটা ছুতোর অশথগাছের তলায় জেলেডিঙি উল্‌টে ফেলে বাটাবি হাতে মেরামতে লেগেচে, গ্রামের কুকুরটা বিনা কারণে ঘুরে বেড়াচ্চে, গুটি-কয়েক গোরু বর্ষার ঘাস অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে খেয়ে শুয়ে শুয়ে কান ও লেজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্চে এবং কাক এসে যখন তাদের মেরুদণ্ডের উপর বসে বেশি বিরক্ত করচে তখন একবার পিঠের দিকে মাথাটা নেড়ে আপত্তি জানাচ্চে।

৫ই সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪। সাজাদপুর।—এখানকার দুপর বেলার মধ্যে একটা নিবিড় মোহ আছে। রৌদ্রের তাপ, স্তব্ধতা, নির্জ্জনতা, পাখীদের বিশেষত কাকের ডাক এবং দীর্ঘ অবসর সমস্তটা মিলে আমাকে আনমনা করে তোলে। কেন জানিনে, মনে হয় এই রকম সোনালি রৌদ্রে ভরা দুপরবেলা দিয়ে আরব্য উপন্যাস তৈরি হয়েছিল। অর্থাৎ সেই ইরান এবং আরব, ডামস্ক্‌ সমরখন্দ্‌ বুখারা;—সেই আঙুরের গুচ্ছ, গোলাপের বন, বুল্‌বুলের গান, শিরাজের মদ;—সেই মরুভূমির পথ, উটের সার, ঘোড়সওয়ার বেদুয়িন, ঘন খেজুরের ছায়ায় স্বচ্ছ জলের উৎস;—সেই নগরের মাঝে মাঝে চাঁদোয়া খাটানো সঙ্কীর্ণ রাজপথ, পথের প্রান্তে পাগড়ি এবং ঢিলে কাপড় পরা দোকানীর খর্ম্মুজ এবং মেওয়ার পসরা;—পথের ধারে মার্ব্বলের রাজপ্রাসাদ; ভিতরে ধূপের গন্ধ; জান্‌লার কাছে মস্ত তাকিয়া এবং কিন্‌খাপ; জরির চটি, ফুলো পায়জামা এবং রঙিন কাঁচলিপরা আমিনা জোবেদি এবং সুফি; পাশে পায়ের কাছে কুণ্ডলায়িত গুড়গুড়ির নল; দরজার কাছে জাঁকালো কাপড় পরা কালো হাব্‌ষির পাহারা,—এবং এই ঐশ্বর্য্যময় কারুখচিত ভয়ভীষণ বিচিত্র প্রাসাদে মানুষের কত হাসি কান্না আশা ও আশঙ্কা! এখানকার এই দুপরবেলা আমার গল্পের দুপরবেলা। আমি যখন লিখ্‌তে থাকি

তখন আমার চারদিকের এই আলো, বাতাস এবং তরুশাখার কম্পনও তাদের ভাষা যোগ করে দেবার জন্যে নানা কাণ্ড করে। বাংলাদেশের বৈচিত্র্যবিহীন অসীম সমতলক্ষেত্রের মধ্যে বিরাট্ মধ্যাহ্ন যেমন নিস্তব্ধ ভাবে বিস্তীর্ণ হতে পারে এমন আর কোথাও না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা বাঙালীরা প্রচুর পরিমাণে মধ্যাহ্নভোজন করি বলেই মধ্যাহ্নের এই নিবিড় ভাবসৌন্দর্য্যটুকু ভোগ করিতে পারি নে। দরজা বন্ধ করে তামাক খেতে খেতে পান চিবতে চিবতে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত পরিপূর্ণভাবে নিদ্রার আয়োজন করতে থাকি এবং দিব্য সুচিক্কণ পরিপুষ্ট হয়ে উঠি।

৭ই সেপ্টেম্বর। ১৮৯৪। সাজাদপুর।—প্রতিদিনের শরৎকালের দুপর বেলা প্রতিদিন একইভাবে দেখা দেয়—পুরাতন প্রতিদিনই নূতন করে আসে। প্রকৃতি প্রত্যহ পুনরাবৃত্তি করতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না—আমাদেরই সঙ্কোচ বোধ হয় আমাদের দীন ভাষা তার নিত্য ব্যবহারের জীর্ণতাকে নব জীবনের উৎসধারায় প্রতিবার ধুয়ে আন্‌তে পারে না বলেই রোজ একভাবকে নতুন করে দেখাতে পারে না। অথচ সকল কবিই চিরকাল উল্‌টেপাল্‌টে একই কথা বলে আস্‌চে। যারা ক্ষুদ্র কবি তারাই জবরদাস্ত করে নূতনত্ব আনবার চেষ্টা করে,—তাতে এই প্রমাণ হয় যে, পুরাতনের মধ্যে যে চিরনূতনত্ব আছে সেটা তাদের অসাড় কল্পনা অনুভব করতে পারে না। তেমনি অনেক বোধশক্তিবিহীন পাঠকও আছে যারা নূতনকে কেবল তার নূতনত্বের জন্যেই পছন্দ করে। কিন্তু ভাবুক নূতনত্বের ফাঁকিকে প্রবঞ্চনা বলে ঘৃণা করে। তারা এ জানে যতক্ষণ আমরা অনুভব করি ততক্ষণ কিছুই পুরোণো হতে পারে না। কিন্তু যা অনুভব করিনে শুধু জ্ঞানে জানি মাত্র—তা মানুষের প্রেম হোক্, দেশের প্রেম হোক, বা ধর্ম্ম হোক্—তাকে অনুভূতির অমৃতে কোনোমতে বাঁচিয়ে তোল্‌বার জন্যে আমরা যথাসাধ্য বাড়াবাড়ি করি—খুব প্রবল কিম্বা

খুব একটা নতুন কথা বলবার চেষ্টা করি কিন্তু যথার্থ নতুন কথা এবং যথার্থ প্রবল কথা মুখ দিয়ে বেরতে চায় না।

২রা জুলাই। ১৮৯৫। সাজাদপুর।—নৌকো ছেড়ে সাজাদপুরের কুঠিবাড়িতে উঠে এসেছি। যা ভেবেছিলুম তাই। অর্থাৎ বেশ লাগ্‌চে। দুই পাশের খোলা বারান্দা থেকে অজস্র আলোয় আমার অভিষেক চল্‌চে—এই আলোতে লিখতে পড়তে ও ভাবতে বড় মধুর লাগে। আর একটি বেশ লাগে—কাজ করতে করতে কোনো একদিকে মুখ ফেরালেই দেখতে পাই নীল আকাশের সঙ্গে মিশ্রিত সবুজ পৃথিবীর একটা অংশ একেবারে আমার ঘরের লাগাও এসে উপস্থিত। যেন প্রকৃতি একটি কুতূহলী পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মত সর্ব্বদাই আমার জান্‌লা দরজার কাছে উঁকি মারচে, আমার ঘরের এবং মনের, আমার কাজের এবং অবসরের চারিদিক প্রসন্ন প্রফুল্ল সরস এবং সজীব নবীন সুন্দর হয়ে আছে। এই বর্ষণমুক্ত আকাশের আলোকে এই গ্রাম এবং জলের রেখা, এপার এবং ওপার, খোলা মাঠ এবং ভাঙা রাস্তা একটা স্বর্গীয় কবিতায়—অ্যাপলো-দেবের স্বর্ণবীণাধ্বনিতে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। আকাশ আমার সাকি, নীল স্ফটিকের স্বচ্ছ পেয়ালা সে উপুড় করে ধরেচে, সোনার আলো আমার রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে আমাকে দেবতাদের সমান করে দিচ্চে। যেখানে আমার সাকীর মুখ প্রসন্ন এবং উন্মুক্ত, সেখানে আমার এই সোনার মদ সব চেয়ে সোনালি এবং স্বচ্ছ, সেইখানে আমি কবি, আমি রাজা. সেইখানে আমার বত্রিশ সিংহাসন। এই আলোকের ভাণ্ডারীর কাছে আমার নিবেদন এই যে সুনীল নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় অসীমতার সঙ্গে আমার জীবনের প্রত্যক্ষ যোগ যেন জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত বেড়ে যেতে থাকে এবং অন্তিম মুহূর্ত্তে যেন জর্ম্মান কবি গ্যয়টের মত আমার শেষ দরবার জানাই—Light ! more Light !

৫ই অক্টোবর। ১৮৯৫। কুষ্টিয়া।—কে আমাকে গভীর গম্ভীরভাবে

সমস্ত জিনিষ দেখতে বলচে—কে আমাকে অভিনিবিষ্ট স্থির কর্ণে সমস্ত বিশ্বাতীত সঙ্গীত শুনতে প্রবৃত্ত করচে—বাইরের সঙ্গে আমার সমস্ত সূক্ষ্ম এবং প্রবলতম যোগসূত্রগুলিকে প্রতিদিন সজাগ সচেতন করে তুলচে। হৃদয়ের প্রাত্যহিক পরিতৃপ্তির প্রাচুর্য্যে মানুষের কোনো ভাল হয় না—তাতে প্রচুর উপকরণের অপব্যয় হয়ে কেবল অল্পই সুখ উৎপন্ন করে এবং কেবল আয়োজনেই সময় কেটে গিয়ে উপভোগের অবসরমাত্র থাকে না। কিন্তু ব্রতযাপনের মত জীবনযাপন করলে দেখা যায় অল্প সুখই প্রচুর সুখ এবং সুখই একমাত্র সুখকর নয়। চিত্তের দর্শন স্পর্শন শ্রবণ মননশক্তিকে যদি সচেতন রাখতে হয়—যা কিছু পাওয়া যায় তাকেই পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করবার শক্তিকে যদি উজ্জ্বল রাখতে হয় তাহলে নিজেকে অতি-প্রাচুর্য্য থেকে বঞ্চিত করা চাই। Goethe-র একটি কথা আমি মনে করে রেখেছি সেটা শুনতে সাদাসিধা কিন্তু বড়ই গভীর—

Entbehren sollst du, sollst entbehren.

Thou must do without, must do without.

কেবল হৃদয়ের অতিভোগ নয়, বাইরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য জিনিষপত্রও আমাদের অসাড় করে দেয়। বাইরের সমস্ত যখন বিরল তখনি নিজেকে ভালরকমে পাই।

* * * * *

আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্ম্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নাড়ির শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে হয় তার পরে জীবনে সুখ পাই আর না পাই আনন্দে চরিতার্থ হয়ে মরতে পারি। যা মুখে বলচি, যা লোকের মুখে শুনে প্রত্যহ আবৃত্তি করচি তা যে আমার পক্ষে কতই মিথ্যা তা আমরা

বুঝতেই পারিনে। এদিকে আমাদের জীবন ভিতরে ভিতরে নিজের সত্যের মন্দির প্রতিদিন একটি একটি ইঁট নিয়ে গড়ে তুল্‌চে। জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে দেখি তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্ত সৃজনরহস্য ঠিক বুঝ্‌তে পারিনে—প্রত্যেক পদটা বানান করে পড়তে হলে যেমন সমস্ত বাক্যটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না সেই রকম। কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজনব্যাপারের অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায় তখন এই সৰ্জ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি। বুঝ্‌তে পারি যেমন গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠ্‌চে আমার ভিতরেও তেমনি অনাদিকাল ধরে একটা সৃজন চল্‌চে—আমার সুখদুঃখ বাসনা বেদনা তার মধ্যে আপনার আপনার স্থান গ্রহণ করচে—এর থেকে কি যে হয়ে উঠ্‌চে তা আমরা স্পষ্ট জানিনে কারণ আমরা একটি ধূলিকণাকেও জানিনে। কিন্তু নিজের প্রবহমান জীবনকে যখন নিজের বাহিরে নিখিলের সঙ্গে যোগ করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই—আমি আছি, আমি চল্‌চি, আমি হয়ে উঠ্‌চি এইটেকেই একটা বিরাট ব্যাপার বলে বুঝ্‌তে পারি। আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সমস্তই আছে—আমাকে ছেড়ে কোথাও একটি অণুপরমাণুও থাক্‌তে পারে না; এই সুন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে এই জ্যোতির্ম্ময় শূন্যের সঙ্গে আমার অন্তরাত্মার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার যোগ; অনন্ত জগৎপ্রাণের সঙ্গে আমার এই যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধেরই প্রত্যক্ষভাষা এই সমস্ত বর্ণগন্ধগীত—চতুর্দ্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমার মনকে লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ক্রমাগতই আন্দোলিত করচে, কথাবার্ত্তা দিনরাত্রই চল্‌চে। এই যে আমার অন্তরের সঙ্গে বাহিরের কথাবার্ত্তা আনাগোনা আদানপ্রদান—আমার যা কিছু পাওয়া সম্ভব তা

কেবলমাত্র এর থেকেই পেতে পারি, তা অল্পই হোক্ আর বেশিই হোক; শাস্ত্রথেকে যা পাই তা এইখানে একবার যাচাই করে না নিলে তা পাওয়াই হয় না। এই আমার অন্তর বাহিরের মিলনে যা নিরন্তর ঘটে উঠ্‌চে আমার ক্ষুদ্রতা তার মধ্যে বিকার ও বাধার সঞ্চার করে তাকে যেন আচ্ছন্ন না করে—আমার জীবন যেন এই পরিপূর্ণ মিলনের অনুকূল হয়—নিখিলকে আমার মধ্যে যেন আমি বাধা না দিই। কৃত্রিম জীবনের জটিল গ্রন্থিগুলি একে একে উন্মোচিত হয়ে যাক্, মুগ্ধ সংস্কারের এক একটি বন্ধন কঠিন বেদনার দ্বারা একান্ত ছিন্ন হোক্, নিবিড় নিভৃত অন্তরতম সান্ত্বনার মধ্যে অন্তঃকরণের চিরসঞ্চিত উত্তাপ একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মুক্তিলাভ করুক্ এবং জগতের সঙ্গে সরল সহজ সম্বন্ধের মধ্যে অনায়াসে দাঁড়িয়ে যেন বল্‌তে পারি আমি ধন্য!

বন্ধুস্মৃতি।

সতীশচন্দ্র রায়।

জীবনে যে ভাগ্যবান্ পুরুষ সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছে, মৃত্যুতে তাহার পরিচয় উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। তাহাকে যেমন হারাই, তেমনি লাভও করি। মৃত্যু তাহার চারিদিকে যে অবকাশ রচনা করিয়া দেয়, তাহাতে তাহার চরিত্র, তাহার কীর্ত্তি, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবপ্রতিমার মত সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু যে জীবন দৈবশক্তি লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিল, অথচ অমরতালাভের পূর্ব্বেই মৃত্যু যাহাকে অকালে আক্রমণ করিয়াছে, সে আপনার পরিচয় আপনি রাখিয়া যাইতে পারিল না। যাহারা তাহাকে চিনিয়াছিল, তাহারা বর্ত্তমান অসম্পূর্ণ আরম্ভের মধ্যে ভাবী সফল পরিণাম পাঠ করিতে পারিয়াছিল, যাহারা তাহার বিকাশের জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল, তাহাদের বিচ্ছেদবেদনার মধ্যে একটা বেদনা এই যে, আমার শোককে সকলের সামগ্রী করিতে পারিলাম না। মৃত্যু কেবল ক্ষতিই রাখিয়া গেল।

সতীশচন্দ্র সাধারণের কাছে পরিচিত নহে। সে তাহার যে অল্পকয়টি লেখা রাখিয়া গেছে, তাহার মধ্যে প্রতিভার প্রমাণ এমন নিঃসংশয় হইয়া উঠে নাই যে, অসঙ্কোচে তাহা পাঠকদের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে আত্মমহিমা প্রকাশ করিতে পারে। কেহ বা তাহার মধ্যে গৌরবের আভাস দেখিতেও পারেন, কেহ বা না-ও দেখিতে পারেন, তাহা লইয়া জোর করিয়া আজ কিছু বলিবার পথ নাই।

কিন্তু লেখার সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যক্তি লেখকটিকেও কাছে দেখিবার উপযুক্ত সুযোগ পাইয়াছে, সে ব্যক্তি কখনো সন্দেহমাত্র করিতে পারে না যে, সতীশ বঙ্গসাহিত্যে যে প্রদীপটি জ্বালাইয়া যাইতে পারিল না, তাহা জ্বলিলে নিভিত না।

আপনার দেয় সে দিয়া যাইতে সময় পায় নাই, তাহার প্রাপ্য তাহাকে এখন কে দিবে ? কিন্তু আমার কাছে সে যখন আপনার পরিচয় দিয়া গেছে, তখন তাহার অকৃতার্থ মহত্ত্বের উদ্দেশে সকলের সমক্ষে শোকসন্তপ্তচিত্তে আমার শ্রদ্ধার সাক্ষ্য না দিয়া আমি থাকিতে পরিলাম না। তাহার অনুপম হৃদয়মাধুর্য্য, তাহার অকৃত্রিম কল্পনাশক্তির মহার্ঘতা, জগতে কেবল আমার একলার মুখের কথার উপরেই আত্মপ্রমাণের ভার দিয়া গেল, এ আক্ষেপ আমার কিছুতেই দূর হইবে না। তাহার চরিত্রের মহত্ত্ব কেবল আমারি স্মৃতির সামগ্রী করিয়া রাখিব, সকলকে তাহার ভাগ দিতে পারিব না, ইহা আমার পক্ষে দুঃসহ।

সতীশ যখন প্রথম আমার কাছে আসিয়াছিল, সে অধিকদিনের কথা নহে। তখন সে কিশোরবয়স্ক—কলেজে পড়িতেছে—সঙ্কোচে-সম্ভ্রমে বিনম্র—মুখে অল্পই কথা।

কিছুদিন আলাপ করিয়া দেখিলাম, সাহিত্যের হাওয়াতে পক্ষবিস্তার করিয়া-দিয়া সতীশের মন একেবারে উধাও হইয়া উড়িয়াছে। এ বয়সে অনেক লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু এমন সহজ অন্তরঙ্গতার সহিত সাহিত্যের মধ্যে আপনার সমস্ত অন্তঃকরণকে প্রেরণ করিবার ক্ষমতা আমি অন্যত্র দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

সাহিত্যের মধ্যে ব্রাউনিং তখন সতীশকে বিশেষভাবে আবিষ্ট করিয়া ধরিয়াছিল। খেলাচ্ছলে ব্রাউনিং পড়িবার জো নাই। যে লোক ব্রাউনিংকে লইয়া ব্যাপৃত থাকে, সে হয় ফ্যাশানের খাতিরে, নয় সাহিত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগবশতই এ কাজ করে। আমাদের দেশে ব্রাউনিঙের ফ্যাশান্ বা ব্রাউনিঙের দল প্রবর্ত্তিত হয় নাই, সুতরাং ব্রাউনিং পড়িতে যে অনুরাগের বল আবশ্যক হয়, তাহা বালক সতীশেরও প্রচুর পরিমাণে ছিল। বস্তুত সতীশ সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ ও সঞ্চরণ করিবার স্বাভাবিক অধিকার লইয়া আসিয়াছিল।

যে সময়ে সতীশের সহিত আমার আলাপের সূত্রপাত হইয়াছিল, সেই সময়ে বোলপুরষ্টেশনে আমার পিতৃদেবের স্থাপিত "শান্তিনিকেতন" নামক আশ্রমে আমি একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে দ্বিজবংশীয় বালকগণ যে ভাবে, যে প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিয়া মানুষ হইত, এই বিদ্যালয়ে সেই ভাব, সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমানপ্রচলিত পাঠ্যবিষয়গুলিকে শিক্ষা দিব, এই আমার ইচ্ছা ছিল। গুরুশিষ্যের মধ্যে আমাদের দেশে যে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধের মধ্যে থাকিয়া ছাত্রগণ ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক শুদ্ধ-শুচি-সংযত শ্রদ্ধাবান্ হইয়া মনুষ্যত্বলাভ করিবে, এই আমার সঙ্কল্প ছিল।

বলা বাহুল্য, এখনকার দিনে এ কল্পনা সম্পূর্ণভাবে কাজে খাটানো সহজ নহে। এমন অধ্যাপক পাওয়াই কঠিন যাঁহারা অধ্যাপনকার্য্যকে যথার্থ ধর্ম্মব্রতস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। অথচ বিদ্যাকে পণ্যদ্রব্য করিলেই গুরুশিষ্যের সহজসম্বন্ধ নষ্ট হইয়া যায়, ও তাহাতে এরূপ বিদ্যালয়ের আদশ ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে।

এই কথা লইয়া একদিন খেদ করিতেছিলাম—তখন সতীশ আমার ঘরের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সে হঠাৎ লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া বিনীতস্বরে কহিল—"আমি বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষাদানকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমি কি এ কাজের যোগ্য ?"

তখনো সতীশের কলেজের পড়া সাঙ্গ হয় নাই। সে আর কিছুর জন্যই অপেক্ষা করিল না, বিদ্যালয়ের কাজে আত্মসমর্পণ করিল।

ভাবী সাংসারিক উন্নতির সমস্ত আশা ও উপায় এইরূপে বিসর্জ্জন করাতে সতীশ তাহার আত্মীয়বন্ধুদের কাছ হইতে কিরূপ বাধা পাইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ কল্পনা করিতে পারিবেন। এই সংগ্রামে সতীশের

হৃদয় অনেকদিন অনেক গুরুতর আঘাত সহিয়াছিল, কিন্তু পরাস্ত হয় নাই।

কল্পনাক্ষেত্র হইতে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া আসিলেই অনেকের কাছে সঙ্কল্পের গৌরব চলিয়া যায়। প্রতিদিনের খণ্ডতা ও অসম্পূর্ণতার মধ্যে তাহারা বৃহৎকে, দূরকে, সমগ্রকে দেখিতে পায় না—প্রাত্যহিক চেষ্টার মধ্যে যে সমস্ত ভাঙাচোরা, জোড়াতাড়া, বিরোধ, বিকার, অসামঞ্জস্য অনিবার্য্য, তাহাতে পরিপূর্ণ পরিণামের মহত্বচ্ছবি আচ্ছন্ন হইয়া যায়। যে সকল কাজের শেষ ফলটিকে লাভ করা দূরে থাক্, চক্ষেও দেখিবার আশা করা যায় না, যাহার মানসী মূর্ত্তির সহিত কর্ম্মরূপের প্রভেদ অত্যন্ত অধিক, তাহার জন্য জীবন উৎসর্গ করা, তাহার প্রতিদিনের স্তূপাকার বোঝা কাঁধে লইয়া পথ খুঁজিতে খুঁজিতে চলা সহজ নহে। যাহারা উৎসাহের জন্য বাহিরের দিকে তাকায়, এ কাজ তাহাদের নহে—কাজও করিতে হইবে নিজের শক্তিতে তাহার বেতনও জোগাইতে হইবে নিজের মনের ভিতর হইতে—নিজের মধ্যে এরূপ সহজ সম্পদের ভাণ্ডার সকলের নাই।

বিধাতার বরে সতীশ অকৃত্রিম কল্পনাসম্পদ্ লাভ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, সে ক্ষুদ্রের ভিতর বৃহৎকে, প্রতিদিনের মধ্যে চিরন্তনকে সহজে দেখিতে পাইত। যে ব্যক্তি ভিখারী শিবের কেবল বাঘছাল এবং ভস্মলেপটুকুই দেখিতে পায়, সে তাঁহাকে দীন বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া ফিরিয়া যায়। সংসারে শিব তাঁহার ভক্তদিগকে ঐশ্বর্য্যের ছটা বিস্তার করিয়া আহ্বান করেন না—বাহ্যদৈন্যকে ভেদ করিয়া যে লোক এই ভিক্ষুকের রজতগিরিসন্নিভ নির্ম্মল ঈশ্বরমূর্ত্তি দেখিতে পান, তিনিই শিবকে লাভ করেন—ভুজঙ্গবেষ্টনকে তিনি বিভীষিকা বলিয়া গণ্য করেন না এবং এই পরম কাঙালের রিক্ত ভিক্ষাপাত্রে আপনার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করাকেই চরমলাভ বলিয়া জ্ঞান করেন।

সতীশ প্রতিদিনের ধূলিভস্মের অন্তরালে, কর্ম্মচেষ্টার সহস্র দীনতার মধ্যে শিবের শিবমূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন, তাঁহার সেই তৃতীয় নেত্র ছিল। সেইজন্য এত অল্প বয়সে, এই শিশু অনুষ্ঠানের সমস্ত দুর্ব্বলতা-অপূর্ণতা সমস্ত দীনতার মধ্যে তাঁহার উৎসাহ-উদ্যম অক্ষুণ্ণ ছিল, তাঁহার অন্তঃকরণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। বোলপুরের এই প্রান্তরের মধ্যে গুটিকয়েক বালককে প্রত্যহ পড়াইয়া যাওয়ার মধ্যে কোনো উত্তেজনার বিষয় ছিল না। লোকচক্ষুর বাহিরে, সমস্ত খ্যাতিপ্রতিপত্তি ও আত্মনাম-ঘোষণার মদমত্ততা হইতে বহুদূরে একটি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপ্রণালীর সঙ্কীর্ণতার মধ্য দিয়া আপন তরুণ জীবনতরী যে শক্তিতে সতীশ প্রতিদিন বাহিয়া চলিয়াছিল, তাহা খেয়ালের জোর নয়, প্রবৃত্তির বেগ নয়, ক্ষণিক উৎসাহের উদ্দীপনা নয়—তাহা তাহার মহান্ আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত্ত আত্মপারতৃপ্ত শক্তি।

সতীশ, অনাঘ্রাত পুষ্পরাশির ন্যায়, তাহার তরুণ হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা বহন করিয়া এই নিভৃত শান্তিনিকেতনের আশ্রমে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইল। কলেজ হইতে বাহির হইয়া জীবনযাত্রার আরম্ভ-কালেই সে যে ত্যাগস্বীকার করিয়াছিল, তাহা লইয়া একদিনের জন্যও সে অহঙ্কার অনুভব করে নাই—সে প্রতিদিন নম্রমধুর প্রফুল্লভাবে আপনার কাজ করিয়া যাইত, সে যে কি করিয়াছিল, তাহা সে জানিত না।

এই শান্তিনিকেতন আশ্রমে চারিদিকে অবারিত তরঙ্গায়িত মাঠ—এ মাঠে লাঙলের আচড় পড়ে নাই। মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় খর্ব্বায়তন বুনো খেজুর, বুনো জাম, দুইএকটা কাঁটাগুল্ম, এবং উয়ের ঢিবিতে মিলিয়া একএকটা ঝোপ বাঁধিয়াছে। অদূরে ছায়াময় ভুবনডাঙা-গ্রামের প্রান্তে একটি বৃহৎ বাঁধের জলরেখা দূর হইতে ইস্পাতের ছুরির মত ঝলকিয়া উঠিতেছে এবং তাহার দক্ষিণ পাড়ির

উপর প্রাচীন তালগাছের সার কোনো ভগ্ন দৈত্যপুরীর স্তম্ভশ্রেণীর মত দাঁড়াইয়া আছে। মাঠের মাঝে মাঝে বর্ষার জলধারায় বেলেমাটি ক্ষইয়া গিয়া নুড়িবিছানো কঙ্করস্তূপের মধ্যে বহুতর গুহাগহ্বর ও বর্ষাস্রোতের বালুবিকীর্ণ জলতলরেখা রচনা করিয়াছে। জনশূন্য মাঠের ভিতর দিয়া একটি রক্তবর্ণ পথ দিগন্তবর্ত্তী গ্রামের দিকে চলিয়া গেছে—সেই পথ দিয়া পল্লীর লোকেরা বৃহস্পতিবার-রবিবারে বোলপুর-সহরের হাট করিতে যায়, সাঁওতালনারীরা খড়ের আঁটি বাঁধিয়া বিক্রয় করিতে চলে এবং ভারমন্থর গোরুর-গাড়ি নিস্তব্ধ-মধ্যাহ্নের রৌদ্রে আর্ত্তশব্দে ধূলা উড়াইয়া যাতায়াত করে। এই জনহীন তরুশূন্য মাঠের সর্ব্বোচ্চ ভূখণ্ডে দূর হইতে ঋজুদীর্ঘ একসারি শালবৃক্ষের পল্লবজালের অবকাশপথ দিয়া একটি লৌহমন্দিরের চূড়া ও একটি দোতলা কোঠার ছাদের অংশ চোখে পড়ে—এইখানেই আমলকী ও আম্রবনের মধ্যে মধূক ও শালতরুর তলে শান্তিনিকেতন আশ্রম।

এই আশ্রমের এক প্রান্তে বিদ্যালয়ের মৃণ্ময়কুটীরে সতীশ আশ্রয় লইয়াছিল। সম্মুখের শালতরুশ্রেণীতলে যে কঙ্করখচিত পথ আছে, সেই পথে কতদিন সূর্য্যাস্তকালে তাহার সহিত ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, এবং জনশূন্য প্রান্তরের নিবিড় নিস্তব্ধতার ঊর্দ্ধদেশে আকাশের সমস্ত তারা উন্মীলিত হইয়াছে। এখানকার এই উন্মুক্ত আকাশ ও দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তরের মাঝখানে আমি তাহার উদ্ঘাটিত উন্মুখ হৃদয়ের অন্তর্দ্দেশে দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। এই নবীন হৃদয়টি তখন প্রকৃতির সমস্ত ঋতুপরম্পরার রসস্পর্শে, সাহিত্যের বিচিত্র ভাবান্দোলনের অভিঘাতে ও কল্যাণসাগরে আপনাকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিবার আনন্দে অহরহ স্পন্দিত হইতেছিল।

এই সময়ে সতীশ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের বালকদের জন্য উতঙ্কের উপাখ্যান

অবলম্বন করিয়া "গুরুদক্ষিণা" নামক কথাটি রচনা করিয়াছিল। এই ক্ষুদ্র কথাগ্রন্থটির মধ্যে সতীশ তাহার ভক্তিনিবেদিত তরুণ হৃদয়ের সমস্ত অসমাপ্ত আশা ও আনন্দ রাখিয়া গেছে—ইহা শ্রদ্ধার রসে সুপরিণত ও নবজীবনের উৎসাহে সমুজ্জ্বল—ইহার মধ্যে পূজাপুষ্পের সুকুমার শুভ্রতা অতি কোমলভাবে অম্লান রহিয়াছে। এই গ্রন্থটুকুকে শিল্পীর মত রচনা করে নাই—এই আশ্রমের আকাশ, বাতাস, ছা[illegible] ও সতীশের সদ্য-উদ্বোধিত প্রফুল্ল নবীনহৃদয়ে মিলিয়া গানের মত করিয়া ইহাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে।

সতীশের জীবনের শেষ রচনাটি মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে একখানি পত্রের সহিত আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। সেই পত্রে অন্যান্য কথার মধ্যে তাহার ভাবী জীবনের আশা, তাহার বর্ত্তমান জী[illegible]র সাধনার কথা সে লিখিয়াছিল—সে সব কথা এখন ব্যর্থ হইয়াছে—সেগুলি কেবল আমারি নিকটে সত্য—অতএব সেই কথাকয়টি কেবল আমি রাখিলাম—তাহার পত্রের অবশিষ্ট অংশ এইখানে প্রকাশ করিতেছি।

সতীশের শেষ রচনাটি 'তাজমহল' নামক একটি কবিতা। কিছুদিন হইল, সে পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিল। আগ্রার তাজমহল-সমাধির মধ্যে সে মমতাজের অকালমৃত্যুর সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিল। অসমাপ্তির মাঝখানে হঠাৎ সমাপ্তি—ইহারও একটা গৌরব আছে। ইহা যেন একটা নিঃশেষবিহীনতা রাখিয়া যায়।

মমতাজের সৌন্দর্য্য এবং প্রেম অপরিতৃপ্তির মাঝখানে শেষ হইয়াই অশেষ হইয়া উঠিয়াছে—তাজমহলের সুষমাসৌষ্ঠবের মধ্যে কবি সতীশ সেই অনন্তের সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া তাহার জীবনের শেষ কবিতা লিখিয়াছিল।

সতীশের তরুণ জীবনও সম্মুখবর্ত্তী উজ্জ্বল লক্ষ্য, নবপরিস্ফুট আশা

ও পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনের মাঝখানে অকস্মাৎ ১৩১০ সালের মাঘী পূর্ণিমার দিনে ২১ বৎসর বয়সে সমাপ্ত হইয়াছে। এই সমাপ্তির মধ্যে আমরা শেষ দেখিব না, এই মৃত্যুর মধ্যে আমরা অমরতাই লক্ষ্য করিব। সে যাত্রাপথের একটি বাঁকের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু জানি, তাহার পাথেয় পরিপূর্ণ—সে দরিদ্রের মত রিক্তহস্তে জীর্ণশক্তি লইয়া যায় নাই।

পত্র।

ব্রহ্মবিদ্যালয়,
বোলপুর।

* * * * * *

আমি এই চিঠিতে 'তাজমহল' বলিয়া একটি কবিতা পাঠাইতেছি। এটা এখানে আসিয়া লিখিয়াছি।

দেখিয়াছি, তাজমহল দুটি ভাবে মনকে ক্ষুব্ধ করে। দিনের আলোকে মলিন নরনারীর মধ্যে, ধূলা, শুষ্ক যমুনা, রেলের চীৎকার, ইংরাজের মূর্ত্তিমান্ কর্ম্মবেগ রেলগাড়ির দৌড়ের মধ্যে, কালের পরিহাসপূর্ণ লীলার মধ্যে—তাজমহলটাকে বড়ই বাহুল্য বলিয়া মনে হয়। সমস্ত মানুষের সঙ্গে সহানুভূতির রসে এই মর্ম্মরের রঙীন্ লতাপাতা উপচিত নয়। সমস্ত সংসারের সঙ্গে সমভূমিতে না দাঁড়াইয়া কবরটি যেন একটা উচ্চ জমির উপর দাঁড়াইয়াছে। ইহার Harmonious সৌষ্ঠব, ইহার নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতা, ইহার বিরল চিত্রবিলাস—সমস্ত লইয়া ইহা যেন আমাদিগকে বাহিরে ঠেলিয়া রাখিতে চায়। বিশেষত বুদ্ধগয়ায় পূজার ভাবে আচ্ছন্ন নরনারীর ভক্তিপূর্ণ লীলায় তরঙ্গায়িত অশোক-রেলিংএর চিত্রমালা আগে দেখিয়া আসিয়াছিলাম বলিয়া তাজমহলের বিলাসের ভাবটাতে এত ব্যথা পাইয়াছিলাম। মনে হয়, চারিদিক্ হইতে সমস্ত বাজার, সমস্ত লোক উঠাইয়া

দিয়া একটি নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে রাখিয়া দিলেই তাজমহলের ক্ষান্ত-উৎসার উৎসমুখগুলির রুদ্ধ শোকের প্রতি কতকটা সম্মান করা হয়।

এটা বড় নিষ্ঠুর ভাব। কিন্তু রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে তাজের Perfect harmonyটি যখন মনকে জড়াইয়া ধরে, তখন তাজকে আর নির্জীব-ভাবে পার্থিবভাবে দেখিবার জো নাই। তখন তাজকে বাহুল্যবর্জ্জিত একটি নিগূঢ় গীতের মত করিয়া অনুভব করিতে ইচ্ছা হয়। বিশেষত আমি যখন দূরে আছি, তখন সেই ভাবেই তাজকে বেশি মনে পড়ে। আমি সেই ভাবটিই আমার কবিতাটিতে প্রকাশ করিয়াছি।

* * * * * *

এই গেল আমার মনের কথাটা—এখন কবিতার সৌষ্ঠব কতদূর হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আপনার কথার অপেক্ষায় রহিলাম।

এবার দিল্লি, আগ্রা, গয়া, কাশী প্রভৃতি স্থান দেখিয়া মনে আরও অনেক ভাব উঠিয়াছে—বাস্তবিক ৮ দিনের মধ্যে যেন খানিকটা বাড়িয়া উঠিয়াছি। * * * *

বুদ্ধগয়ায় যখন অশোক রেলিং দেখিলাম—রাঙা পাথরে যক্ষ আঁকা, যক্ষী আঁকা—বাড়ীটি গাছপালায় ঢাকা, নির্জ্জন—চারিদিকে স্তূপ—একজন জাপানী Penitent জাপান হইতে প্রেরিত বুদ্ধের কাছে থাকে—তিব্বত হইতে, সিমলা হইতে গরীব-দুঃখী আসিয়া বাস করিতেছে—বর্ম্মা হইতে কতকগুলি ঘণ্টা উপহার পাঠাইয়াছে—তখন মনে হইল, ভারতবর্ষের একটি ছায়াঢাকা গ্রামের মধ্যে একটি করুণার উৎস আছে—কক্ষে কলস লইয়া সমস্ত এসিয়া-সুন্দরী সেখানে তৃষ্ণা মিটাইতে আসিয়াছে। মন্দিরের মধ্যে সোনার পাতে ঢাকা বৌদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয় এমন ভাবে নড়িয়া উঠিল যে, তেমন হৃৎকম্প আমি পূর্ব্বে কখনো অনুভব করি নাই।

কিন্তু বুদ্ধদেব আজ স্তম্ভিত। আপনি যে হিমালয়সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,

সেইরূপ আজ—"সে প্রচণ্ড গতি অবসান।" এই প্রচণ্ড করুণার উৎসটির স্তম্ভিত গাম্ভীর্য্যের নাড়া প্রাণে অনুভব করিয়াছি। অন্যকার পৃথিবীর সহিত মিল নাই; চতুর্দ্দিকে নূতন রাগিণী উঠিয়াছে—তাই বুদ্ধদেবও যেন ধরণীর বক্ষ-কোটরে প্রবেশ করিয়াছেন। আপনি যে "মন্দির" লিখিয়াছেন—"রচিয়াছিনু দেউল একখানি"—তাহাতে আপনি এই বুদ্ধদেবকে বাহির হইয়া আসিতে ডাক দিয়াছেন—বিশ্বের কর্ম্মের মধ্যে, আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে তাঁহাকে সার্থক হইতে আহ্বান করিয়াছেন—তাহা যেদিন হইবে, সেদিন সত্যসত্যই পৃথিবীতে নূতন আলো আবির্ভূত হইবে। আমি ঐ গানের অর্থ ভালরূপেই বুঝিয়াছি। কারণ উহার আগের পর্দ্দা হইতে যে একটি গান উঠিতেছে, তার সুর শুনিয়া এবার আমাকে অশ্রুতে অন্ধ হইয়া আসিতে হইয়াছে। আমার মনে হইয়াছে, যেন পৃথিবী অর্থাৎ সমস্ত মনুষ্যসাধারণের হৃদয় একটি নারী এবং দিব্য-সংবাদবাহী মহাপুরুষগণ ঐ নারীর প্রাণের প্রিয়। পুরুষ আসিয়া নারীকে যখন ভালবাসে, তখন নারী এক অপূর্ব্ব আনন্দে কাঁপিয়া উঠে। বুদ্ধদেবের ভালবাসার ডাকে অশোকপ্রমুখ নারীহৃদয় আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল—কল্যাণকর্ম্মে উৎসব বিস্তার করিয়া, কলাকাণ্ডে মঙ্গলভূষা পরিয়া ঐ নারী পুরুষটিকে হৃদয়ের মধ্যে বরিয়া লইয়াছিল।

কিন্তু কালের লীলায় ক্রমে সেই আনন্দমিলনের উৎসব থামিয়া গেল। আজ যেন বুদ্ধগয়ার পাহাড়গুলির মধ্যে শুষ্ক নৈরঞ্জনা ও মাহীর তীরে ছায়াঢাকা গ্রামটিতে পা ছড়াইয়া সেই নারী অন্ধের মত, অবচনার মত মন্দিরবক্ষকোটরে সেই পুরুষের ছবি লইয়া বসিয়া আছে। আজও তার অবসন্ন হস্ত বর্ম্মা এবং তিব্বত হইতে সমাগত কাঙালীর মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেছে—কিন্তু—"সে প্রচণ্ড গতি অবসান!" ফল্গুর মধ্যে যে অপরিচ্ছন্ন নরনারী কাপড় ধুইতেছে, তাদের সঙ্গে ঐ নারীর হৃদয়ের কি কোনো যোগ আছে? ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট্-কে যে সাহেব বিনা

অপরাধে তাঁর এক চাপরাশি ছাড়াইয়া দিতে হুকুম করিতেছে, তার হৃদয়ে উহার কোনো প্রেরণা সঞ্চারিত হয়? তা ছাড়া, আমরা যে স্বচ্ছন্দমনে নানা বাজে কল্পনা লইয়া বেড়াইতেছি এবং সাহেবের রেলের তলে পড়িয়া মারা যাইতেছি, আমাদের সঙ্গেই বা তাহার কোথায় যোগ? স্তম্ভিত প্রকাণ্ড পাথরের বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি এবং অল্প একটুকুন্ অশোকের রেলিং এখনো যা বজায় আছে—তার আনন্দহিল্লোলিত ভক্তিভঙ্গিসুন্দর ছবিগুলি দেখিয়া আমার হৃদয় এইরকম একটা দুঃখের ভাবেই নাড়া পাইয়াছে। এই স্তম্ভিত পাথর মনের মধ্যে এমন একটি অবসাদের মেঘ ঘনাইয়া আনে যে, চোখের জলে আর কিছুই দেখা যায় না—আর উঠিয়া চলিবার সামর্থ্য যেন থাকে না।

*　　*　　*　　*　　*　　*

বোলপুর।
১৩১১ সাল।

মোহিতচন্দ্র সেন।

মোহিতচন্দ্র সেনের সহিত আমার পরিচয় অল্পদিনের।

বাল্যকালের বন্ধুত্বের সহিত অধিকবয়সের বন্ধুত্বের একটা প্রভেদ আছে। একসঙ্গে পড়া, একসঙ্গে খেলা, একসঙ্গে বাড়িয়া ওঠার গতিকে কাঁচাবয়সে পরস্পরের মধ্যে সহজেই মিশ খাইয়া যায়। অল্পবয়সে মিল সহজ, কেন না, অল্পবয়সে মানুষের স্বাভাবিক প্রভেদগুলি কড়া হইয়া ওঠে না। যত বয়স হইতে থাকে, আমাদের প্রত্যেকের সীমানা ততই নির্দ্দিষ্ট হইতে থাকে—ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে যে একটি পার্থক্যের অধিকার দিয়াছেন, তাহা উত্তরোত্তর পাকা হইতে থাকে। ছেলেবেলায় যে সকল প্রভেদ অনায়াসে উল্লঙ্ঘন করিতে পারা যায়, বড়বয়সে তাহা পারা যায় না।

কিন্তু এই পার্থক্যজিনিষটা যে কেবল পরস্পরকে প্রতিরোধ করিবার জন্য, তাহা নহে। ইহা ধাতুপাত্রের মত—ইহার সীমাবদ্ধতাদ্বারাই আমরা যাহা পাই, তাহাকে গ্রহণ করি,—তাহাকে আপনার করি; ইহার কাঠিন্যদ্বারা আমরা যাহা পাই, তাহাকে ধারণ করি,—তাহাকে রক্ষা করি। যখন আমরা ছোট থাকি, তখন নিখিল আমাদিগকে ধারণ করে, এইজন্য সকলের সঙ্গেই আমাদের প্রায় সমান সম্বন্ধ। তখন আমরা কিছুই ত্যাগ করি না,—যাহাই কাছে আসে, তাহারই সঙ্গে আমাদের সংস্রব ঘটে।

বয়স হইলে আমরা বুঝি যে, ত্যাগ করিতে না জানিলে গ্রহণ করা যায় না। যেখানে সমস্তই আমার কাছে আছে, সেখনে বস্তুত কিছুই আমার কাছে নাই। সমস্তের মধ্য হইতে আমরা যাহা বাছিয়া লই,

তাহাই যথার্থ আমাদের। এই কারণে যে বয়সে আমাদের পার্থক্য দৃঢ় হয়, সেই বয়সেই আমাদের বন্ধুত্ব যথার্থ হয়। তখন অবারিত কেহ আমাদের নিকটে আসিয়া পড়িতে পারে না—আমরা যাহাকে বাছিয়া লই, আমরা যাহাকে আসিতে দিই, সে-ই আসে। ইহাতে অভ্যাসের কোনো হাত নাই, ইহা স্বয়ং আমাদের অন্তরপ্রকৃতির কর্ম্ম।

এই অন্তরপ্রকৃতির উপরে যে আমাদের কোনো জোর খাটে, তাহাও বলিতে পারি না। সে যে কি বুঝিয়া কি নিয়মে আপনার দ্বার উদ্‌ঘাটন করে, তাহা সে-ই জানে। আমরা হিসাব করিয়া, সুবিধা বিচার করিয়া তাহাকে হুকুম করিলেই যে সে হুকুম মানে, তাহা নহে। সে কি বুঝিয়া আপনার নিমন্ত্রণপত্র বিলি করে, তাহা আমরা ভাল করিয়া বুঝিতেই পারি না।

এইজন্য বেশিবয়সের বন্ধুত্বের মধ্যে একটি অভাবনীয় রহস্য দেখিতে পাই। যে বয়সে আমাদের পুরাতন অনেক জিনিষ ঝরিয়া যাইতে থাকে এবং নূতন কোনো জিনিষকে আমরা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে পারি না, সেই বয়সে কেমন করিয়া হঠাৎ একদা একরাত্রির অতিথি দেখিতে দেখিতে চিরদিনের আত্মীয় হইয়া উঠে, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না।

মনে হয়, আমাদের অন্তরলক্ষ্মী, যিনি আমাদের জীবনযজ্ঞ নির্ব্বাহ করিবার ভার লইয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারেন, এই যজ্ঞে কাহাকে তাঁহার কি প্রয়োজন, কে না আসিলে তাঁহার উৎসব সম্পূর্ণ হইবে না। তিনি কাহার ললাটে কি লক্ষণ দেখিতে পান,—তাহাকে আপনার বলিয়া চিনিতে পারেন, তাহার রহস্য আমাদের কাছে ভেদ করেন নাই।

যেদিন মোহিতচন্দ্র প্রথম আমার কাছে আসিয়াছিলেন, সেদিন শিক্ষাসম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে আমার আলোচনা হইয়াছিল। আমি সহর হইতে দূরে বোলপুরের নিভৃত প্রান্তরে এক বিদ্যালয়স্থাপনের ব্যবস্থা

করিয়াছিলাম। এই বিদ্যালয়সম্বন্ধে আমার মনে যে একটি আদর্শ ছিল, তাহাই তাঁহার সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিলাম।

তাহার পরে তিনি অবকাশ বা উৎসব উপলক্ষ্যে মাঝে মাঝে বোল-পুরে আসিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষ বহুকাল ধরিয়া তাহার তীব্র-আলোক-দীপ্ত এই আকাশের নীচে দূরদিগন্তব্যাপী প্রান্তরের মধ্যে একাকী বসিয়া কি ধ্যান করিয়াছে, কি কথা বলিয়াছে, কি ব্যবস্থা করিয়াছে, কি পরিণামের জন্য সে অপেক্ষা করিতেছে, বিধাতা তাহার সম্মুখে কি সমস্যা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, এই কথা লইয়া কতদিন গোধূলির ধূসর আলোকে বোলপুরের শস্যহীন জনশূন্য প্রান্তরের প্রান্তবর্ত্তী রক্তবর্ণ সুদীর্ঘ পথের উপর দিয়া আমরা দুইজনে পদচারণ করিয়াছি। আমি এই সকল নানা কথা ভাবের দিক্ দিয়াই ভাবিয়াছি; আমি পণ্ডিত নহি; বিচিত্র মানবসংসারের বৃত্তান্তসম্বন্ধে আমি অনভিজ্ঞ। কিন্তু রাজপথ যেমন সকল যাত্রারই যাতায়াত অনায়াসে সহ্য করে, সেইরূপ মোহিত-চন্দ্রের যুক্তিশাস্ত্রে সুপরিণত সর্ব্বসহিষ্ণু পাণ্ডিত্য আমার নিঃসহায় ভাব-গুলির গতিবিধিকে অকালে তর্কের দ্বারা রোধ করিত না—তাহারা কোন্ পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছে, তাহা অবধানপূর্ব্বক লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিত। যুক্তিনামক সংহত-আলোকের লণ্ঠন এবং কল্পনানামক জ্যোতি-ষ্কের ব্যাপকদীপ্তি, দু-ই তিনি ব্যবহারে লাগাইতেন; সেইজন্য অন্যে যাহা বলিত, নিজের মধ্য হইতে তাহা পূরণ করিয়া লইবার শক্তি তাঁহার ছিল; সেইজন্য পাণ্ডিত্যের কঠিন বেষ্টনে তাঁহার মন সঙ্কীর্ণ ছিল না, কল্পনাযোগে সর্ব্বত্র তাঁহার সহজ প্রবেশাধিকার তিনি রক্ষা করিয়া-ছিলেন।

মনের আদর্শের সঙ্গে বাস্তব আয়োজনের প্রভেদ অনেক। তীক্ষ্ণ-দৃষ্টির সঙ্গে উদার কল্পনাশক্তি যাঁহাদের আছে, তাঁহারা প্রথম উদ্যোগের অনিবার্য্য ছোটখাট ত্রুটিকে সঙ্কীর্ণ অধৈর্য্যদ্বারা বড় করিয়া তুলিয়া সমগ্রকে

বিকৃত করিয়া দেখেন না। আমার নূতনস্থাপিত বিদ্যালয়ের সমস্ত দুর্ব্বলতা-বিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করিয়া মোহিতচন্দ্র ইহার অনতিগোচর সম্পূর্ণতাকে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তথন আমার পক্ষে এমন সহায়তা আর কিছুই হইতে পারিত না। যাহা আমার প্রয়াসের মধ্যে আছে, তাহা আর একজনের উপলব্ধির নিকট সত্য হইয়া উঠিয়াছে, উদ্যোগকর্ত্তার পক্ষে এমন বল,—এমন আনন্দ আর কিছুই হইতে পারে না। বিশেষত তখন কেবল আমার দুইএকজনমাত্র সহায়কারী সুহৃৎ ছিলেন; তখন অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা এবং বিঘ্নে আমার এই কর্ম্মের ভার আমার পক্ষে অত্যন্ত দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছিল।

একদিন কলিকাতা হইতে চিঠি পাইলাম, আমার কাছে তাঁহার একটু বিশেষ প্রয়োজন আছে, তিনি বোলপুরে আসিতে চান। সন্ধ্যার গাড়িতে আসিলেন। আহারে বসিবার পূর্ব্বে আমাকে কোণে ডাকিয়া-লইয়া কাজের কথাটা শেষ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নিভৃতে আসিয়া কুণ্ঠিতভাবে কহিলেন—"আমি মনে করিয়াছিলাম, এবারে পরীক্ষকের পারিশ্রমিক যাহা পাইব, তাহা নিজে রাখিব না। এই বিদ্যালয়ে আমি নিজে যখন খাটিবার সুযোগ পাইতেছি না, তখন আমার সাধ্যমত কিছু দান করিয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করি।" এই বলিয়া সলজ্জভাবে আমার হাতে একখানি নোট গুঁজিয়া দিলেন। নোট খুলিয়া দেখিলাম, হাজারটাকা।

এই হাজারটাকার মত দুর্লভ দুর্ম্মূল্য হাজারটাকা ইহার পূর্ব্বে এবং পরে আমার হাতে আব পড়ে নাই। টাকায় যাহা পাওয়া যায় না, এই হাজারটাকায় তাহা পাইলাম। আমার সমস্ত বিদ্যালয় একটা নূতন শক্তির আনন্দে সজীব হইয়া উঠিল। বিশ্বের মঙ্গলশক্তি যে কিরূপ অভাবনীয়রূপে কাজ করে, তাহা এমনিই আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হইল যে, আমাদের মাথার উপর হইতে বিঘ্নবাধার ভার লঘু হইয়া গেল।

ঠিক তাহার পরেই পারিবারিক সঙ্কটে আমাকে দীর্ঘকাল প্রবাসে যাপন করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল এবং যে আত্মীয়ের উপর নির্ভর করিবার প্রয়োজন ছিল, সে এম্‌নি অকারণে বিমুখ হইল যে, সেই সময়ের আঘাত আমার পক্ষে একেবারে অসহ্য হইতে পারিত। এমন সময়ে নোটের আকারে মোহিতচন্দ্র যখন অকস্মাৎ কল্যাণবর্ষণ করিলেন, তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, আমিই যে কেবল আমার সঙ্কল্পটুকুকে লইয়া জাগিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহা নহে—মঙ্গল জাগিয়া আছে। আমার দুর্ব্বলতা, আমার আশঙ্কা, সমস্ত চলিয়া গেল।

ইঁহার কিছুকাল পরে মোহিতচন্দ্র বোলপুরবিদ্যালযের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কঠিনপীড়াগ্রস্ত হইয়া ডাক্তারের পরামর্শক্রমে ইঁহাকে পুনরায় কলিকাতায় আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইল।

যাহারা মানবজীবনের ভিতরের দিকে তাকায় না, যাহারা বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে শুভদৃষ্টিবিনিময় না করিয়া ব্যস্তভাবে ব্যবসায় চালাইয়া যায় বা অলসভাবে দিনক্ষয় করিতে থাকে, পৃথিবীর সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধসূত্র কতই ক্ষীণ! তাহারা চলিয়া গেলে কতটুকু স্থানেই বা শূন্যতা ঘটে! কিন্তু মোহিতচন্দ্র বালকের মত নবীনদৃষ্টিতে, তাপসের মত গভীর ধ্যানযোগে এবং কবির মত সরস সহৃদয়তার সঙ্গে বিশ্বকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই আষাঢ় যখন এই নব তৃণশ্যামল মাঠের উপরে ঘনীভূত হইয়া উঠে এবং মেঘমুক্ত প্রাতঃকাল যখন শালতরুশ্রেণীর ছায়াবিচিত্র বীথিকার মধ্যে আবির্ভূত হয়, তখন মন বলিতে থাকে, পৃথিবী হইতে একজন গেছে, যে তোমাদিগকে বর্ষে বর্ষে অভ্যর্থনা করিয়াছে, যে তোমাদের ভাষা জানিত, তোমাদের বার্ত্তা বুঝিত; তোমাদের লীলাক্ষেত্রে তাহার শূন্য আসনের দিকে চাহিয়া তোমরা তাহাকে আর খুঁজিয়া পাইবে না—সে যে তোমাদের দিকে আজ তাহার প্রীতিকোমল ভক্তিরসার্দ্র অন্তঃকরণকে অগ্রসর করিয়া ধরে নাই, এ বিষাদ যেন সমস্ত আলোকের

বিষাদ, সমস্ত আকাশের বিষাদ। সকলপ্রকার সৌন্দর্য্য, ঔদার্য্য ও মহত্ত্ব যে হৃদয়কে বারংবার স্পন্দিত-উদ্বোধিত করিয়াছে, সাম্প্রদায়িকতা যাহাকে সঙ্কীর্ণ করে নাই এবং সাময়িক উত্তেজনার মধ্যে চিরন্তনের দিকে যে লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছে, আমাদের সকল সৎসঙ্কল্পে, সকল মঙ্গল-উৎসবে, সকল শুভপরামর্শে আজ হইতে তাহার অভাব দৈন্যস্বরূপে আমাদিগকে আঘাত করিবে। উৎসাহের শক্তি যাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক, আনুকূল্য যাহাদের নিকট হইতে সহজে প্রবাহিত হয়, যাহারা উদার নিষ্ঠার দ্বারা ভূমার প্রতি আমাদের চেষ্টাকে অগ্রসর করিয়া দেয় এবং সংসারপথের ক্ষুদ্রতা উত্তীর্ণ করিয়া দিবার যাহারা সহায় হইতে পারে—এমন বন্ধু কয়জনই বা আছে!

দুইবৎসর হইল, ১২ই ডিসেম্বরে মোহিতচন্দ্র তাঁহার জন্মদিনের পর-দিনে আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহারই এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া এ লেখা সমাপ্ত করি।—

"আজকাল সকালে-সন্ধ্যায় রাস্তার উপর আর বাড়ীর গায়ে যে আলো পড়ে, সেটা খুব চমৎকার দেখায়। আমি কাল আপনাদের বাড়ীর পথে চল্‌তে চল্‌তে স্পষ্ট অনুভব করছিলাম যে, বিশ্বকে যদি জ্ঞানের সৃষ্টি বলা যায়, তবে সৌন্দর্য্যকে প্রেমের সৃষ্টি বল্‌লে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে যে ভাবগুলো মনের ভিতর প্রবেশ করে, আমাদের প্রজ্ঞাজাত সংস্কারগুলি সেগুলোকে কুড়িয়ে-নিয়ে এই বিচিত্র সুসংহত বিশ্বরূপে বেঁধে দেয়। এ যদি সত্য হয়, তবে যে-সৌন্দর্য্য আমাদের কাছে উদ্ভাসিত, সেটা কত-না ক্ষুদ্র-বৃহৎ নিঃস্বার্থ-নির্ম্মল সুখের সমবেতসৃষ্টি! Association কথাটার বাংলা মনে আস্‌চে না, কিন্তু একমাত্র প্রেমই যে এই Association এর মূল, একমাত্র প্রেমই যে আমাদের সুখের মুহূর্ত্তগুলোকে যথার্থভাবে বাঁধ্‌তে পারে, আর তা থেকে অমর সৌন্দর্য্য উৎপাদন করে, তাতে সন্দেহ হয় না। আর

যদি সৌন্দর্য্য প্রেমেরই সৃষ্টি হ'ল, তবে আনন্দও তাই—প্রেমিক না হ'লে কেই বা যথার্থ আনন্দিত হয়!

এই সৌন্দর্য্য যে আমারই প্রেমের সৃষ্টি, আমার শুষ্কতা যে একে নষ্ট করে—এই চিন্তার ভিতর আমার জীবনের গৌরব, আর দায়িত্বের গুরুত্ব একসঙ্গে অনুভব করি। যিনি ভালবাসার অধিকার দিয়ে আমার কাছে বিশ্বের সৌন্দর্য্য, আর বন্ধুর প্রীতি এনে দিয়েছেন, তাঁকে ধন্যবাদ দিই; আর শুধু আমারই শুষ্কতা-অপরাধের দরুন আমি যে আনন্দ-হতে বঞ্চিত হই, একথা নতমস্তকে স্বীকার করি।"

১৩১৩।